কুমুদ
কাব্যমঞ্জুষা

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতার সংকলন

প্রকাশক

কুমুদরঞ্জন মল্লিক এষ্টেটের পক্ষে ট্রাষ্টি

শ্রীকৌশাম্বী নাথ মল্লিক

ফ্লাট নং ওয়াই ১৭ শিবনাথ শাস্ত্রী হাউসিং এষ্টেট

গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা ২৯

সম্পাদনা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

শ্রীকৌশাম্বীনাথ মল্লিক

শ্রীসুধেন্দু মল্লিক

মুদ্রণ

শ্রীবিজয়চন্দ্র চন্দ্র

শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস

৫।২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন

কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৮

পরিবেশক

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

কুমুদরঞ্জনের জীবন ও কবিতা

কুমুদরঞ্জন মল্লিক জন্মেছিলেন ১৯শে ফাল্গুন ১২৮৯ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি ৩রা মার্চ ১৮৮৩ সাল), বর্ধমান জেলায় কোগ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে। এই কোগ্রামই মঙ্গলকাব্য খ্যাত উজানি নগর। কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এ গ্রামের ইতিহাস। শ্রীমন্ত সদাগর এখানকার অধিবাসী। সতী বেহুলারও জন্ম এই গ্রামে। আবার চৈতন্যমঙ্গলের রচয়িতা লোচনদাসের জন্মভূমি বলেও এই গ্রাম বৈষ্ণবের তীর্থ ক্ষেত্র। বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনার এই মিলন কেন্দ্রটি বাহান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ। দেবী মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির এর প্রাণ ও লোচন দাসের পাটবাড়ি এর হৃদয়। কবি কুমুদরঞ্জনের জীবনে ও কবিতায় এই গ্রামের ভূমিকা অসামান্য। মাতৃস্বরূপা একটি গ্রাম যে এক মহান ও যুগোত্তীর্ণ কবির আজীবন প্রেরণাদাত্রী হতে পারে কুমুদরঞ্জনের কবিতায় তার বিস্ময়কর পরিচয় ও স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

আগে জানা দরকার কুমুদরঞ্জন কেমন পরিবারে জন্মেছিলেন, তাঁর বাবা মা'র পরিচয় ও অন্যান্য ব্যক্তিগত খুঁটি-নাটি। এই জন্য জানা দরকার যে কুমুদরঞ্জনের লেখার একটা বড়ো অংশ তাঁর ব্যক্তিগত জগতের সুখ-দুঃখ ও ভালোবাসার মহিমায় আলোকিত।

তাঁর পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র মল্লিক। মল্লিক নবাবী পদবী। আসল পদবী সেনশর্মা বা সেনগুপ্ত। বাড়ি বর্ধমান জেলার বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ড গ্রামে। মাতামহ নিঃসন্তান ছিলেন, কবি মাতুলালয়ে লালিত হন। পূর্ণচন্দ্র অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীন চেতা ছিলেন। শত বিপদের ঝুঁকি সত্ত্বেও কখনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ছাড়েন নি। প্রথম জীবনে মেদিনীপুরে এক জমিদারের অধীনে কাজ করতেন যার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে কর্মত্যাগ করে বিদেশে

---

* কবি মনোজিৎ বসুকে চিঠিতে, আত্মস্মৃতিতে, বেতার জগতের জন্য লীলা মজুমদারকে ১২৮৯ সাল লেখেন। ফাল্গুন মাসে জন্ম। প্রথম চিঠিতে ১৮ই আছে। পরে সব জায়গায় ১৯শে বলেন। রমেন্দ্র মল্লিক তাই লিখে রেখেছেন বহু বৎসর আগে কবি তাঁকে যা বলেন। গ্রামে বহুবার তাঁর জীবদ্দশায় জন্মদিন পালন করা হয় ১৯শে ফাল্গুন। ইংরাজী হবে ১৮৮৩ মার্চ। ১৮৮২ সাত বৎসর বাদ দেওয়ায় ভুল হয়েছে। রাত ১২ টার পরে হলে ইংরাজী তারিখ পরের দিন পড়ে। পাড়া গাঁয়ে বাংলা সাল ও তারিখই মনে রাখার কি লিখে রাখার কথা।

ঘুরতে ঘুরতে কাশ্মীরে যান। প্রায় পঞ্চাশ বছর সেখানে ছিলেন। সুদীর্ঘ কাল সুনামের সঙ্গে কাজ করে, রাজার প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরে সুপারিনটেন্ডেণ্ট হয়েছিলেন। আবার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পূর্ণ-চন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত উদার, বন্ধুবৎসল ও বিদ্যোৎসাহী প্রকৃতির মানুষ। হিন্দী, ইংরাজী, উর্দ্দু ও পুস্তু ভাষায় তাঁর দখল মাতৃভাষার মতোই সাবলীল। আত্ম-স্মৃতিতে কবি লিখছেন :—"বাবা ছিলেন তেজস্বী সরল সবল প্রকৃতির লোক। ভক্তির কোন বহিঃপ্রকাশ ছিলনা, তিনি নিত্য শিবপূজা করতেন—চাঁদ সদা-গরের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।" আরেক জায়গায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :—"হৃদয় কোমল হইলেও—বাহিরে একটা কঠিন আবরণ ছিল। দুর্বলতাকে পছন্দ করিতেন না। কীর্তন গান শুনিতেন না, হরিনাম সংকীর্তন ভালোবাসিতেন। বাড়ি তাঁহার শ্রীখণ্ডে কিন্তু বৈষ্ণবতার বড় ধার ধারিতেন না।" স্মৃতিচারণে খুব মজা করে আরো লিখেছেন :—"তিনি তামাক সর্বদা খাইতেন—গয়া-কাশীর উৎকৃষ্ট তামাক সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত। আমি যতোবার তামাক কিনিয়া আনিয়াছি বিষম ঠকিয়াছি—বিক্রেতারা অনধিকারী জানিয়া নকল ও খেলো জিনিষ দিয়া সেরা জিনিষের দাম লইতো। আমি তামাক খাইনা শুনিয়া বাবার জনৈক বন্ধু বলিয়াছিলেন—তোমার বাবা যে তামাক খান তাহার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তোমাদের তিন পুরুষ কাটিয়া যাইবে।" পূর্ণচন্দ্র কবিতাও লিখতেন। এইসব কবিতা অধিকাংশই ভক্তি ও ভগবৎ বিষয়ক। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা কবিতায় রচনা করে ছিলেন। সেই সঙ্গে কবিতায় ষড় দর্শনের তত্ত্ব। এসবের পাণ্ডুলিপি বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে। 'কাশ্মীর' নামে তাঁর রচিত একটি কবিতার সুন্দর চারটি লাইন কুমুদরঞ্জন উদ্ধৃত করেছেন।

"স্বর্ণলঙ্কা জনশ্রুতি সোনার প্রাচীর
স্বচক্ষে দেখিনু শীতে রজত কাশ্মীর।
কোথা শোভা মনলোভা ব্রহ্মাণ্ড মাঝার
মরুভূমি জন্মভূমি সৌন্দর্য্য আগার॥"

একটি প্রার্থনায় লিখেছিলেন, 'চরণে মিনতি—এই করো দয়াময় / যেন প্রাচীন বয়সে উপেক্ষি শুশ্রূষা / সহজ মরণ হয়।' তাঁর প্রার্থনা যথাস্থানে মঞ্জুর হয়েছিলো। বিরাশি বছর বয়সে কারো সেবা না নিয়ে জন্মবার্ষিকীর রাত্রে সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পূর্ণচন্দ্র পরলোক গমন করেন কোগ্রামে ১৩৪৪ সনে দশহরার দিন। শেষ কথা সেইক্ষণে অনুপস্থিত পুত্রকে উদ্দেশ্য করে পরিজনদের বলেন—'কুমুকে বলো আমি চল্লাম।' কুমুদরঞ্জনের প্রতি মাতৃস্নেহের

ন্যায় পিতৃস্নেহের ধারাও অপরিমিত ছিলো। পূর্ণচন্দ্র পুত্রকে আদর্শ পুত্র বলে সকলের কাছে গর্ব করতেন। পিতার চরিত্র ভাবধারা ও জীবনের ঘটনা অবলম্বন করে "প্রিয়ঙ্গু" নামে একটি কিশোর উপন্যাস তিনি পরে লিখেছিলেন। সেটি 'রামধনু' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো!

এখন কবির মায়ের প্রসঙ্গে আসি। মা সুরেশকুমারী দেবী কোগ্রামের নবীন কিশোর মজুমদারের প্রথমা কন্যা। বয়স যখন ১১ বছর তখন ২১ বছরের ছেলে পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। মায়ের প্রতি কুমুদরঞ্জনের ভক্তি পুরাণে স্থান পাবার মত। একটি স্মৃতি চারণে লিখছেন:—"আমার মায়ের রূপসী বলিয়া যেমন খ্যাতি ছিল বুদ্ধিমতী ও গুণবতী বলিয়া ততোধিক খ্যাতি ছিল। সর্বদা দেবকার্য্যে ও গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্য্যন্ত সমভাবে মা ব্রতাদি পালন করিতেন। প্রতিদিন তুলসীতলে এমন ভাবে প্রণাম করিতেন যে মনে হইতো প্রত্যেক প্রণাম শ্রীভগবানের চরণে গিয়া পড়িতেছে—রাঙা চরণ আরো রাঙা হইয়া উঠিতেছে। মায়ের হৃদয় বড়ো কোমল ছিল, তিনি আত্মীয় পরিজনের সামান্য অসুখ-বিসুখে কাতর হইতেন। গ্রামের কাহারো কোন দুঃখে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। ....আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিয়োগে তিনি এক বৎসর পাগলিনীর ন্যায় থাকিতেন। তাঁর এই ভাব দেখিয়া আমি ভীত হইতাম এবং মনে মনে ভগবানকে বলিতাম—আমার মা যেন আমি মারা যাবার আগে মারা যান। তাঁকে এমন নিদারুণ ব্যাথা দিয়ে গেলে স্বর্গেও আমি শান্তি পাবো না।... আমার শৈশবে একটি ঘটনা মনে পড়ে—একজন পশ্চিমার আমাদের নিকট দুই টাকা পাওনা ছিল—সে হঠাৎ মারা যায়; সে টাকা পরিশোধ করার কোন উপায় রহিলনা। মা অতিশয় চিন্তিত হইলেন—খোঁজ করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের ঠিকানা পাওয়া গেল না। দুই তিন জায়গায় চিঠিও লেখা হইল, কিন্তু কোন উত্তর আসিলনা। মা একজন দুঃস্থ পশ্চিমাকে দুই টাকা দিলেন—একটি দেবালয়ে দুই টাকা উহার ঋণ শোধ করিয়া দিলেন, তবুও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। একবার একটি লোক আসিয়া বলিল তাহার বাড়ি নাগপুর এবং সেই পশ্চিমার আত্মীয়। মা তাহাকে দুই টাকা দিয়া ঋণ মুক্ত হইলেন। .... মা কে আমি যেমন ভয় করিতাম তেমনি ভক্তি করিতাম। তাঁহাতে আমি জগজ্জননীর ছায়া দেখিতাম।"

সত্যসত্যই কুমুদরঞ্জনের জীবনে মাতা ও জগন্মাতা এক ছিলেন। তাঁর মাতৃভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তিতে কোন তফাৎ ছিলনা। এক জায়গায় কবি লিখে

ছিলেন, "আমাকে ভালোবাসতেন বাবাই বেশী কিন্তু আমি মা বলিতেই অজ্ঞান।" অথচ জীবনের অনেকটা সময় সুরেশকুমারী ছেলের থেকে অনেক দূরে কাশ্মীর প্রবাসে থাকতেন। কিন্তু তাঁর টান, স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ সব সময়েই ছেলেকে ঘিরে রাখতো। তাঁর ঈশ্বর ভক্তির যে উল্লেখ কুমুদরঞ্জন করেছেন তাঁর একবর্ণও অত্যুক্তি নয়। প্রবাস থেকে পুত্রকে লেখা তাঁর যে চিঠিগুলি আজও রক্ষিত আছে তার প্রায় প্রতিটিতে একান্ত ঈশ্বর নির্ভরতা ও অচলা ব্যাকুল ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কুমুদরঞ্জন মায়ের কাছে তাঁর কোন কিছুই গোপন রাখতেন না। তাঁর সমস্ত সুখ দুঃখ, আঘাত বেদনা, নির্য্যাতন বিশ্বজননী তথা আপন জননীর কাছে নিবেদন করে শান্তি পেতেন। ১৯০৬।৭ সনে কাশ্মীর প্রবাসীনি মাকে লেখা তাঁর একটি চিঠির অংশ পড়লে কুমুদরঞ্জনের মাতৃভক্তির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। কবি তখন সবে স্কুলের চাকরিতে ঢুকেছেন। মাকে লিখেছেন :—"আমাদের জন্য এতো চিন্তা করিবেন না, করিলে আপনার শরীর খারাপ হইয়া যাইবে।......বাড়িতে বেগুন ও নানাবিধ ফল প্রচুর হইতেছে। আপনি এখানে নেই, আমার সবই আঁধার মনে হয়। কোন কাজ করিয়া সুখী হইনা, আপনি দেখিলে তবে সার্থক মনে করিব। আপনার পুণ্যে ও আশীর্ব্বাদে আমরা নির্বিঘ্নে ও সুখে থাকিব, ভাবিবেন না।.....আপনার জন্য সর্বদাই মন কেমন করে।......কাটোয়ার ডেপুটিবাবু আমাকে দুইটি মোকর্দ্দমার বিচার করিতে দিয়াছিলেন। দারোগাও খুব সম্মান করে। মুনসেফরা সবাই খুব ভালোবাসে। মহারাজা স্নেহ করেন। আপনি কবে বাটী আসিয়া সব দেখিবেন তাই ভাবি। আপনার শ্রীচরণ দেখিলে তবে সুখী হইব।"

পিতার মৃত্যুর প্রায় দু'বছর আগে কুমুদরঞ্জনের মা সত্তর বছর বয়সে ১৩৪২ সনে বড়দিনের দিন (২৫ শে ডিসেম্বর) কোলকাতায় জ্যেষ্ঠ্য পৌত্রের কাছে পরলোক গমন করেন। সেই হতে আমৃত্যু কুমুদ রঞ্জন মায়ের মৃত্যু দিনটিতে নিরম্বু উপবাসী থেকে মায়ের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেন।

মা বাবার কাছে সুদীর্ঘকাল ধরে পাওয়া স্নেহাবরণ, আশীর্বাদ ও মমতা কুমুদরঞ্জনের অন্তরকে এক আশ্চর্য কোমলত্ব, সার্বজনীনতা ও সংবেদনশীলতা দিয়েছিলো। কি লেখায় কি ব্যবহারে এক লাবণ্যময় ভালোবাসায় তাঁকে সকলের থেকে পৃথক করা যেতো। পরবর্তী কালে লেখা একটি কবিতায় পাই—"মমতা মোর পথের কীটও / পায় যেন হায় পায় যেন গো / বন বিহগের কণ্ঠে আমার অমর হউক ভাষা।" এই আন্তরিকতা সত্যের রশ্মিতে

সমুজ্জ্বল। যে মমতা তিনি পেয়েছিলেন তা তিনি আঁকড়ে রাখেন নি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন চারিদিকে।

যে সংসারে কবি জন্মেছিলেন তা অভাবের হলেও চির আনন্দের। কবিরা দুই ভাই চার বোন। কবিই বড়ো। ভাই আশুতোষ দাদার অত্যন্ত অনুরাগী এবং ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করতেন। বোনেদের নাম হেমন্তবালা, চারুবালা, সরলাবালা, পরের বোনটি সুনীতি অল্প বয়সে কাশ্মীরের পথে অসুস্থ হয়ে রাওলপিণ্ডির এক কালীবাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। সরলা দেবী এখনও জীবিতা। মাতুলালয়ে দিদিমা ও বিধবা মাসিমাদের অফুরন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে কুমুদরঞ্জন লালিত পালিত হয়েছিলেন। বহু তীর্থের নির্মাল্যে, দেবঅঙ্গনের মাটি ও দেবদেবীর স্নানজলে তাঁকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করা হতো। কবির সাত মাসি ও মা কবিকে যেন পক্ষীশাবকের মতো ঘিরে রাখতেন। তাঁদের সকলের হরিমুখী মন, কিন্তু কবিকে সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতে উন্মুখ। সর্বদাই তাঁর কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য পূজা স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি করা হতো। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করলে দেখা যাবে কবিকে কতো আদরে ও সাবধানে রাখা হয়েছিলো। কবি নিজে লিখছেন—"একবার বাড়িতে গাছ হইতে লাউ পাড়িতে গিয়া চাকরাণী সেটি ফেলিয়া ফেলে—উহা নাকি বড়ই অলক্ষুণে ব্যাপার, মা তো কাঁদিতে লাগিলেন। বাড়িতে একটা দারুণ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল। শেষে লোচনের পাটের মহান্ত সেই লাউ এবং চাউল প্রভৃতির মূল্য লইয়া বৈষ্ণব ভোজন করাইবার সমস্ত খরচ সহ সেই লাউ গ্রহণ করিয়া গৃহস্থকে বিপদ মুক্ত করিলেন। প্রত্যেক আচার্য্যই আমাদের বাড়িতে আসিয়া অত্যধিক খাতির পাইতেন, আমি খুব দীর্ঘজীবি ও রাজা হইব বলিলেই তাহাদের আশাতীত পাওনা হইত। গরীব গৃহস্থ তাহার ক্ষমতা ভুলিয়া গিয়া দান করিতেন। ধর্মরাজের দেয়াসী, দিদিঠাকরুণের পূজারী প্রভৃতির এবাড়ি একটি প্রিয় পরিচিত স্থান ছিল। রিক্ত হস্তে ফিরিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কখনো আমার সামান্য ফাঁড়া আছে কিংবা আমার সৌভাগ্য আসিতেছে এই দু' উপায়ে তাহারা রোজগার করিত।"

অত্যন্ত অল্পে সন্তুষ্টি, অটল ঈশ্বর নির্ভরতা স্বগ্রামের প্রতি ভালবাসা কবির সাহিত্য সংস্কারের মর্মভিত্তি। মাতৃভক্তি তো আছেই। শিশুমন গড়ে উঠেছিলো রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যানে, ভক্তমালের গল্প, বাউল গান, যাত্রা কথকতা, মেঠো গান, চণ্ডীর পালা, রামপ্রসাদের গান শুনতে শুনতে। বাড়িতে সর্বদাই ভগবৎ কথা হতো। গ্রামের পরিবেশও আধ্যাত্মিক। চারিদিকেই

ভক্তির নির্মল আবহাওয়া। কবির ভাষায় বলতে গেলে "কড়ির কথা কমই যেথা হরির কথা হয়···।" ভোরে উঠে গৃহ পরিজনেরা ভগবানের স্তোত্র পাঠ করতেন। তার সুর কবিকে আচ্ছন্ন করতো। ভোরে টহল গান মনে আনতো আনন্দ। যাত্রা গান কথকতা পাঁচালি যেন মনে সুরের জাল বুনতো। আত্মস্মৃতিতে কবি লিখেছেন :—"গ্রামে এত দেবতার বাস যে আমরা মনে করিতাম সর্বদা দেবদেবীর চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছি—আমরা তাঁহাদের আশ্রিত, আমাদের ভয় করিবার কিছু নাই।"

আগেই বলেছি কুমুদরঞ্জনের অতি শৈশবে তাঁর পিতা স্থানীয় কর্ম ত্যাগ করে কাশ্মীর চলে যান। বহুকাল তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। সংসারের আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। তবুও কবির দিদিমা কবি ও তাঁর অনুজকে সঙ্গে নিয়ে কোলকাতা চলে এসেছিলেন তাঁদের ভালো স্কুলে লেখা পড়া শেখানোর জন্যে। ভাড়া নিয়েছিলেন শাঁখারি টোলার একটি বাড়িতে একখানি ঘর। বাড়িটি স্বনামধন্য ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ির সামনেই। মহেন্দ্রলাল অত্যন্ত স্নেহ করতেন এই দেবস্বভাব কিশোরটিকে। কবির সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্ক ক্রমশ গভীর ও ব্যক্তিগত হয়। বংশানুক্রমিক এই হৃদ্যতা আজীবন অটুট ছিল। যাই হোক উপনয়নের পর ১১।১২ বছর বয়সে তিনি কোলকাতায় D. N. Das এর Century School এ ভর্তি হন। বীণাপাণির মন্দিরের সোপানে বসে কুমুদরঞ্জনের মুগ্ধ বালক মন কতো না উচ্চাকাঙ্খা ও বৃহৎ সম্ভাবনার কল্পনায় রঞ্জিত হয়েছিলো। কবি বলেছেন, যেন "রুই মাছ এসে ঠোকর দিতো পুঁটি মাছের বঁড়শিতে।" কোলকাতায় বিদ্যাশিক্ষায় প্রায় ১২।১৩ বছর কেটে যায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক পেয়ে বি. এ. পাস করেন। ছাত্রাবস্থাতেই কবি করুণানিধান, সতীশ চন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গেও এই সময়ে দেখা হয়।

বি·এ পাসের সঙ্গে সঙ্গেই কবির শহর জীবনও শেষ হয়। একটি কবিতায় কুমুদরঞ্জন পরে লিখেছিলেন—"বনবাস মোর কবে শেষ হবে কেহ যদি জানো কহ রে। চৌদ্দ বছর রহিয়াছি আমি পাড়া গ্রাম ছাড়ি শহরে।" মনে হয় কোলকাতার এই দীর্ঘ প্রবাস জীবনকে স্মরণ করে লেখা।

১৯০৬ সালে ২২শে অক্টোবর কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের অনুরোধে তিনি কোগ্রামের অনতিদূরে মাথরুণ নবীনচন্দ্র ইনসটিটিউশনে

অস্থায়ী দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগ দেন। কিন্তু দুমাসের জন্যে গিয়ে ১ বছরের মধ্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। যে যোগ্যতা ও শিক্ষা কুমুদরঞ্জনের ছিলো তাতে এই পদ এমন কিছু অসাধারণ বলে মনে না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তিনি যে কোন উচ্চ পদ বা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতেন। বস্তুতঃ সেই সময় কাশ্মীর রাজসরকার থেকে তাঁর একটি বড়ো চাকরির আমন্ত্রণ আসে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। কুমুদরঞ্জনের অত্যন্ত ইচ্ছা ছিলো আইন পাস করে ওকালতি করার। রিপণ কলেজে ভর্তি হয়ে আইনের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছিলেন। কিন্তু সেই স্বাধীন এবং স্বর্ণপ্রসূ সম্ভাবনাকেও তিনি সহজে ত্যাগ করেন—এবং শিক্ষকতা বৃত্তিকেই গ্রহণ করেন। এর পশ্চাতে মহৎ আদর্শটিকে লক্ষ্য করতে ভুল হয় না। বীণাপাণির মন্দির সোপানে বসে ভবিষ্যৎ কবির বালক চোখ যে বৃহৎ সম্ভাবনা ও উচ্চাকাঙ্খার নীলাঙ্গনে মোহিত হয়েছিলো, তা নিশ্চয়ই পার্থিব উচ্চাকাঙ্খা বা সম্ভাবনা নয়। তা পরে পরিস্ফুট হয়েছিলো কবির অমৃতত্বপদ পিপাসায়—যা ত্যাগেই অর্জিত হয়। সত্যই কুমুদরঞ্জন এক আশ্চর্য নির্লোভ ও আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, যাঁর সত্তায় ও সমগ্র অস্তিত্বে এক দিব্যতা নিয়তই অনুভূত হতো। এই কবি মানসটিকে না বুঝলে এবং না গ্রহণ করলে তাঁর কবিতার রসাস্বাদন সম্ভব নয়।

কবি তাঁর এই প্রধান শিক্ষক হবার ব্যাপারটিকে বড়ো কৌতুকের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন:—"আমার বয়স কম, তাহাতে আবার দেখিতে বালকের মতো বলিয়া লোকে প্রথমে বলাবলি করিতো 'মহারাজা এক কাল দমনের বালককে হেডমাষ্টার করেছেন।' চৈতন্যপুরের জমিদার কন্দর্পনারায়ণ চৌধুরি রসিক লোক ছিলেন, তিনি আমার প্রথম দর্শনেই বড়ো স্নেহ করিতেন এবং মাতামহের বন্ধু ছিলেন বলিয়া আমাকে অত্যন্ত আদর করিতেন। তিনি আমাকে দেখিয়া শিক্ষকবৃন্দ ও অন্য সকলকে বলেন—'কি হে তোমরা যে বলছিলে কাল দমনের বালক? এযে খাসা ছনছনে ছেলে, মহারাজা এইবার কলমে আম-গাছ আজ্ঞিয়েছেন, খুব ভালো ফল হবে'। বৃদ্ধের এ আশীর্বাদ ফলিয়াছিলো।"

টানা ৩১ বছরেরও বেশী—এ স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করার পর ১৯৩৮ সালে জুলাই মাসে কবি অবসর গ্রহণ করেন। মাথরুণ বাস কবির জীবনে সব দিক থেকে স্মরণীয়। এই গ্রামটিকে ও গ্রামের স্কুলটিকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। যদিও অজয় ও কুনুরের বাহু বেষ্টনে বন্দী কোগ্রামের শোভা এখানে অনুপস্থিত। কবি লিখছেন:—"মাথরুণেই আমার অধিকাংশ কবিতা লেখা হয়। দিগন্ত শোভী ধান্যক্ষেত্র ও প্রকাণ্ড

ময়দান আমার ভালো লাগিত। কোগ্রামের সমকক্ষ না হইলেও নানা অসুবিধা সত্বেও মাথরুণ আমার প্রিয়। এখানে আমি বহু সুখ, বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছি—আমার সহোদর ঐ সময়েই মারা যায়' কার্য্য কালেই আমি অনেক স্বজন হারাই—শেষ দিকে মাতা পিতা বিয়োগের দুঃখ সহ্য করি। আবার এখানে সুখও ঢের পাইয়াছি। আমার ছেলেরা এইখান হইতেই পাস করে। আমি সামান্য লোক হইলেও অপ্রত্যাশিত মান ও সম্মান লাভ করি। সেই জন্য মাথরুণের স্মৃতি আমার চিরদিনই জাগরুক থাকিবে।" এই গ্রামের স্মরণেই তাঁর 'একটি গ্রাম' নামে বিখ্যাত কবিতাটি লেখা। সেটি যেন তাঁর জীবন সঙ্গীত।

যে সময়ের কথা সে সময়ে এখনকার মতো প্রধান শিক্ষকের পদে আর্থিক স্বাচ্ছল্য ছিল না। রাজানুকুল্যে স্থাপিত বিদ্যালয় হলেও বেতন স্বল্পই ছিল—এবং তাও নিয়মিত ছিল না। মাহিনার দিকে লক্ষ্য কবির কোনদিন ছিল না। অর্থপুস্তক লিখে অর্থোপার্জন বা গৃহ শিক্ষকতা করাও কুমুদরঞ্জনের পক্ষে অভাবিত। কয়েকটি উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনা করেছিলেন, কিন্তু তা মা লক্ষ্মীর কৃপা লাভের আশায় নয়। কিন্তু আর্থিক কষ্ট ও অনটনকে সহাস্য অভ্যর্থনা করা কুমুদরঞ্জনের মজ্জাগত ছিল' বৃদ্ধ বয়সে নাতি নাতনিদের কাছে পরিহাস করে বলতেন—"আমার আর কি ? লাখ টাকা লাখ টাকা, ভুকুড়ি পাঁচ টাকা"। দারিদ্রের বিরুদ্ধে কখনো তিক্ত অভিযোগ করেন নি। বরং তা ঐশ্বরিক কৃপা বলে মনে করেছেন। তাঁর শিক্ষক জীবনের প্রসঙ্গে আত্মস্মৃতিতে তাঁর নিজের কথা হলো :—"আমার মতো চঞ্চল চিত্ত, একটা খামখেয়ালী লোককে এক স্থানে এত দীর্ঘকাল রাখা ঋষিকল্প মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ সহনশীল ও স্নেহশীল মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। সবার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার মতো স্বভাব আমার নয়—মহারাজ বাহাদুরকে বহুভাবে উত্যক্ত করিতাম, তিনি পিতার ন্যায় গভীর স্নেহে আমার সব উপদ্রব সহ্য করিতেন। সুদীর্ঘকাল সমভাবে পরীক্ষায় ভালো ফল, ছাত্রদের কৃতিত্ব এবং বিদ্যালয়ের সুযশ মহারাজকে প্রীত করিত। নামজাদা পরিদর্শক গণের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও আকাঙ্খিত মন্তব্য তিনি আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিতেন। মহারাজা আমার কবিতা ভালোবাসিতেন, হাস্য মুখে বহু গুণী লোকের সমক্ষে দুএকটি ছত্র আবৃত্তি করিতেন। আমার কোন অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই, কোন আব্দার অপূর্ণ রাখেন নাই, কোন প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নাই। সেখানকার ছাত্রগণের ব্যবহার অতুলনীয়।

এমন গুরুভক্ত একান্ত বাধ্য প্রতিভাবান ছাত্রদল পাওয়া যে কোন শিক্ষকেরই সৌভাগ্য। দীর্ঘকাল মধ্যে একদিনও কোন ছাত্রের' অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত পাই নাই। আমার বা স্কুলের অপযশ হইতে পারে এমন কার্য্য কোন ছাত্র কখনো করে নাই। যাহারা বুদ্ধিমান ছিলনা, যাহাদের বেশীদিন অধ্যয়নের সুবিধা হয় নাই, তাহাদের জন্য আমি সর্বদা ব্যথা অনুভব করিতাম। আমার শাসন কঠিন কঠোর ছিল। আমি যে নিয়মানুবর্তিতা চাহিতাম, পাইতাম ততোধিক। তাহাদের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইতাম।"

এ এক দুর্লভ মানুষের স্মৃতিচারণ যাঁকে কর্ম্মজীবন তথা সংসারের কোন গ্লানি কোন ব্যর্থতা স্পর্শ করতে পারেনি। হয়তো সাময়িক ভাবে স্পর্শ করেছে, কিন্তু বন্দী করতে পারেনি। মাথরুণের জীবন গোলাপ ছড়ানো ছিলনা। গ্রাম্য দলাদলি, কিছু সহকর্মীর চক্রান্ত, মহারাজার কিছু আত্মীয়ের অসহ্য ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কবিকে সুদীর্ঘ সময় রুখে দাঁড়াতে হয়েছে। মাঝে মাঝে বিষাদ ও হতাশার অন্ধকার কবির মনোবলকে আড়াল করেছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জন তাঁর সহজাত ঈশ্বর নির্ভরতার বর্ম পরে ও আধ্যাত্মিক সাহস ও প্রখর বাস্তব বুদ্ধির সাহায্যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন। নিয়মিত ডায়েরি তিনি লিখতেন না! কিন্তু ১৯২৩ সালের বিচ্ছিন্নভাবে ইংরাজীতে লেখা দিনলিপির কিছু পাতায় এই সব যন্ত্রণার আঘাত চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। এর অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া লেখায় কবির বিরুদ্ধে একটি ঘোর চক্রান্তের কথা জানা যায় যার জন্যে তিনি ফৌজদারী মকর্দ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। ২৫শে মার্চ রবিবার লিখছেন :—"Jogesh is trying his best to put me to prison. He has money, he has power, he will achieve success. God is alone great and I won't bow my head to anyone except him. May he give me peace." ২৭শে মার্চ লিখছেন : "The end is near. An innocent man is going to jail. Money and power can do anything. Thank God. I did not bow my head to pride and power." ৩০শে মার্চ লিখলেন : "Returned from Katwa with Mahmud Mia. The S. D. O. denied all knowledge of the letter. I stagger at the meanness of mankind. God knows when I shall be delivered of all these troubles." ১৭ই এপ্রিল : "Only God is great. I am really disturbed in spirit but still doing my duty as faithfully as

ever". ৩রা মে: "The judgement was delivered. It is a providential favour that I was not sent to jail. The plot was so diligently carried out against me that my honesty and truth could not protect me. I stagger at the travesty of justice." ৪ঠা মে লিখলেন: 'I was so depressd that I could not pray to God. My only consolation is that I am innocent and the punishment is heavy. I believe in the ultimate triumph of truth.' ৫ই মে লিখেছেন: "My mind is rather settled today ...He (god) is my only stay and though disgrace settles on my head, I will cling to him the closer." ইতিমধ্যে মনে হয় আপিল দাখিল করা হয়েছে। ২৪শে জুন রবিবার লিখছেন: "The school will open tomorrow.......the result of the appeal is not yet known...." ২৫শে জুন সোমবার লিখছেন—হয়তো পথে যেতে যেতে: "Going to Mathrun the road appears weary and cheerless. The known path looks like a stranger. Who can guess the depth of bitterness. Still I cling to God and God alone. My ear still hears—Truth is stronger and will prevail." ২৭শে জুন বুধবার লিখছেন:—"In the evening write a poem 'আড়াল করে দাঁড়াও হরি সম্মুখে'....today judgement will be delivered. I pray all day. At midnight a man knocked at the door, a man of Valugram. I awoke and opened the door, he most cheerfully informed that we gained (?) both the cases—all the accused had been acquitted honourably. I wept and wept and kissed the feet of my Radhakrishna Murti. At last God had listened to my prayer. Truth has prevailed and only God is great." প্রতিকূলতার দংশন তখন যতো তীব্রই হোক কবি কিন্তু পরে মন থেকে এসব মুছে ফেলেছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা জয়লাভের উচ্ছাসের রেখাপাত হৃদয়ে স্থায়ী হয়নি। সাময়িক ঘটনার বেশী মর্য্যাদা তিনি এই সব ঘটনাকে দেননি। এক স্থানে লিখেছেন:—"শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, অনুরাগী ভক্ত ছিলেন—ইহার ব্যতিক্রমও যে ছিল না নহে। প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাও পাইয়াছি তবে তাহা আমার ক্ষতি

করিতে পারে নাই—মনেও কোন দাগ রাখে নাই। ক্ষমা চাহিয়াছেন, আমিও ক্ষমা করিয়াছি।" নিষ্কাম কর্মসাধনায় ব্রতী কুমুদরঞ্জন আরো লিখেছেন : "আমি একমাত্র ভগবানকে নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করিয়া নিঃস্বার্থভাবে নির্ভয়ে কর্তব্য পালন করিয়াছি এবং মহারাজা তাহা সম্পূর্ণভাবে বুঝিতেন ইহাই আমার সুখ ও সান্ত্বনা।"

'শতদল' হতে 'তূণীর' পর্যন্ত মোট ১২ খানি কাব্যগ্রন্থ কবি মাথরুণে থাকতেই প্রকাশিত হয়। তিনি ইতিমধ্যেই প্রথিতযশা হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও বহু বরেণ্য ব্যক্তির অকুণ্ঠ অভিনন্দনে ভূষিত হয়েছেন। অখণ্ড বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকাতেই তাঁর লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। ১৩২৩ সালের খাতার পাতায় তিনি যে বছর যে সব পূজা সংখ্যায় লিখেছিলেন তার একটি তালিকা পাওয়া যায়। মোট ৪৮টি পত্র পত্রিকা, যথা, এডুকেশন গেজেট, হিতবাদী, যমুনা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী, ভারতী, সাধনা, সওগাৎ, মোসলেম ভারত, সবুজ পত্র প্রভৃতি। এর প্রায় ২৫ বৎসর পর একটি পাণ্ডুলিপিব পাতায় এই ধরণের ১৪২টি পত্র পত্রিকার তালিকা পাওয়া যায়। এখনকার বেশীর ভাগ পত্রপত্রিকার যেমন গঙ্গাসাগর যাত্রীর মতো 'আপনি রাঁধো আপনি খাও' নীতি বা ভাগ্য, ওই কাগজগুলির কিন্তু যথেষ্ট প্রচার প্রসার ও অসংখ্য গুণগ্রাহী পাঠক ছিলো। ফলে কুমুদরঞ্জন অতি অল্পদিনে নিজের মর্য্যাদার আসন পেয়েছিলেন পাঠক সমাজে। এমন কোন স্কুল কলেজ পাঠ্য গ্রন্থ বা সংকলন ছিল না যাতে তাঁর কবিতা সন্নিবিষ্ট হয় নি। সুধী সমাজে সাদর দৃষ্টিতে তিনি তখন অভিনন্দিত। কিন্তু প্রধান শিক্ষক বলে বা সাহিত্য সাধনার ব্যাঘাত হবে বলে কবি কোনদিন নিজেকে আলাদা করে রাখেন নি। মাথরুণে হোষ্টেলে যে ঘরে তিনি থাকতেন, সে ঘরেই চারটি ছাত্র উচ্চস্বরে পাঠ মুখস্ত করতো, কিন্তু এতে তাঁর কবিতা লেখার কোন বিঘ্ন তিনি অনুভব করেন নি। তাই দেখে তাঁর এক ইংরেজ আই, সি, এস, বন্ধু—J. G. Drummond হেসে বলেছিলেন, 'A privacy of glorious light is thine.' এ কথার প্রতিটি বর্ণই কবির জীবনে সত্য। তাঁকে কখনো একলা থেকে একলা হতে হয়নি। তাঁর সাধনা তাঁর মানসিক স্থৈর্য তাঁকে চরম কোলাহলেও নিঃ-শব্দের শান্তি দিতে পারতো, জটিল ভিড়েও তিনি একাকিত্ব খুঁজে পেতেন। তাই অন্যান্য অনেক কবির মতো কুমুদরঞ্জন সহসা ফুরিয়ে যাননি। জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্য ধারার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ ছিলো। কেননা বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতার প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁর মন ছিলো অন্তর্মুখি। সেই

অন্তর্মুখি বিশ্বাস ও প্রজ্ঞা থেকেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন। 'আমার ভক্তি এ অনুরক্তি বুকের রক্তে বহে।" জীবনচর্য্যাই তাঁর সাধনা ছিলো। আলাদা কোন সাধনার প্রয়োজন ছিলোনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অর্ঘ তোমার আনিনি ভরিয়া বাহির হতে,। ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের আপন স্রোতে'।

কুমুদরঞ্জন যে সময় তাঁর কর্ম ও কাব্য জীবন সুরু করেছিলেন তখন দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় আসন্ন বিদ্রোহ ও সন্ত্রাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আনবার উন্মাদনা যুব সমাজকে আকৃষ্ট করে প্রচলিত সংস্কার হতে ঘরের বাইরে নিয়ে চলেছে। এই সূত্রে অনেক সময় ক্ষীণ একটা অভিযোগ ওঠে যে কুমুদরঞ্জন কেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন নি—তাঁর লেখায় কেন সমাগত বিপ্লবের ঝংকার অনুপস্থিত। এর উত্তরে এইটুকুই বলা যেতে পারে কুমুদরঞ্জনের পথ আলাদা। আর তাছাড়া এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কোন কবির ন্যায্য আলোচনা হতে পারে না। তিনি সৎসাহিত্য সৃষ্টির—যা মানুষকে ভাবায় এবং ভালোবাসতে শেখায়—এবং মানুষ গড়ার ব্রতের দিকেই জোর দিয়েছিলেন। স্বাধীন জাতির বা দেশের ভিত হবে কাদের ওপর ? ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী বিনা বিচারে আটক ও অন্তরীণ বন্দীদের জীবন তাকে ব্যথিত করেছে। 'বনমল্লিকা'র 'বন্দী' কবিতায় ও 'পল্লীমধু' নাটকে তার পরিচয়। গান্ধী মহাত্মার লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনকে 'অমৃতের জয়যাত্রা' বলে অভিনন্দিত করেন। 'ভারতবর্ষ', কাগজের সম্পাদক সাহস করে তখন ছাপতে পারেন নি। সেখান হতে কবিতাটি হারিয়ে যায়। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর স্কুল কলেজের ছাত্রদের বিদ্যালয় বর্জন করার ডাক কুমুদরঞ্জন নীতিগত ভাবে কখনো সমর্থন করেননি। তিনি বুঝতেন শিক্ষার বনিয়াদ ভেঙে গেলে এবং শৃঙ্খলা বোধ নষ্ট হলে জাতিরই সর্বনাশ। সেই আন্দোলনের মুখেও তাঁর স্কুলে কখনো কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কেননা তাঁর কাছে ছাত্ররা পুত্রাধিক স্নেহে আশ্রমের আবহাওয়ায় মনুষ্যত্ব অর্জন করছিলো। শিক্ষকের ভূমিকায় তিনি Kiplingএর 'Reformers' কবিতাটির ভাব আরোপ করতেন। আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার অবনতি তিনি স্বচক্ষে দেখে গিয়েছিলেন। অবসর গ্রহণের অনেক পরে, বড়ো দুঃখে, বড়ো বেদনায় 'শিক্ষকের চিতা' কবিতায় লিখেছিলেন :

• "আচার্য্যত্ব করা যায় না কো / কলুষিত মন লয়ে।

আমাদিকে সদা থাকিতে হইবে / দেহে মনে শুচি হয়ে।
ভকতি শ্রদ্ধা করিতে আকর্ষণ
চাই ত্যাগ চাই নিষ্ঠা সে পুরাতন
তবে জনগন ভরে যশ মান / দুয়ারে আনিবে বয়ে।"

আজ কজন শিক্ষক এই পবিত্র ঋষি বাক্য পালন করছেন? যে কালে যে কোন উচ্চপদের ও মাইনের চাকরি পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না, তখন এক নগন্য গ্রামের স্কুলে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা বিসর্জন দিয়ে দেশের শিক্ষা যজ্ঞে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া কি অসামান্য আত্মোৎসর্গ নয়' আর কালের বিচারে কবির পক্ষে রাজনৈতিক কবিতা লেখাই বড়ো কথা নয়, বা রাজনীতিতে লিপ্ত থাকাই বড়ো ব্যাপার নয়। লেখা যুগোত্তীর্ণ হলো কিনা বা কবিতায় তাঁর জীবনের সমর্থন থাকলো কিনা সেটাই বিবেচ্য। রাজনৈতিক মতবাদ অনেক সময়েই কবির মনে অন্ধ আসক্তি আনে, এবং রামকৃষ্ণের ভাষায় 'মতুয়ার বুদ্ধি'তে আচ্ছন্ন করে তার সত্তাকে অসুস্থ ও অসার্থক করে তোলে। কুমুদরঞ্জন তাই শান্ত বিশ্বাস ভক্তি ও মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ বেছে নিয়ে ভ্রম করেছিলেন একথা মানা যায় না। শিক্ষকতা তার যতোখানি বৃত্তি তার চেয়ে ঢের বেশী ব্রত ছিলো। সারা জীবনের লেখায় তিনি শুধু এই চেষ্টাই করেছিলেন যাতে সমগ্র ভারতবর্ষের মহিমা আমরা বুঝতে পারি এবং এক ভাবভূয়িষ্ঠ একতাবদ্ধ জাতির সংগঠন সম্ভব হয়। বড়ো বিনয় এবং বিশ্বাসের সঙ্গে একটি কবিতায় কবি লিখেছেন—
"আর কিছু নাহি পারি / আমি তোমাদিকে করি আনন্দ অমৃতের অধিকারী।"

কর্ম জীবনের বাইরে, তাঁর সুস্থ শান্ত পারিবারিক জীবনের একটি স্থায়ী প্রভাব কবির রচনায় দেখা যায়। তাঁর কর্ম জীবনের তাপ তিনি তার পরিজন বা স্ত্রী পুত্র কন্যাদের গায়ে লাগতে দিতেন না। কখনো কখনো প্রবাসিনী মাকে মনোবেদনা নিবেদন করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেন। বাড়িতে তিনি আনন্দে থাকতেন এবং সকলকে আনন্দে রাখতেন। পারিবারিক জীবনে কুমুদরঞ্জন অত্যন্ত সুখী ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার সময় প্রায় সতের বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় শ্রীখণ্ডবাসী যুগল কিশোর রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সিন্ধুবালা দেবীর সঙ্গে, সম্ভবত ১৮৯৯।১৯০০ সালে। ১৯৭০ সালে ১৪ই ডিসেম্বর কবির মৃত্যু পর্যন্ত গভীর মমতা ও নিপুণতার সঙ্গে সংসার চালিয়ে এসেছিলেন কবিপত্নী। প্রথম দিকে অনটনের সংসার হলেও কবির মাসীমারা ও পরে তাঁর পত্নী তার

আঁচড়টুকুও কবির গায়ে লাগতে দেননি। সংসার খরচের যে সামান্য টাকা তিনি কবির কাছে পেতেন তাতেই হাসিমুখে বিরাট দায়িত্ব পালন করে যেতেন। নিজের সুখ সুবিধার দিকে কোন দিন ফিরেও তাকাতেন না। অসীম মমতাময়ী, স্নেহশীলা ও ভক্তিমতী প্রকৃতির নারী ছিলেন সিন্ধুবালা। গৃহদেবতার পূজা না করে জল গ্রহণ করতেন না। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের জন্যেই তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর দাক্ষিণ্য। ছেলেমেয়েরা যখন কেউ পরীক্ষা দিতে যেতো বা বিদেশে যেতো তখন তার মাথায় প্রসাদী নির্ম্মাল্য ছুঁইয়ে তাঁর সুদীর্ঘ সুস্নিগ্ধ আশীর্বাদ যেন তাকে পরম অভয় ও কল্যাণের হাতে সঁপে দিতো। খুবই স্পষ্টবাদী ছিলেন সিন্ধুবালা। সত্য কথা পরিস্কার ভাবে বলে দিতেন। হাস্য পরিহাসেও তাঁর জুড়ি ছিল না। দুঃখের ভাব, বিমর্ষ ভাব তিনি সইতে পারতেন না। উচ্চহাস্য করে আবার সংসারের কাজে মন দিতেন। বৃদ্ধ বয়সে কুমুদরঞ্জন ও সিন্ধুবালার কথোপকথন তাদের পৌত্র পৌত্রীদের কাছে বড়ই উপভোগ্য ছিল। স্বামীকে কোন সামান্য কথায় চটিয়ে দিয়ে কখনো কখনো মধুর কোন্দলে প্রবৃত্ত হতেন বালক বালিকার ঝগড়ার মতো। তারপর "মা গো মা, দুঃখের ওপর হাসি' বলে কোন মজার ঘটনা স্মরণ করে হাসিতে গড়িয়ে পড়তেন। সকলেই সেই আনন্দে যোগ দিয়ে আনন্দ পেতো। সে ছিলো যেন সাক্ষাৎ শিবদুর্গার সংসার। সিন্ধুবালার পরিহাস বোধের একটি নমুনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কুমুদরঞ্জন তখন অবসর নিয়ে বাড়িতেই আছেন। পরিণত বয়স। সঙ্গে আছেন ২।৩ জন পৌত্র, কনিষ্ঠা কন্যা অঞ্জলি। সিন্ধুবালা অত্যন্ত অসুস্থা। টাইফয়েড। সংকট জনক অবস্থা। মুহ্যমানা হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। এমন এক সময় সকাল বেলায় কুমুদরঞ্জন কন্যাকে এসে খুব ভাবিত মুখে বল্লেন—"ছাখো মা, তোমার মায়ের এমন অবস্থা, আজ আর আমার জলখাবারের বিশেষ হাঙ্গামা করোনা। শুধু খান কয়েক বেগুনি ভাজো, কিছু গোটা মুসুর ডাল আর বরবটি সিদ্ধ করে দাও। আর দুখানি পাঁপড় ভাজা যদি সম্ভব হয় দাও।" তখনো শেষ হয়নি কথা। হঠাৎ সিন্ধুবালা নড়ে উঠলেন ও দুর্বল গলায় মেয়েকে বল্লেন—"আহা আজ আমার উপীন কাকা বেঁচে থাকলে শুনলে বড়ো খুশি হতেন। স্ত্রীর মৃত দেহের সামনে উনি মাসিকে বলেছিলেন 'মাসি, ও পড়ে আছে, এখন তো আর খাওয়ার কথা উঠতে পারে না, তবে ১২টা বাজছে, আমার পিত্তরক্ষার্থে খান আষ্টেক লুচি আর বেগুন ভাজা করে দাও" বলতে বলতেই হেসে উঠলেন সিন্ধুবালা। সেই হাসির জোরেই হয়তো আস্তে

আস্তে সেরে উঠলেন সে যাত্রা। কবির প্রতি যত্ন মমতা ও শ্রদ্ধার সীমা ছিলনা সিন্ধুবালার। কবির অধিকাংশ কবিতাই তাঁর মুখস্থ ছিলো। যে সব কবিতা তাঁর প্রিয় ছিলো, সেগুলি একটি আলাদা খাতায় লিখে রেখে দিতেন তিনি। সংসারের খুটিনাটি অতিথির আদর আপ্যায়ন লৌকলৌকিকতা সব দিকে সমান দৃষ্টি থাকতো তাঁর। বাড়ির জ্যেষ্ঠ্য পৌত্র শুভেন্দু বা বুঁচুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কোলকাতা থেকে স্বামীকে লেখা সিন্ধুবালার একটি চিঠির অংশ পড়লে বোঝা যাবে কি নিখুঁত গৃহিণী ছিলেন তিনি। সেটা ১৯৩৪ সাল। সিন্ধুবালা বড়ো ছেলের কাছে কোলকাতায় এসেছেন। লিখছেন"......খেঁদুর পত্রে জানলাম ২৩শে বুঁচুবাবুর শুভ অন্নপ্রাশন মাতা ঠাকুরাণী [পুর্ণচন্দ্র ও স্বরেশ কুমারী তখন কাশ্মীরে] দিতে লিখিয়াছেন। আমার ঐ তারিখে দিবার ইচ্ছা। শুভ অন্নপ্রাশনের লক্ষণের জিনিষ আপনি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিবেন। কোন জিনিষ যেন ভুল না হয়। আপনি ঠাকুরঝি দের অবশ্য ২ আসিবার জন্য চিঠি দিবেন। দুর্গা লিখিয়াছে তাহারা আসিবে। শ্রীখণ্ডে মেজদাদাকে ও মাসিমাকে, দিদিকে, আসিবার জন্য লিখিবেন। নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলি ঠিক করিয়া রাখিবেন। দই আধমণ, মাছ ১ মণ, বঁদে আধমণ দুলালকে দিয়ে ভাজাইবেন। এখান হইতেও কিছু মিষ্টি লইব। টানা মেঠাই করাইবেন, মুড়কি ১ টিন, মুড়ি ৪ খোলা, কেঁড়িলি ৫ সের, ছোলার ডাল ১০ সের, ঘরে ছোলা আছে, ধান এক বিশ বাঁইছা শিঘ্র দিবেন। ভাতের বেশী, মুড়ির কম। ক্ষীর ১০ সের, কুলা ১ খানা, চড়ো ৫টি। আমরা বুধ কিংবা বৃহস্পতিবার যাইব।" জানতে কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক স্ত্রীর এই বিশদ আদেশ কুমুদরঞ্জন ঠিক মতো পালিত করেছিলেন কিনা!

কবি দম্পতির সাত ছেলে তিন মেয়ে। জ্যেষ্ঠ্য পুত্র জ্যোৎস্না নাথ, তারপরে সরিৎনাথ, জগন্নাথ, রেবতীনাথ, পৃথ্বীনাথ, কৌশাম্বীনাথ ও কনিষ্কনাথ। অবশ্য কনিষ্কনাথ এক বছর বয়সে মারা যায়। জ্যেষ্ঠ্যা কন্যা বাসন্তী, তারপর পূর্ণিমা ও অঞ্জলি। খেঁদু বা খাঁদু, ভুঁদু, চাঁদু, গেঁদু, তুতু, ককু বা কোকিল, দিলু, নদু, মধু, ও বুলু বা বুলবুলি ছেলেমেয়েদের পিতামহীর দেওয়া ডাক নাম। অনেক কবিতাই ছেলেমেয়েদের নাতি নাতনীদের নামে লেখা হয়েছে। কবির আত্মকথায় আগেই জানা গেছে যে কবিপুত্রেরা সবাই মাথরুণে তাঁর কাছে বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে সমান মনোযোগ দিয়ে তাঁদের গড়ে তুলে ছিলেন কুমুদরঞ্জন। সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদাধিকারী। পরবর্তী কালে পিতামহ পিতামহী বা মাতামহ মাতামহী হিসাবেও কুমুদরঞ্জন

ও সিন্ধুবালার তুলনা মেলেনা। অধিকাংশ নাতি-নাতনিই তাঁদের কাছে থেকে লেখাপড়া করে। এমনি দুর্জয় তাঁদের স্নেহের টান। এই স্নেহ আরো বেশী গাঢ় ও বর্ণাঢ্য ছিলো কারণ শাসনের কঠোরতা একেবারেই অনুপস্থিত।

শুধু পুত্র-কন্যা নাতি-নাতনি নয় কুমুদরঞ্জনের স্নেহদৃষ্টিতে গ্রামের আপাত নগণ্য মানুষ, ঘরের দাস-দাসী পরিজন, পোষা বা মুক্ত পশুপাখি, গ্রামের গাছ পালা, দেব দেউল, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পদ্মদিঘি কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি— স্নেহের বন্ধনে সকলকে কাছে টেনে নিয়েছেন। গেরস্থালীর বাসন কোশন পুরানো চিঠির ফাইল, পুরনো গ্রামোফোন, ভাঙা বাড়ি কোন কিছুই অকিঞ্চিৎ কর বলে মনে করেন নি। তাঁর কাছে প্রকৃতি যেন মহামায়ার রূপ শরীর। তাই সংসার শুধু নিজের ঘরেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। এই সমস্ত কিছুরই একজন পালয়িত্রী, একজনই মা সমস্ত জগৎ যাঁর আপন সংসার। কুমুদরঞ্জন যেন সেই সংসারের একজন হয়ে থাকতেন। তাই তাঁর জীবনে এবং ফলে লেখায় স্বার্থ সম্ভূত জ্ঞানের একঘেয়েমির কালিমা লাগেনি। বালকের হৃদয়, জ্ঞানীর মন ও সাধুর স্বভাব একসঙ্গে যেন রূপ নিয়েছিল কুমুদরঞ্জনের মধ্যে। সংসার তাঁর কাছে আনন্দময় ছিলো—চিরদিন আনন্দময় ছিলো। এখানে যেন প্রতিমুখে সেই ঈপ্সিত মুখটি দেখতে পেতেন তিনি। সংসারের জোয়াল টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—যে অভিযোগ প্রতিটি ঘোর সংসারী স্বার্থান্ধ মানুষের মুখে শোনা যায়, সে রকম কোন কথা তাঁর মুখে কেউ কোনদিন শোনেনি। এমনকি, 'আমাকে কেউ বুঝলোনা' বা 'আমার যথার্থ কদর কেউ অন্যায় করে দিলোনা' এইসব মুখে মুখে ঘোরা হতাশ বাক্যগুলিও তিনি কোনদিন ভ্রমেও উচ্চারণ করেন নি। সন্তুষ্টিতে যেন বুনো রামনাথের সমগোত্রিয় ছিলেন কবি। বিলাসদ্রব্য যে তিনি কখনো দেখেন নি বা ব্যবহার করেন নি তা নয়। বহু মূল্যবান ও সৌখিন জিনিষ তিনি তাঁর বাপ মার কাছ থেকে উপহার পেতেন। পরিণত বয়সে পুত্রকন্যারাও মহার্ঘ জিনিষ তাঁকে দিতেন। তিনি ব্যবহারও করতেন। কিন্তু মোটা ময়লা কাপড় পরেও তাঁর মুখের কোন বিকৃতি বা মনের কোন অস্বাচ্ছন্দ্য কারো লক্ষ্য গোচর হয়নি। বরং এতেই যেন আরাম পেতেন। বড়ো হৃষ্ট চিত্তে তিনি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতেন—'ও গো মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে'! সত্যি কথা কি নিরানন্দে থাকা কুমুদরঞ্জনের স্বভাবে ছিলনা। দুঃখের তাপ তিনি কম পাননি, বহু যন্ত্রণার, অপমানের নখরাঘাতে তাঁর বুক থেকে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে, সেই রক্তপদ্ম দিয়ে তিনি মায়ের চরণ কমল পুজা করেছেন। সহজেই

(সতেরো)

দুঃখের দুশ্চিন্তার কারাগার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছেন তিনি। বন্যায় তিনি বারবার গৃহহীন হয়েছেন। অর্থাভাবে সংসার প্রায় অচল হতে বসেছে। তবু ক্ষুদ্র গ্রামে খড়ো ঘরে থেকে মোটা ভাত কাপড়ে কিসের যে এতো আনন্দ তার জবাব দিতে পারে কেবল তাঁর স্রোতস্বিনী কবিতাই। এই আনন্দ ধারায় স্নাত হয়ে কুমুদরঞ্জন শুধু যে আপনাতে আপনি মগ্ন ছিলেন তা নয়। সারস্বত সাধনায় ব্রতী সমস্ত কবি সাহিত্যিকই তাঁর পরম আদরের শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। এঁদের মধ্যে জলধর সেন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরিন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিজয়রত্ন মজুমদার, বিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর সময়কার নবীনদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের লেখার প্রশংসা করতেন তিনি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, রণজিৎ সেন, রমেন্দ্র মল্লিক ও লীলা মজুমদারকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কুমুদরঞ্জনের অতিথি হয়ে তাঁর স্নেহ মমতায় মুগ্ধ হননি এমন সাহিত্যিক বাংলা দেশে বিরল। কালিদাস রায় কবিকে আজীবন জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতার সম্মান দেখিয়ে এসেছেন। মধ্যে মধ্যে কবির গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দুচার দিন করে কাটিয়ে এসেছেন। আর কবিও কোলকাতায় এসেই প্রথমে যোগাযোগ করতেন কালিদাস রায়ের সঙ্গে ও তাঁকে কাছে আনিয়ে নিতেন। একবার মৃত্যুশয্যাশায়ী মোহিতলালকে দেখতে ছুটে এসেছিলেন কোলকাতায়। তাঁকে নিজে মঙ্গলচণ্ডীর প্রসাদী নির্মাল্য দিয়ে আরোগ্য কামনা করেছিলেন। মোহিতলাল তাঁর এই স্নেহের পরিচয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। আর করুণানিধান বহুবার কুমুদরঞ্জনের ও তাঁর পুত্রদের অতিথি হয়েছেন। তাঁকে কুমুদরঞ্জন অগ্রজের মতো ভক্তি করতেন। কুমুদরঞ্জনের সংসার যথার্থই কবির সংসার ছিলো—সেখানে সকল কবির জন্যে উন্মুক্ত দ্বার। শুধু সাহিত্যিকরাই নন বিভিন্ন মত ও পথের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও কর্মীরা কবিকে শ্রদ্ধা করতেন ও তাঁর আতিথ্য স্বীকার করে আনন্দ পেতেন—যেমন, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, দাশরথী তা, অতুল্য ঘোষ, আবদুস সাত্তার প্রভৃতি। আবার প্রশাসনে নিযুক্ত বিদেশী বা ভারতীয় ছোট বড় নির্বিশেষে যে কোন কর্মচারিই বর্ধমানে বা কাটোয়ায় এলে কবির গ্রাম ও কবিকে দেখতে আসতে ভুলতেন না। এবং কবিও কাউকে তাঁর

আতিথ্য গ্রহণ না করিয়ে বিদায় দিতেন না। সেই অমল ভালোবাসার উল্লেখ অনেকের লেখাতেই পাওয়া যায়। কবিকে অভ্যর্থনা ও ভালোবাসা জানাতে গিয়ে যেন নিজেরাই সব ভালোবাসা ও অভ্যর্থনা নিয়ে ফিরতেন।

ভারতের সাধু সমাজের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিলো। সাধুর প্রতি অবহেলা ও অমর্য্যাদা যে ব্যক্তির তথা জাতির অমঙ্গল টেনে আনে এ তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর গৃহে সাধুর সমাগম হলে তিনি যেন কৃতকৃতার্থ হয়ে যেতেন। 'কাঙাল হরনাথ' তাঁর পিতার বন্ধু ছিলেন ও কবির পরিজনদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শ্রীবামা ক্ষেপা ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ছিলো অচলা ভক্তি। 'কথামৃত', 'চৈতন্যচরিতামৃত' তাঁর প্রিয় গ্রন্থ ছিলো। বহু সাধু বা সাধকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো। এঁদের মধ্যে শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ কবিকে দাদা বলে সম্মাননা করতেন! পরস্পরের মধ্যে বহু চিঠিপত্রর আদান প্রদান হয়েছিলো। সিউড়ীর স্বামী সত্যানন্দের একান্ত ভক্ত ছিলেন তিনি। তাঁকে সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানে শ্রদ্ধা জানাতেন। তাঁর আশীর্বাদী নির্মাল্য বা বিভূতি পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন। কুমুদ-রঞ্জনকে 'কবিসুন্দর' উপাধি তাঁর দেয়া। সাধক দিলীপ রায় কবিকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। অনেক চিঠি লিখেছিলেন কবিকে, নিজের প্রায় প্রত্যেকটি বই উপহার দিয়েছিলেন ও তাঁর আশীর্বাদ চাইতেন। কিরণচাঁদ দরবেশজী তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর একটি চিঠিতে জানা যাবে তিনি কবিকে কি ভাবে দেখেছিলেন। তিনি লিখছেন : "আপনি মহাশয় ব্যক্তি, চিরজীবনই একেবারে খাঁটি কবি. তাহা নানা জনের মুখে শুনিয়াছি। এবং আপনার কবিতার ভিতর দিয়া জানিয়াছি। পুরুলিয়ার শ্রীমান অন্নদাকুমার ভট্টাচার্য্য আপনার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত, তাহার মুখে আপনার দৈনন্দিন জীবনের যথেষ্ট আভাস পাইয়াছি। সংসারের আবিলতা কখনও আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না।" পত্রোক্ত অন্নদাকুমার উত্তর কালের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাধক স্বামী অসীমানন্দ।

এই প্রসঙ্গে কুমুদরঞ্জনের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কেননা তাঁর সাহিত্যের মেরুদণ্ডই হচ্ছে তাঁর আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা। আগেই বলা হয়েছে ঈশ্বর বিশ্বাস কুমুদরঞ্জনের মনে আজন্ম। তিনি যেন ভক্তি ও বিশ্বাসের বর্ম পরে জন্মেছিলেন। এ সম্পর্কে কবি নিজে লিখছেন :— "আমার শৈশবে বাড়ির ভক্তিময়ী পরিস্থিতি আমাকে ভগবানের উপর নির্ভর শিখাইয়াছিল। গরীবের ছেলে সকল বিষয়েই ভগবানের কৃপার উপর যেন নির্ভর করিতে হইত। বনের বুড়ার দেয়াসী, লোচন দাসের পাটের মহান্ত,

মা মঙ্গলচণ্ডীর পাণ্ডা, ধর্মরাজের পূজারী এইসব লোকের নিকট যে সব অলৌকিক কাহিনী শুনিতাম তাহাতে ঈশ্বর বিশ্বাস আমার দৃঢ় করিয়াছিল, সে সকল কথার সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারণ করিতে বয়স হইলেও চেষ্টা কখনো করি নাই। বাউলের গান, যাত্রার গান, মেঠো গান আমার ধর্ম শিক্ষক ছিল। 'বাজিকরের মেয়ে শ্যামা তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি, / পুতুলবাজির পুতুল আমরা মরতে মরি বাঁচাও বাঁচি'—আমি অবাক হইয়া শুনিতাম এবং অনন্ত আনন্দ পাইতাম। আমাদের যে ঘোষ দুধ রোজ দিত, সে খুব বৃষ্টি বা রোদ হইলে বলিত, তার উপর তো কথা চলবে না,. যা ইচ্ছা তাই করবে—তার আইন আলাদা"। তাঁর লেখাতেও এই মূর্ত বিশ্বাস ও ভক্তি একটি নিজস্ব রূপ বা বিশিষ্টতা পেয়েছিলো। মামুলি ভক্তিমূলক রচনা সেগুলি নয়। "ভগবতী যার সমুখে তাহার বৃথা ভাগবৎ পাঠ কেনে" বা "রেখে গেনু দেব আঁখির তিয়াষা আরতির দীপে তুলি" বা "তিনি বিশ্বাস তিনি নিঃশ্বাস মাআমার রাজরাজেশ্বরী"—এই সব কাব্যাংশে একথাই প্রমাণিত হয় যে কুমুদরঞ্জনের আধ্যাত্মিক সাধনা মামুলি পথে চলেনি। কবিতা লেখাই তাঁর পুজা। কবিতাই তাঁর অর্ঘ, মন্ত্র ও উপচার। কবিতাতেই তাঁর আধ্যাত্মিক সিদ্ধি এসেছিলো।

মনেপ্রাণে খাঁটি হিন্দু ছিলেন তিনি। "লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম হই যেন আমি হইগো হিন্দু" এটি শুধু সার্থক উক্তি নয়, এটি তাঁর জীবনের চির জ্বলন্ত প্রার্থনা। সোমনাথ ধ্বংসের ব্যথা তিনি রক্তে মাংসে ও সত্তায় অনুভব করতেন। এও বিশ্বাস করতেন যে কোন জন্মে তিনি সোমনাথের পুজারী ছিলেন এবং বিধর্মী আক্রমণকারীর হাতে মন্দিরেই নিহত হয়েছিলেন। সোমনাথ দেবের ওপর ১০৮টি কবিতা লিখে 'গরলের নৈবেদ্য' নামো একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও রেখে গিয়েছেন। তার প্রথমে একটি মর্মস্পর্শী পদের উদ্ধৃতি আছে —"আমার কপাল মন্দ / ওহে শ্রীগোবিন্দ / গরলের নৈবেদ্য / করহে ভক্ষণ।" শিব ও নারায়ণ তাঁহার কাছে এক। হিন্দুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। পরম বৈষ্ণব ও হিন্দু হলেও কোন কুৎসিৎ গোঁড়ামি তার ছিলনা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তিনি মহৎকে, বরেণ্যকে এবং পুজ্যকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্যকে তিনি একাসনে বসাতে পেরেছেন। স্বাজাত্যাভিমান তাঁর ছিলো, কিন্তু রুচি ছিলনা সাম্প্রদায়িক কুৎসায়। বহু মুসলমান ছাত্রকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহে লালন করেছেন এবং মানুষ করে দিয়েছেন। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বহু সৎমুসলমান পরিবারের সঙ্গে সহৃদয় ও প্রীতির সম্পর্ক ছিলো। বিশেষতঃ মঙ্গলকোটের অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের

কাজী নওয়াজ খোদাকে ও তাঁর ভাই আল্লানওয়াজ খোদাকে নিজের অগ্রজ ও অনুজের মতো দেখতেন। এঁরাও কবিকে তেমন ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। দেশভাগের পর কবির অনুরোধ না শুনে তাঁরা বাস্তু বিনিময় করে তৎকালিন পূর্বপাকিস্তানে চলে যান। ১৯৫৮ সালে সেখান থেকে কবিকে লেখা কাজী নওয়াজ খোদার একটি চিঠির অংশ তুলে ধরছি। উনি লিখছেন :—"প্রিয়তম ভ্রাত,··· ভাই তোমার ভালবাসা স্নেহ প্রীতি আজীবন ভোগ করে আসছি ও তার পরিচয় বরাবরই পেয়ে এসেছি, আশা করি কবরে যাবার দিন পর্য্যন্ত তা ভোগ করে যাবো। ···একটা ফার্সি কেতাবে একজন খুব নামজাদা লোক লিখেছেন যে অকৃত্রিম বন্ধু ও পরশ পাথর একই জিনিস। যে জীবনে একজন মাত্র প্রকৃত বন্ধু পেয়েছে সে মহাসৌভাগ্যশালী, তোমাকে পেয়ে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করি।" ১৯৬১ সালে ১১ই এপ্রিল ওঁর ভাই কবিকে তাঁর পত্রে 'আপনার একমাত্র অনুজ' বলে লেখেন। কুমুদরঞ্জন যথার্থই বুঝেছিলেন ধর্ম নয়, অন্ধ ধর্মাবলম্বীরাই পৃথিবীতে হিংসা অত্যাচার ও কলুষের জন্য দায়ী। সেই অত্যাচারীদের নিন্দা তাঁর লেখায় থাকলেও তাকে সাম্প্রদায়িকতা দোষ দুষ্ট বলা যায় না। যায় কি? বরং দেখা যায় এই সব লেখা সমবেদনা, ভালোবাসা ও সুস্থ নীতি বোধে উজ্জ্বল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কুমুদরঞ্জনের স্নেহস্নাত হয়ে তাঁকে সাধনগুরু বলে মেনে একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ অজয় তীরের একটি আশ্রমে কুমুদ কিংকর নাম গ্রহণ করে যে শুদ্ধ জীবন যাপন করছেন তা যে কোন বৈষ্ণব সাধুর গর্বের বিষয়।

মনে প্রাণে বিনয়ী বৈষ্ণব হলেও কুমুদরঞ্জনের ব্যক্তিগত জীবনে আত্মমর্যাদা বোধ ও তেজস্বীতার অভাব ছিল না। বহু সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি একা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর অন্যায় দ্রোহিতা ও সহ্য ক্ষমতা যেন উপনিষদের প্রার্থনাকে রূপায়িত করেছিলো—মন্যুরসি মন্যুংময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি। গ্রামের মন্দির, গ্রামের মেলা, গ্রামের পশুপাখি ও গাছপালা যেন তিনি বুক দিয়ে আগলে রাখতেন। এবং সেজন্যে কোর্ট কাছারি যেতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। আদালত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর বহু কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। একবার তৎকালিন মহকুমা শাসকের আদালতে এক ফৌজদারি মকর্দ্দমায় তাকে দাঁড়াতে হয়। প্রতিপক্ষ স্থানীয় কিছু দুর্বৃত্ত। সেই মহকুমা শাসক নিজেও অসৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাই সেই সমাজ শত্রুরা প্রশ্রয় পেতো। আদালতে সর্বসমক্ষে কুমুদরঞ্জন দৃঢ়কণ্ঠে তাকে

লক্ষ্য করে বলেন "আপনিই এই সব গুণ্ডাদলের অভিভাবক।" ফলে আদালত অবমাননার দায়ে কবির পঁচিশ টাকা জরিমানা করেন তিনি। কিন্তু আপিলে সেই অবমাননার কেস ও জরিমানার আদেশ নাকচ হয়ে যায়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ করে লেখা তাঁর অনেকগুলি কবিতা'তূণীর' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'মুচিরাম গুড়' কবিতায় লিখলেন, 'রাসভ খাঁটি পরিপাটি ঘুসের বেলা হায় / সাধু দিগের উপপ্লবে তোমার দিবস যায়। দেমাক তোমার ভারী / হাজত দিতে পারি / হাজত বাসের সম্ভাবনা তোমার যে প্রচুর।'আদালতের অসাধু হাকিমই নন, দুষ্ট ও অশিষ্ট উকিল মোক্তারও তাঁর ব্যঙ্গের হাত হতে রক্ষা পাননি। 'রঘুনন্দন মোক্তারের অভিনন্দন' 'উকিলের মর্ম্মী' কবিতাগুলি তখনই লেখা। লক্ষণীয় এই যে কোন ব্যঙ্গ কবিতাতেই হিংসার জ্বালা নেই। অথচ কাপট্য উন্মোচিত। এই সব কবিতার ব্যঙ্গের তীব্রতায় এবং অনুপ্রাসের পরিহাসে তাঁর প্রিয় পাঁচালিকার কবি দাশরথি রায়ের প্রভাব নজরে পড়ে। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার একটি মুসলমান দুর্বৃত্ত অন্যের প্ররোচনায় কবির গ্রামে কোন দুষ্কর্ম করে। কবি ফৌজদারি মামলা করেন বা করান। তাতে তার জেলের সাজা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, তার অনুপস্থিতিতে কবি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে অর্থসাহায্য দিয়ে ভিন্ন গ্রামে কয়েক বৎসর তার বড় পরিবারটি প্রতিপালন করেছিলেন। জেল থেকে ফিরে এই শুনে লোকটী সাশ্রুনেত্রে তাঁকে প্রণিপাত করে ও তার চরিত্র সংশোধিত হয়ে যায়।

গ্রামে থাকলেও পৃথিবীর সমস্ত খবরই রাখতেন কুমুদরঞ্জন। তাঁর লেখায় এই সদা জাগ্রত উৎসুক ভাবটি লক্ষ্য করার মতো। স্বদেশের প্রায় সমস্ত পত্র পত্রিকা তাঁর কাছে আসতো! নিজেও অনেক বিদেশী পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এক সময়ে Review of Reviews, Punch ইত্যাদি কাগজের তিনি নিয়মিত পাঠক ছিলেন। দেশের সাহিত্য তাঁর সুঅধীত। বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর সমান পরিচয়। 'আত্মস্মৃতি'তে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত বিশ্বাস পছন্দ অপছন্দের কথা বলেছেন কবি। বলেছেন :—"আমি একজন নগণ্য পল্লীবাসী কিন্তু কতকগুলি আমার গোপন কথা আছে যাহা বলিবার সুযোগ হয় নাই, এখন না বলিলে আর বলিবার অবসর বোধহয় হইবে না। আমি জার্মানীর কাইজারকে অতিরিক্ত ভক্তি করিতাম, দ্বিতীয় জার্মান যুদ্ধে আমি হিটলারের একান্ত অনুরাগী, তাঁহার পরাজয়ে আমি অবসন্ন হইয়াছিলাম, শ্বাসভঙ্গের উপক্রম হইয়াছিল। এসবের কোন কারণ বা যুক্তি নাই, স্বার্থেরও কোন গন্ধ

নাই। হুরেণবার্গে সমরনায়কগণের বিচার ও ফাঁসি যেমন ঘৃণ্য তেমনি লোমহর্ষণকর। 'কাইটেলের' পরিবর্তে আমাকে ফাঁসি দিলে আমি আনন্দে সে দণ্ড গ্রহণ করিতাম; ইহা মোটেই অতিরঞ্জিত নহে—ইহাতে একটু অসরলতা নাই। নন্দকুমারের ফাঁসি ও জোয়ান ডি আর্ককে অগ্নিতে দাহন ইংরাজ জাতির মহা পাপ ও কলঙ্ক; উহা ঐ জাতিকে অভিশপ্ত করিয়াছে। ইংরাজ জাতির দুটি মেয়েকে আমি ভালোবাসিয়াছি—একটি Wordsworth এর Lucy Grey আর অপরটি Dickens এর Little Nell. আমার ধারণা ভারতবর্ষে বৃটিশদের মাত্র দুইটি স্থায়ী প্রতিনিধি থাকিবে, এক David Hare আর দ্বিতীয় Annie Besant. ইংরাজদের মৃত কবি কিপলিং আর জীবিত বাক্য ও কর্মবীর চার্চ্চিলকে ভালোবাসি; বৃটিশ সাম্রাজ্যের দুটি Deep-mouthed watch dog হিসাবে।"—কবির উপরোক্ত মত ও ধারণার সঙ্গে অনেকেরই হয়তো মিলবে না, কিন্তু কবির যা সত্য তা তিনি নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে প্রকাশ করেছেন।

শুধু মাত্র নৈষ্ঠিক শিক্ষকতা, অনলস সাহিত্য চর্চ্চা নয় কবি নিজেকে অনেক সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছিলেন। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রসারে তাঁর চিরদিনই আগ্রহ। আবার গ্রামের অর্থনৈতিক বনিয়াদ যাতে বলিষ্ঠ হয় সেদিকেও চিন্তা করেছিলেন। সমবায় আন্দোলনের দিকে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো। গ্রামে একটি সমবায় গ্রামীন ব্যাঙ্ক সুরু করেছিলেন এবং মহকুমার সমবায় ব্যাঙ্কের প্রসারে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। দুঃস্থ, অভাবী ও বন্যাপীড়িত গ্রামবাসীদের মধ্যে সরকারী বা বেসরকারী দানসামগ্রী বিতরণের ভার সানন্দে গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন গ্রামবাসীদের অবস্থার সঠিক পরিচয় জানা থাকায় নিষ্ঠা ও গভীর দরদ দিয়ে ন্যায্য বিতরণ করতেন ও তার নিখুঁত হিসাব রাখতেন। কাটোয়া মহকুমা বন্যাপ্রবণ মহকুমা সুচিরকাল। তরুণ বয়সে কুমুদরঞ্জন বন্যা ত্রাণ সংগঠনের পুরোধা ছিলেন। ১৯৪৯ সালে ৮ই মে স্থানীয় 'অজয় কুনুর বন্যা প্রতিকার সম্মেলনে' সভাপতির অভিভাষণে যা বলেছিলেন তা এক বলিষ্ঠ গঠন মূলক মনোভাব সম্পন্ন সুনাগরিকের চিন্তার পরিচয় ন্যায়। তিনি ৩১।৩২ বছর আগে যা বলেছিলেন তা এখনো প্রণিধান যোগ্য। বলেছিলেন:—"স্বাধীন দেশের অধিবাসী হিসাবে আমাদের দায়িত্বও বাড়িয়াছে। জাতীয় সরকারের এক কপর্দ্দকও অনর্থক ব্যয় করাইব না এবং করাও সমর্থন করিব না, কিন্তু যাহা অবশ্য করণীয় সে বিষয়ে সরকারকে উদাসীন থাকিতেও দিব না। বন্যা রোধের জন্য বাঁধ বাঁধাইবার খরচ

বাঁচাইতে গিয়া বন্যা রিলিফ কার্য্যে পৌনঃপুনিক মোটা খরচ আমরা নিছক অপব্যয় মনে করিব। আবাদী জমিকে পতিত হইবার সুযোগ দিয়া "খাদ্য বাড়াও" প্রচার কার্য্যও পণ্ডশ্রম ও ধন ক্ষয় বলিয়াই গণ্য করিব। ... বন্ধুগণ, আমাদের সঙ্ঘ শক্তিকে আরও কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে, বাঁধ কমিটির কর্ম্মীগণের সহিত একপ্রাণে যোগ দিয়া আন্দোলনকে দুর্দ্দমনীয় করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা সরকারকে কল্যাণকৃত জানি, সরকারের প্রতি বিশ্বাস হারাইবনা।...আমাদের শক্তি ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করিব যেন আমাদের সঙ্গত দাবী আর উপেক্ষিত ও অবহেলিত না হয়। ...সরলতা, সততা ও ভগবানে নির্ভর আমাদের পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্য ইহা যেন আমরা কোন ক্রমে না হারাই। অভাব অনটন আমাদিগকে দীন করে করুক। হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও স্বার্থপরতা যেন আমাদিগকে হীন না করে। আমাদের প্রাচীন বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়া নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও উদার প্রাণ লইয়া আমাদিগকে স্বাধীন নবজীবন আরম্ভ করিতে হইবে। পল্লীগুলিকে আমরা শান্তি নীড় ও পুণ্যতীর্থ করিয়া গড়িয়া তুলিব। শুধু সরকার কেন ভগবান আমাদের সহায় হইবেন, সর্বকার্য্যে আমরা জয়যুক্ত হইব।" এতোদিন পরেও কুমুদরঞ্জনের প্রাণের সামগ্রী উজানি কোগ্রাম বন্যার গ্রাসে আজ একটি শ্রীহীন ধ্বংসের কংকাল।

কুমুদরঞ্জন তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যে ইতিহাস রচনা করেছেন তা হয়তো ভবিষ্যতে যোগ্য অভিনন্দন পাবে। খুব কম কবিরই জীবন এমন ব্যপক, এমন উদার এমন নির্লিপ্ত কল্যাণকৃৎ। কোন পুরস্কারের আশায় তিনি বুক বাঁধেন নি। জাদুঘরে নিজের পাণ্ডুলিপি জমা রাখেন নি কাল স্পর্শ করবেনা ভেবে। মহাকালের পায়ে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন সর্বতোভাবে। সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছিলো ১৯৭০ সালে—মৃত্যুর কিছু আগে। সে তাঁর উপযুক্ত হয়েছিলো কিনা এখানে বিচার্য নয়। তাঁর বহু অনুরাগীই একে তুচ্ছ সম্মান বলে কবির কাছে ক্ষোভ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু যিনি আজীবন 'যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসরঃ', তিনি চিরবালকের মতো সেই পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন চিরআরাধ্যা জননীর দেয়া প্রসাদী পদ্মফুল মনে করে। তাঁর জীবনে কোন মিথ্যা ছিলনা। চৈতন্যে কোন কালিমা ছিলনা। নিজের সমস্ত দুঃখ ক্ষতি তিনি জননীর—যিনি ঘরে বিশ্বে বিরাজিতা—মুখপানে আহত শিশুর মতো তাকিয়ে সহ্য করেছেন। তাঁর ব্যঙ্গে বিষ ছিলনা। তাঁর চরিত্রে কোন ফাঁকি ছিলনা। তাঁর জীবন প্রমাণিত করেছে তিনি সত্য সত্যই অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ / নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখ

সুখঃ ক্ষমী ॥ যে মুষ্টিমেয় মানুষ ন শোচতি ন কাঙ্খতি মন নিয়ে পৃথিবীতে এসে একে পবিত্র ও পুণ্য করে যান কুমুদরঞ্জন নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। কি পুত্র, কি স্বামী, কি পিতা, কি পিতামহ, গৃহস্থ, গুরু, সাধক, নাগরিক সব দিকেই তিনি যেন মূর্ত আদর্শ। সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করলে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে কুমুদরঞ্জনের জীবন এক পূর্ণ মানুষের, এক পূর্ণ ও সার্থক লোকোত্তর কবির।

(২)

ভূমিকার প্রথম অংশে উল্লেখিত হয়েছে কুমুদরঞ্জনের জীবন ও জীবনের প্রধান ঘটনাবলি যা তাঁর কবি মানসকে একটি সমর্পিত পূর্ণতা দিয়েছিলো। এই আবহমণ্ডলকে—যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও ভাবধারা বিকশিত ও বিধৃত—না জানলে তাঁর এবং তাঁর কবিতার সুষ্ঠু মূল্যায়ন সম্ভব নয়। অবশ্য স্থানাভাবে তাঁর সম্পর্কে অনেক কথারই পূর্ণ উল্লেখ বা আলোচনা সম্ভব হয়নি।

কুমুদ কাব্যমঞ্জুষা কুমুদরঞ্জনের সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী রচিত অসংখ্য কবিতা হতে নির্বাচিত একটি প্রামাণ্য সংকলন। আগে বলা হয়েছে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'নব্য ভারত' পত্রিকায়, যখন তিনি মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র। সেই হতে মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত তাঁর লেখনী সবল ও সচল ছিলো। হিসেব করে দেখা যায় তিনি প্রায় ৭৫ বছর এক নাগাড়ে কবিতা লিখেছেন। সেই সঙ্গে কিছু কিশোর উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ও কয়েকটি ছোট গল্প।[১] এই সুদীর্ঘ নিরবিচ্ছিন্ন সারস্বত সাধনা খুব কম কবিই করে যেতে পেরেছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে কবির রচনার পরিমাণের তুলনায় প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় নগন্য। প্রকাশিত কবিতা কয়েক সহস্রের কম নয়। কিন্তু প্রকাশিত কবিতার বই মাত্র ১৩ খানি—শতদল, বনতুলসী, উজানী, একতারা, বীথি, চূণ ও কালি, বনমল্লিকা, দ্বারাবতী. রজনীগন্ধা, নূপুর, অজয়, তূণীর ও স্বর্ণসন্ধ্যা। অনবধানবশত, গ্রন্থপরিচয়ে 'তূণীর' এর উল্লেখ হয়নি। এটি ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত। একটি কবিতায় গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে দেবর্ষি নারদকে। প্রায় সমস্তই ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের কবিতা। মাথরুণে যে বিরক্তিকর বিরূপ পরিবেশ ও অবমাননার বিরুদ্ধে কবিকে এক সময় লড়তে হয়েছিলো তারই স্পষ্ট আভাস এই গ্রন্থের অনেক কবিতায় দেখা যায়। রচনা কাল মনে হয় ১৩২৯—১৩৩৪ সাল। বহু ভণ্ড পাষণ্ড মিথ্যাচারী ক্ষমতাবানের মুখোশ খুলে দিলেও কোন কবিতাতে উৎকট ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই—বরং সত্য এবং মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাই লক্ষিত হয়। ভূমিকার কবিতার শেষ স্তবকে কবি লিখেছেন: "কবির ছোট শর! / ভণ্ড-খলে বিঁধবে

পারে / আসল মেকী চিনতে পারে / অনুরাগে, জিনতে পারে / বিশ্ব চরাচর।" যাইহোক এই সমস্ত গ্রন্থই কবির নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত, কেবল 'কুমুদরঞ্জনেয় শ্রেষ্ঠ কবিতা' ও 'কুমুদ কাব্যসম্ভার' এই দুটি সংকলন কোলকাতায় এক গ্রন্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছিলেন কবির জীবদ্দশায়।

এই বইগুলির কোনটিই বহুদিন আর পুনঃমুদ্রণ হয়নি। না কবি না কোন প্রকাশক কোন তরফেই পুনঃমুদ্রণের উৎসাহ দেখা যায়নি। তাছাড়া গ্রন্থের প্রকাশে বা মুদ্রণে কবির বিশেষ আসক্তি বা আগ্রহ ছিল না। কালিদাস রায় ঠিকই বলেছেন: "কুমুদরঞ্জনের কবিতা রচনা দেবার্চনার মতো। নানা ফুল দিয়া তিনি পূজা করেন ইষ্ট দেবতাকে—তারপর সেই পুষ্পগুলির প্রতি আর তাঁহার মমতা থাকে না—সেইগুলিকে ভাসাইয়া দেন কালের অজয় স্রোতে। কোথায় কে সেই প্রসাদী কুসুম তুলিয়া শিরে ধারণ করিল, তিনি তাহার সন্ধানও রাখেন না।" কবির নিজের কথা আরো গভীর, সুন্দর ও ব্যঞ্জনাময়। লিখছেন: "কবিতা লেখা আমার সখ বা জীবিকা নহে, উহা আমার জীবন। উহাদের মধ্যেই আমার জীবন ধারা প্রসারিত। কবিতা আমি লিখিব বলিয়া লিখিনা। রূপ গন্ধহীন হইলেও উহারা দেব অঙ্গনের ফুল—আপনিই ফোটে, আমি গড়িনা—আর ও সব ফুলই পল্লীজননীর পূজার ফুল।" একটি দিব্য স্বতঃস্ফূর্ততা কুমুদরঞ্জনের কবিতার প্রাণশক্তি। সে ব্যঙ্গ কবিতাই হোক, বা ভালোবাসার কবিতাই হোক বা আত্মজ্ঞান বা ভক্তি বিশ্বাসের কবিতাই হোক, সব কবিতাতেই এই প্রাণ শক্তি সমভাবে বিদ্যমান।

বাংলা সাহিত্যে কুমুদরঞ্জনের প্রবেশ ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে। 'শতদল' ও 'বনতুলসী'র কবিতা মূলতঃ ব্যঙ্গ ও নীতি বোধের কবিতা। কিছু কবিতা ঈশ্বর বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উদ্ভাসিত। অতি অল্প বয়সের রচনা হলেও এই বই দুটির কবিতা পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন—"আপনার কবিতা আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে অম্লান শোভায় বিরাজ করিবে।" রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন কবি আশীর্বাদের মতোই বরণ করে নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কাছে কবি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কবির জীবনে একটি পরম ঘটনা। কবির রবীন্দ্র-সান্নিধ্য ঘটে যখন তিনি এফ, এ, (পরবর্তীকালের আই, এ,) দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। একটি প্রবন্ধে কবি লিখছেন: "আমি গিয়া বিশ্বকবির চরণে ভক্তিভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম নিবেদন করি ও পদস্পর্শ করিয়া লই। জীবনে এ যে একটি অমর মুহূর্ত। আমি কৃতার্থ হইলাম। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া আমাকে বলিলেন 'এসো

কবি কুমুদরঞ্জন এসো।' আমি তো একেবারেই আনন্দে অভিভূত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে কবি বলিলেন—এ সৌভাগ্য পায় কে।" অসামান্য রবীন্দ্র ভক্ত হলেও কুমুদরঞ্জনের লেখায় রবীন্দ্র প্রভাব, ভাব ভাষা ভঙ্গি ও বিন্যাসে—অতি সামান্যই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সব দেশেই কিছু কাকাতুয়া সমালোচক আছেন, এঁরা কবিদের একটি বিশেষ মার্কা দিয়ে—সত্যানুগ বা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হোক বা না-ই হোক—এবং গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে পরম স্বস্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এবং বারবার সেই একটি কথাই উচ্চারণ করতে থাকেন। কেননা খুব বেশি বিশ্লেষণ করা বা বিচার করা তাঁদের সাধ্যও নয় লক্ষ্যও নয়। আমাদের দেশেও এই ধরণের সমালোচক প্রচুর। কুমুদরঞ্জন সম্পর্কে এঁদের ধারণা প্রায় এই রকম :—ও কুমুদরঞ্জন? যিনি পাড়াগাঁয়ে থাকেন, পরম বৈষ্ণব, গলায় কণ্ঠি আর লিখেছেন—বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে? তিনি তো রবীন্দ্র প্রভাবিত পল্লী কবি! ওঁরা মনে করেন কুমুদ রঞ্জন এক অন্ধ অজ পাড়াগাঁর বাসিন্দা, শহরের জটিল জীবন এবং যুগযন্ত্রণার কোন খবরও রাখেন না এবং কবিতাতেও তার কোন স্বাক্ষর নেই। এই ভ্রান্ত ও গণ্ডীবদ্ধ সমালোচকদের সঙ্গে বাদানুবাদ করার লক্ষ্য এই প্রবন্ধের নয়। কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচারও এই ভূমিকায় সম্ভব নয়। তবে এই টুকুই বলা যে আজীবন পল্লিবাস কুমুদরঞ্জনের জীবনের একটি বড় ঘটনা হলেও তাঁর রচনা নিছক পল্লীকথা নয়। আর রবীন্দ্র প্রভাব? ভারতবর্ষের ওপর দেবতাত্মা হিমালয়ের যে প্রভাব, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তেমনই। এমন কোন কবি কি এখনো আছেন যিনি রবীন্দ্ররীতি বা প্রভাব সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে উঠেও সার্থক কবি হয়েছেন? ভাব, বিষয় বস্তু, ছন্দ আঙ্গিকের তো কথাই নেই—কবিতায় রুচি সীমাজ্ঞান এবং উপলব্ধির রূপময় প্রকাশ তো রবীন্দ্রনাথের শেখানো। তবে এই সত্তার প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন প্রভাব সত্ত্বেও ভাব ভাষা ও আঙ্গিকের তফাৎ কোন কোন কবির সঙ্গে থাকবেই। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় সেই পার্থক্য সহজেই লক্ষ করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক নামধেয় কবি বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্র দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষা ও আঙ্গিকের যে প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধানে তা প্রায় অনুপস্থিত। অবশ্য কোন কবি রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত কিনা এ প্রশ্ন তুচ্ছ ও অবান্তর। শেষ পর্যন্ত কবি কি না এটাই বড়ো কথা!

আঙ্গিকে 'শতদল' ও 'বনতুলসী' রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র সমশ্রেণী হলেও

প্রকাশভঙ্গি ও উপমার নূতনত্বে কবির কিছু বিশেষত্ব ও নিজস্বতা নজরে আসে। কিন্তু 'উজানি' কাব্য গ্রন্থ হতেই যেন কুমুদরঞ্জনের কবিতার মোড় ঘুরে যায়। 'বনতুলসী'র পূজা মঞ্চ থেকে উত্থিত হয়ে কবি যেন বিশাল জগতের মর্ম ও কর্ম স্রোতে তাঁর সত্বাকে বিলীন করে দিলেন। নীতির জগৎ হতে কবি পৌছে গেলেন ধ্যান জ্ঞান ও প্রেমের জগতে। যা ছিলো নিগূঢ় ও বিমূর্ত তা হলো বাস্তব ও মূর্ত। একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে অনেক কবির ক্ষেত্রে যেমন একটি আরম্ভ বিকাশ ও পরিণতির দীর্ঘ পদযাত্রা চিহ্নিত থাকে, কুমুদরঞ্জনের কবিতায় সেই ধাবমান অগ্রসরতা নেই, বিশেষত 'শতদল' ও 'বনতুলসী'র পর। 'উজানি' তে যে পরিণত চেতনা কবিতাকে প্রাণবন্ত করেছে সেই একই চেতনা শেষ জীবনের কবিতাতেও। উপলব্ধি গাঢ়তর হয়েছে, প্রকাশ বর্ণাঢ্য হয়েছে, ভক্তি ভালোবাসা নিবিড় হয়েছে, কিন্তু রূপান্তর হয়নি। কুমুদ রঞ্জনের কবিতায় নদীর গতিপথ আবিষ্কার করা যাবে না। বরং তা সমুদ্রের মতো অচঞ্চল, রত্নগর্ভ ও অনন্তশায়ী। গণ্ডগ্রামে বাস করেও কুমুদরঞ্জনের মানুষের প্রতি—যে মানুষ পৃথিবীর সর্বত্রই এক—টান শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তাঁর ঈশ্বর ভক্তির চেয়ে কম নয়। যে মূল্যবোধ মানুষকে মনুষ্যত্বে অলংকৃত করে এবং যে মূল্যবোধহীনতা মানুষকে পশুত্বে নির্বাসিত করে সেই মূল্যবোধের মহিমা কুমুদঞ্জরনের কবিতার একটি প্রধান অবলম্বন। এই মূল্যবোধের পাদভূমিতে আছে, দেশ জাতিধর্ম নির্ব্বিশেষে ভালোবাসা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্ম-মর্য্যাদা বোধ, দেশপ্রেম বা ভক্তি এবং ঈশ্বর বিশ্বাস। এই সংকলনের বহু কবিতাতেই এর সমর্থন পাওয়া যাবে। তথাকথিত সামান্য মানুষ অসামান্য হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায় এই মূল্যবোধের আলোয়। এখানে আরেকটি কথা একটু স্পষ্ট করে বলা দরকার। কুমুদরঞ্জনের দেশ প্রেম বা ভক্তি গণ্ডীবদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক প্রেম ভক্তি নয়। হিন্দুর বিশ্বাস সমবেদনা ও উদারতায় কুমুদরঞ্জন তাঁর এক অখণ্ড ভারতবর্ষকে গড়েছেন এবং পূজা করেছেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা ভাব ভাষা রীতিনীতি আহার বিহারের যত পার্থক্যই থাকুক, ভারতবর্ষ এক, তার হিন্দু রক্তে, হিন্দু ধর্মে। এই ধর্ম মানুষকে ঈশ্বর করেছে, আবার ঈশ্বরকে মানুষ করে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরেছে পরাণের পরাণ নীলমণি বলে। এই চিরায়ত ভারতবর্ষের সঙ্গে কবির আত্মার যোগ যেন জন্ম জন্ম। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় এই জন্মান্তর সঙ্গতি একটি প্রধান সম্পদ। জন্মান্তর বাদে কবি গভীর ভাবে বিশ্বাস করেছেন। একটি কবিতায় লিখেছেন : "কভু যমুনায় কভু

সরযূর তীরে। নারায়ণে আমি হেরেছি নরের ভিড়ে। / ভিক্ষু হইয়া ছিলাম অজন্তাতে। / সোমনাথে আমি লড়েছি পাঠান সাথে। / নিরঞ্জনার তীরে করিয়াছি দান। / মহাপথে আমি করিয়াছি প্রস্থান, / ত্যাগ করি দেহ আমিই কাম্যকূপে। / গিয়েছি এসেছি হেথা নব নব রূপে।" প্রাণের এই প্রবহমানতা কি অপূর্ব শুচিও শ্রদ্ধাময়।

প্রকৃতি কুমুদরঞ্জনের কবিতায় একটি বিশেষ রূপ ও আসন পেয়েছে। নিছক পটচিত্র হিসাবে নিসর্গ তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হয়েনি। প্রকৃতি ঈশ্বরের অন্যতম প্রকাশ। তাই প্রকৃতিও কবির কাছে সম মর্য্যাদা ও পূজা পেয়েছে।

রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, প্রবলের অত্যাচার, মূর্খামি, ভণ্ডামি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কোন কিছুকেই কবি উপেক্ষা করেন নি। সুদূর পল্লীগ্রামে থেকেও তিনি সমস্ত কিছুতেই সমান আগ্রহী ছিলেন। বহু কবিতাতেই তাঁর চলমান জীবনে আগ্রহের এবং অংশ গ্রহণের সার্থক প্রয়োগ পাওয়া যায়। পরিচ্ছন্ন রসবোধ, কণ্টকহীন হিউমার, তীব্র অথচ নির্দোষ ব্যঙ্গ কবিতায় তিনি সিদ্ধহস্ত। জীবনের সাধারণ সুখ দুঃখকেও তিনি কবিতার বিষয় হিসাবে উপেক্ষা করেন নি। যেহেতু তিনি মানবতার অমৃত সম্পদে ধনী ছিলেন তাই সাধারণ সুখ দুঃখের চিত্রও তাঁর হাতে কালোত্তীর্ণ হয়ে অমরত্ব লাভ করেছে।

কুমুদরঞ্জনের কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকেই সত্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায় ও রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। মোহিতলাল তাঁর 'কুমুদকাব্য পরিক্রমা'[২] প্রবন্ধে কুমুদরঞ্জনের কবিতায় মানবতা বা মানুষ পূজার কথা পরিস্ফুট করেছেন এবং খাঁটি বাঙালি কবি বলে অভিহিত করেছেন। 'অজয় কৌমুদি'[৩] নিবন্ধে কালিদাস রায় কুমুদরঞ্জনের জীবন ও কাব্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর সব বক্তব্যকে সমর্থন না করা গেলেও এই প্রবন্ধটি কবির মূল্যায়নে যথেষ্ট সাহায্য করবে। তিনি কবির কবিতার মূলে, জন্মভূমির প্রতি, বাংলার প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও নরনারীর প্রতি গভীর প্রেম লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আরো নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে এই প্রেম বা ভালোবাসা শেষ পর্য্যন্ত অখণ্ড ভারতবর্ষ বা বিশ্বের প্রতি ভালোবাসা। এই সার্বজনীনতা বা বিশ্বাঙ্গতা কুমুদ কবিতায় বিশেষভাবে চিত্রিত। 'মাঠের জলের জলতরঙ্গ'[৪] নিবন্ধে রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত বড়ো সুন্দরভাবে কুমুদকবিতার

ভাব ও বিষয় বৈচিত্রের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন "কুমুদরঞ্জন তাঁহার নিজের কথায় 'নানা পণ্যের অধিরাজ', তাঁহার মন রস ভূয়িষ্ঠ ভাব ভূয়িষ্ঠ মন।" আরেকটি সত্য তিনি নির্ধারণ করেছেন, যা কুমুদরঞ্জনের কবিতা প্রসঙ্গে অনেক সমালোচকই লক্ষ্য করেননি। তিনি লিখছেন: "কুমুদরঞ্জনের কোন ছত্রেই ভাষার ছটায় ভাব বিনষ্ট হয় নাই। তাঁহার ভাবে সংযম, ভাষায় সংযম। যাঁহারা কবিতা পড়িয়াই জিজ্ঞাসা করেন ইহা শ্রেষ্ঠ কবির রচনা কিনা তাহারা এই সংযমের মাহাত্ম্য বোধ হয় বুঝিবেন না। যাঁহারা বুঝিবেন তাহারা বলিবেন কুমুদরঞ্জন শুধু কবি এবং সুকবি। সাহিত্যের এই দুঃসময়ে ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য।" কুমুদ-রঞ্জনকে শ্রেষ্ঠ কবি প্রমাণ করার মূঢ় উদ্দেশ্য বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকাকারের নেই। কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ও বিচিত্র কাব্য ধারার আলোচনায় এইটিই পরিস্ফুট হয়েছে যে তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম সারির কবি।

ভাবে ও ভাষার যতোই প্রগাঢ়তা বা গভীরতা থাক, কুমুদরঞ্জনের কবিতা কখনো দুর্বোধ্য হয়নি। কিন্তু তাতেও সমালোচকের নিগ্রহ থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন বলে মনে হয় না। একটি সহজ বিধুর কবিতা বিজ্ঞ সমালোচকের হাতে পড়ে যে দশা লাভ করেছে তা যুগপৎ হাস্যকর ও করুণ। "অজয়" কাব্যগ্রন্থে 'ফিরে' কবিতাটি (এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত নয়) মাতৃগৃহে ফিরে আসা একটি নববিবাহিতার সদ্যবৈধব্যের বেদনার চিত্র। "ফিরে এলাম তোমার কোলে / আবার এলাম ফিরে। / অভাগিনীর বেশে মাগো / আকুল আঁখি নীরে। / চন্দ্রহারা কোজাগরে/জাগতে এলাম তোমার ঘরে / সোনালি মেঘ / সজল হয়ে ঘিরলো অবনীরে। / পাঠাইতে পরের ঘরে, কেঁদেছিলে বড় / আজকে কেঁদে ফিরে এলাম, মাগো কোলে কর। / রেখেছিলাম বক্ষে চাপি / হারিয়ে এলাম সিঁদুর ঝাঁপি / অভাগিনী পাগলিনী / কাঁকণ হানি শিরে। 'আধুনিক কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন'[৫] নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে অমিয় রতন মুখোপাধ্যায় এই কবিতাটি উল্লেখ করে বলছেন: "চিত্রখানি বেশ করে আস্বাদন করুন। শুধু জন্মভূমিতে ফিরে আসার ভাবচিত্র না, মাতা পুত্রীর মিলন চিত্রও বটে। মেনকা-উমার মিলন-রসের চির নবত্ব এর রেখা শিল্পে। পরবাসিনী কন্যা ফিরেছে মাতৃকোলে। এতোকাল চাঁদপানা মেয়ে ছিল পরবাসে। বিষাদিনী মায়ের চোখে তাই ঘুম ছিল না।" নিগ্রহ এখানেই শেষ নয়। এরপরও বিস্তর (অপ) ব্যাখ্যা আছে। সবটুকু পড়লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে না বলে পারা যায় না—হায় সমালোচনা, হায় সমালোচক, হায় কবি,

হায় কবিতা, হা বাংলা দেশ! এই নিবন্ধটিও কবির জীবৎকালে প্রকাশিত। কোন কোন তুখোড় ব্যক্তি বলতে পারেন ব্যাখ্যা যদি ভুলই হবে কুমুদরঞ্জন প্রতিবাদ করেননি কেন! নিজের লেখা সম্বন্ধে কবির একধরণের নির্লিপ্ততা ছিলো। তার নিন্দা বা প্রশংসা বা ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যায় তিনি বিচলিত বোধ কখনো করেন নি। ঐ প্রবন্ধ লেখককে ব্যক্তিগত আঘাত করাও বর্তমান লেখার উদ্দেশ্য নয়। এটুকুই শুধু বলা প্রয়োজন সমালোচনা বড়ো নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার বস্তু। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের মেকী পাণ্ডিত্য মুখ্য উদ্দেশ্য হলে সৎ সমালোচনা সম্ভব নয়।

কবিতার মাধ্যমে কুমুদরঞ্জন ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ করতে চেয়েছিলেন কারণ কবিতাই তাঁর পূজা। এই বিমুগ্ধ কবি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন এই বলে: "চাঁদের মতন আলো দিতে দিতে ক্ষয়। / ক্ষয়ী আমি নিজে হইতেছি অক্ষয়।। আমার যা কিছু সবটুকু চন্দন। / সব দিয়ে আমি করি তব বন্দন।" তাঁর পূজায় তিনি সফলকাম হয়েছিলেন। তাঁর ব্রত সাঙ্গ হয়েছিলো। তাই বলতে পেরেছিলেন :—

"ও নাম স্মরণে ও নাম করণে আমি হয়ে যাই পর,
আমার বাঁশিতে সুর দেয় আসি স্বয়ং বংশীধর।
আমি গলে যাই, আমি ডুবে যাই
আমি নিভে যাই, আমি উবে যাই
ক্ষীণ জলকণা মিলাইয়া যাই অমৃতের সরোবরে।"

একজন সদাচারী নিষ্ঠাবান হৃদয়জীবি কবির জীবনে আর অন্য কিসের প্রয়োজন? আর কোন্ জড় সম্মান সম্পদে তাঁকে বরণ করা যাবে? অমৃত পিপাসু কুমুদরঞ্জন অমৃতায়িত।

সুধেন্দু মল্লিক

(১) কিশোর উপন্যাস: মুখোসের দোকান, হরে মাঝি, প্রিয়ঙ্গু ('রামধনু'তে প্রকাশিত)। প্রবন্ধ: আত্মস্মৃতি (মাসিক বসুমতী), আমার মাতাপিতা, প্রভৃতি (ভারতবর্ষ ১৩৫৬) নাটক: পল্লীমধু ('মালঞ্চ' ১৩২৭) কুহেলি (একটি মাসিক পত্রে প্রকাশিত)। গল্প: রোজা (মাসিক বসুমতী), যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন (হিন্দু, পুরস্কার প্রাপ্ত)। অনুবাদ: 'গফুর' প্রভৃতি নিজের কবিতার ইংরাজী অনুবাদ, কলিকাতা রিভিউ। (২) (৩) (৪) (৫) কুমুদ কাব্য পরিচিতি, মিত্র ঘোষ প্রকাশিত ১৯৫৯-৬০: মোহিতলালের প্রবন্ধ 'সাহিত্য বিতান' হতে পুনর্মুদ্রিত।

সূচী

*('তূণীর' ভুলে বাদ পড়েছে। ভূমিকা পৃঃ ২৪ দেখুন)

পাঠশালায়।

— · —

আসিয়াছে ঝুনু বাবু পাঠশালে পড়িতে
মুখে বলে ক খ আর শ্লেটে তাহা মুড়িতে।
কি কেশী বাবরী মাথা তার ঘুরে রে,
বিশ্বের ওটা যেন এক সাথে ঘুরে রে।
হাসিছেন পণ্ডিত খুশী তারে শাসিতে,
গোমুখীর মালা তবু উঁকি মারে ঝাঁপিতে।
পাঠের মুখে উঠে কি আকুতি হাসিয়া,
মাঝে বার ডেকে যেন ক্লান্ত এ পাখিয়া।
এসে দেখি রাঙা হয়ে উঠিয়াছে গণ্ড-
দেশ পাশে বসিছেন যেন মীনকণ্ঠ।

কবির হস্তলিপির প্রতিকৃতি। ২৫২ পৃঃ 'পাঠশালায়' কবিতার পাণ্ডুলিপির অংশ।

কবির প্রতিকৃতি পরিচয়

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত কবির প্রতিকৃতি শ্রীভুনাথ মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত তৈল চিত্র হতে গৃহীত। মূল চিত্রখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে।

শতদল

হিংসা

বুড়া বক শুনি পাপিয়ার মধু-গান,
বলে এরি লাগি এর এতই সম্মান।
ওর চেয়ে ভাল গান কত দিনে রেতে
গাওয়া গেছে ও বয়সে পথে যেতে যেতে।

সঙ্কীর্ণতা

বলিছে কুয়ার বেঙ বাহিরেতে গিয়া
দেখিবার কি বা আছে বল দেখি ভায়া।
যাহা নাই এ কুয়াতে নাহি এ ধরায়
আমাদেরি এক জন বলে গেছে হায়।

বাচাল

আরশোলা বলে টিয়া তুমিও যেমন
জাতিভেদ মানা আর চলে না এখন।
আমরা বিহগ কুল এক হলে হায়
সাম্য, মৈত্রী, একতায় বাঁধিব ধরায়।

মূর্খ

গাধা বলে আমি দাদা দেখিয়া অবাক
বুঝিল না জীব মোর সুগম্ভীর ডাক।
গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব, গভীরতা তার,
শুনিল না পোড়া দেশ বুঝা কোন ছার।

ঘোর বিশ্বাসী

পণ্ডিত বলেন শুন হে বৈষ্ণব ভায়া
ডাকিলে কি হরি আসে যায় তারে পাওয়া
বিশ্বাসী বৈষ্ণব বলে পণ্ডিত গোঁসাই
ডাকিলে আসে না হরি একি বল ছাই।
কোকিলের ডাকে দেখ আসে ঊষারাণী,
চাতক ডাকের বলে জল আনে টানি।
ঝিঁঝিঁর ডাকেতে যদি আসে বিভাবরী,
আমার ডাকেতে কেন আসিবে না হরি।

মহাপ্রাণ

ইক্ষু বলে কল তুমি সুহৃদ আমার
তোমার পীড়নে বহে মোর সুধাধার।
স্বর্ণ বলে অগ্নি কেন লাজ পাও তুমি
বিশুদ্ধ তোমারি স্পর্শে হইয়াছি আমি।
ধর্ম কহে দুখ তুমি পরম মঙ্গল
তোমারি দহনে আমি হয়েছি উজ্জ্বল।

সৎসঙ্গ

কৌটা বলে হে কস্তুরি ভাবি দিবা যামি
কত পুণ্যে তব সঙ্গ লভেছিনু আমি।
চলে গেছ, সুরভিতে তবু বক্ষ মোর
ভূর ভূর করিতেছে, ওগো চিত্তচোর।

কুসঙ্গ

পতঙ্গ বলিছে অগ্নি মুহূর্ত্তেক তরে.
তোর কাছে গিয়া মোর পক্ষ গেল পুড়ে।
ক্ষণিক আমোদ তরে হারালাম যাহা
জীবনের বিনিময়ে যায় না তা পাওয়া।

বাক্য ও কার্য্য

বাক্য বলে আমি বড় কার্য্য বলে হাসি
আমি জল, তুমি মোর শুভ্র ফেন রাশি।

জাতীয়তা

জলহস্তী বলে হাসি প্রবালে ডাকিয়া,
এত প্রাণ ডারি দাও কিসের লাগিয়া ?
প্রবাল বলিছে ক্ষুদ্র প্রাণ দিয়ে বলি,
সুন্দর প্রবাল দ্বীপ মোরা গড়ে তুলি।

লোকহিত

মুমূর্ষু ভ্রমরে ডাকি শুধাইছে যম
এখনো গড়িছ কেন নব মধুক্রম।
ভ্রমর বলিছে হেথা আসিবে যে পরে,
যা পারি রাখিয়া যাই তারি তরে গ'ড়ে।

বই পড়া জ্ঞান

বিদুষী মহিলা পাক প্রণালী পড়িয়া
বলেন রন্ধন সব ফেলেছি শিখিয়া,
বই পড়ে বুঝিলাম এতদিনে আজ
রন্ধন সবার চেয়ে অতি সোজা কাজ।
দিনেক রন্ধনশালে রাঁধিবারে গিয়া
এলেন কেবল মুখ হাত পোড়াইয়া।

———

বন তুলসী

জীবে দয়া

বলেন ডাকিয়া ভক্ত অবোধ শিশুরে
দলিত করো না ওই ক্ষুদ্র পোকাটিরে।
জগতের শত শিল্পী শত যত্ন করে,
ওর চেয়ে ক্ষুদ্র কীটও সাধ্য নাই গড়ে।
ঈশ্বরের প্রয়োজন গড়িতে যাহায়
তাহারে নাশা কি বাছা তোর শোভা পায়?

বিস্ময়

শিল্পকর বলে সদা আমি ভেবে মরি
কি বিরাট কি নিপুণ শিল্পী তুমি হরি।
যে হাত গড়েছে অভ্রভেদী হিমালয়
অদৃশ্য অণুকা তারি গড়া সমুদয়।
জলদের গায়ে যাহে আঁক হে বিজলী
তাতেই কুসুম দলে টান রেখাগুলি।
অপূর্ব্ব তুলিকা যাহা রাঙ্গায় গগন
ছোট প্রজাপতি পাখা সাজায় কেমন।
অতি ক্ষুদ্র তৃণে তব হেরি কারিগরি
বিস্ময়ে পুলকে চক্ষু জলে উঠে ভরি।

মহাকবি

মহাকবি বলে, হেরি মূক মোর বাণী
কি জীবন্ত মহাকাব্য এই বিশ্বখানি।
কি লালিত্য, অলঙ্কারে, অর্থের গৌরবে,
সর্ব্ব রস সমাবেশ, তুল্য নাহি ভবে।

বন তুলসী

এক মহাকাব্য অনবন্থ, অনাবিল,
অমিলের মাঝে নিত্য কি সুন্দর মিল।
কি আশ্চর্য্য প্রতি ছত্রে প্রত্যেক অক্ষরে
করুণা বারিধি কবি নিজে ধরা পড়ে।

বদ্ধ ও মুক্ত

মরাল বলিছে, বক এস মোর সাথে
যাইবে মানস সরে নব বরষাতে।
মরকতে বাঁধা তট, নমেরুতে ঢাকা,
সমীরণ নীলোৎপল পরিমল মাখা।
মরাল যুথের সাথে করিবে ভ্রমণ,
মধুর মৃণাল তুলি করিবে ভক্ষণ।
নাহি ক্লেশ, নাহি দুঃখ, নিষাদের ডর,
পুলকে ভ্রমিবে নীল জলের উপর।
বক বলে, সেথা গিয়া কি হইবে ভাই
গুগুলি কর্দ্দম কীট সেখানে যে নাই।

প্রকৃত সাধক

সংগ্রামী সংসারে থাকি হিংসাদ্বেষহীন
হৃদিখানি থাকে সদা হরিপদে লীন,
স্বার্থশূন্য, পরহিতে রত যাঁর মন,
সেই পঞ্চতপা তাঁর গৃহ তপোবন।

শিশুর সুখ

দূরে উচ্চ তাল গাছে হেরি শিশুকালে
ভাবিতাম স্বর্গ ছোঁয়া যায় সেথা গেলে,
জ্ঞানের সহিত দেখি পাপও গেছে বেড়ে
কাছের সে স্বর্গ মোর গেছে বহুদূরে।

সংযম

ঝটিকা সংযত হয়ে হলে সমীরণ,
কুসুম সুরভি তবে করে বিতরণ ;
নদীর উদ্দাম স্রোত হইলে সংযত,
তবে হৃদে পূর্ণশশী হয় সে বিম্বিত।
সংযম পবিত্র হলে, হইলে নির্মল,
জাগে হৃদে শ্রীহরির মূরতি বিমল।

কবিরাজ

হারায়ে চোখের কাছে জামাতারে আজ
কাঁদিছেন ধন্বন্তরী-কল্প কবিরাজ।
বলেন আমি যে কিছু করিতে না পারি,
তাহাই দেখায়ে দিলে ওহে দর্পহারী।
হৃদে যে লেগেছে ব্যথা, শত প্রলেপেতে
সাধ্য নাই কণামাত্র তাও কমাইতে।
তুমি রাখ, তুমি মার জানিনে কি লাগি
আমারে করহ হরি নিমিত্তের ভাগী।

মহৎ চরিত

উদয়ে লোহিত রবি অস্তেও লোহিত,
সুখে দুখে একরূপ মহৎ চরিত।

ভ্রম

ঈশ্বর না মানি যেই শাস্ত্র নানা পড়ে,
বীজ না রোপিয়া সে ত শুধু চষে মরে,
হৃদয়ে হয় না বিন্দু আলোক সঞ্চার,
ফুঁ পাড়িয়া মরে, মাত্র ধোঁয়া লাভ তার।

সাধু ও গৃহী

সাধুরে জিজ্ঞাসে বক, এই গঙ্গাতটে
প্রভাতে সন্ধ্যায় দোঁহে বসে থাকি বটে।
আমি ত তোমারি মত থাকি চোখ বুজে
কই ত হরির কিছু পেলাম না খুঁজে।
সাধু কন, চোক বোজ, মনে থাকে তব,
আসিবে শীকার কবে ছোঁ মারিয়া লব।
ও নহে হরির লাগি তব চোক বোজা,
ও কেবল মনে মনে মৎস্য কীট খোঁজা।

সংজ্ঞা

সৌন্দর্য্য—বিশ্বেতে তাঁর পুণ্য করলেখা,
প্রেম—সে সৌন্দর্য্য মাঝে নিত্য তাঁরে দেখা,
প্রীতি—রূপ হেরি তাঁর হওয়া অনুরাগী,
ভকতি—উৎকণ্ঠা হরি মিলনের লাগি।

কর্ত্তব্য

কোকিল বলিছে সদা তাঁর নাম গাই
তবু কেন হৃদে মোর শান্তি নাহি পাই।
সারসী বলিছে কর কর্তব্য লঙ্ঘন,
করো না যে তুমি স্বীয় সন্তান পালন।
মাতা হয়ে তনয়ে যে না করে শিক্ষিত,
জগত জননী স্নেহে হয় সে বঞ্চিত।

উজানি

চণ্ডালি

বৃদ্ধ খঞ্জ চণ্ডালী এক শ্রীমুখ দেখিতে রথে—
একাকিনী হায় চলে ধীরি ধীরি মেদিনীপুরের পথে।
দিবসে যে শুধু হাঁটে এক ক্রোশ—তাহার একি গো দায়,
গৃহ হ'তে দূর একশত ক্রোশ পুরীধাম যেতে চায়।
দলে দলে যায় পুরীর যাত্রী, খোঁজ করে কেবা কার—
সেই সবাকার পিছু পড়ে থাকে, চলিতে পারে না আর।
রথযাত্রার যবে শুধু আর দুই দিন বাকি আছে,
বহু কষ্টে সে পহুঁছিল সাঁঝে আসি কটকের কাছে।
'কোথা যাবি বুড়ী?' পথিক জনেক শুধাল যখন তারে,
বৃদ্ধা বলিল, 'চলিয়াছি বাবা চাঁদমুখ দেখিবারে।'
ঈষৎ হাসিয়া পথিক বলিল, 'কেমনে পারিবি বুড়ী ?
রাত পোহালে যে কাল রথ, খেপি—দেখিবি কেমন করি ?'
শুনি' চণ্ডালী রুষিয়া বলিল, 'বাকি যে এখনো পথ—
কী বলিছ তুমি—রাতি পোহাইলে—কেমনে হইবে রথ ?'
হাসিয়া পথিক বলিল, 'তাইতো, চল তাড়াতাড়ি চল—
তুই খেপী নাহি পঁহুছিলে সেথা রথ কে টানিবে বল ?'
ঘুমাইল বুড়ী। রজনীর শেষে উঠে বলে, 'চল যাই'—
দুটি পা তাহার বেদনাজড়িত উঠিতে শকতি নাই।
বিষম বেদনা পারে না নড়িতে—তবু দিয়া হামাগুড়ি
রথের মাঝারে দেখিতে শ্রীমুখ চলিতে লাগিল বুড়ী।

ভক্তেরা সব জুটেছে শ্রীধামে রথযাত্রা যে আজি
কাঙালের হরি উঠেছেন রথে অভিনব বেশে সাজি'।
একি অঘটন একি হল আজ চলে না দেবের রথ,
অযুত ভক্ত টানিতেছে রশি কর্দমহীন পথ।

জুড়িল হস্তী, তবুও সে রথ তেমনি রহিল স্থির,
ভাবনা-আকুল প্রধান পাণ্ডা ঝরে নয়নের নীর।
ধূলার মাঝারে লুটায়ে পাণ্ডা জানিতে পারিল ধ্যানে,
প্রবল ভক্ত কে এক রথের পশ্চাৎ দিকে টানে।
যাবৎ না ছোঁয় সুমুখের রশি পূত করতল তার
হাজার হস্তী রথের চক্র নড়াতে নারিবে আর।
বাহির হইল, পাণ্ডার দল ভক্ত অন্বেষণে,
কৌপীন পরা সন্ন্যাসী আনে, বৈষ্ণব সাধুজনে,
তিলকভূষিত নামাবলীধারী ব্রাহ্মণ আনে ধরে,
কাহারো পরশে সে বিরাট রথ একতিল নাহি নড়ে।
খুঁজিতে খুঁজিতে কত দূরে আসি প্রধান পাণ্ডা হায়
দেখিল খঞ্জ বৃদ্ধাজনেক পুরী অভিমুখে যায়।
হামাগুড়ি দিয়া চলিরাছে বুড়ী পাণ্ডা শুধাল তারে
'প্রখর রৌদ্রে ভিক্ষার লাগি যাইবি কাহার দ্বারে ?
তপ্ত বালুতে পুড়িতেছে পদ, আঁখি ভরে গেছে জলে
দিনু এই সিকি, ফিরে গিয়ে বস্ ওই অশথের তলে।'
বুড়ী বলে, 'বাবা, বল কবে রথ পয়সাতে কাজ নাই,
রথের মাঝারে দেখিব শ্রীমুখ, রোদে চলিয়াছি তাই।'
শুনি ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধারে বুকে করি'
'পেয়েছি পেয়েছি' বলিয়া ছুটিল পুরীর সড়ক ধরি।
কাঁপর বৃদ্ধা বলে, 'দাও ছাড়ি বাবাগো চাঁড়ালী মুই,'
ব্রাহ্মণ বলে, 'দে মা, পদধূলি গুরুর গুরু যে তুই।'
চকিতে দেখিল যাত্রীরা সবে জয় জয় জয় বলে
প্রধান পাণ্ডা আনিলেন সেই খোঁড়া বুড়ী লয়ে কোলে।
অচল সে রথ চলিতে লাগিল বুড়ী দিল যবে হাত
উল্লাসে সবে গাহিয়া উঠিল 'ধন্য জগন্নাথ।'
সাশ্রু নয়নে অযুত কণ্ঠে গাহিল অযুত প্রাণ,
'সত্যিই তুমি কাঙালের হরি ভক্তের ভগবান।'

হংস খেয়ারী

তার সে ছোট কুটীর খানি অজয় নদীর পারে
ছোট ছোট শিশুর গাছ জাগছে চারি ধারে।
বস্‌লে আঙিনায়
ক্ষেতটি দেখা যায়
ছুটে ছুটে ভেড়ার পাল আসে তাহার দ্বারে।

[২]

তরু লতার রাঙা ফুলে চালটী আছে ঢেকে
বাতাস আসে শিউলি ফুলের বাসটি গায়ে মেখে।
নদীর কাল জল
করলে টলমল
হাঁসগুলি তার হেলে দুলে ডাঙ্গায় আসে বেঁকে।

[৩]

দুপাট ডোঙায় একা কেবল যাত্রী করে পার
আটটি জনের বেশী কভু নেয় না সে ত ভার।
ঝিঙে কচু পুঁই
ভাবে কোথা থুই
হাটের লোকে আঁজুল আঁজুল দেয় যে পুরস্কার।

[৪]

মামলা মোকর্দ্দমা আর ধরার কোলাহল
পায়না সে ত শুনতে বিনা নদীর কলকল!
শুধু গঙ্গাস্নানে
যায় 'কাটোয়া' পানে
আদালতের নামে তাহার চরণ টলমল।

[৫]

চণ্ডী মায়ের সোণার 'কোগাঁ' তার বুকেতে থাকে
ভোরে উঠে লোচন দেবের চরণধুলা মাখে।
গাজন উজানিতে
হৃদয় উঠে মেতে
সুখে দুখে মঙ্গলারে হৃদয় ভরে ডাকে।

দেয়ালি

মঙ্গলকোটে বিজয় শেঠের সমান ছিলনা ধনী,
কাজী খোন্দকার, মোল্লাসাহেব সবে তার কাছে ঋণী।
কত জমিদারি আয়মা মহল সুদের দেনায় তার—
ভিখারী করিয়া বড় বড় বাড়ী হয়ে গেছে ছারখার।
গ্রামের ভিতর আলি নওয়াজ দয়াশীল জমিদার,
কতই হিন্দু কত মুসলিম কৃপায় পালিত তাঁর।
তাঁহার নিমক খায়নি যাহারা অল্পই ছিল সেথা,
বিজয়ের কাছে তিনিও যে ঋণী অন্যের কিবা কথা !

গ্রামে কানাকানি, শীঘ্রই শেঠ নিলামে লইবে কিনে,
তাঁর জমিদারী আয়মা যে সব বন্ধক আছে ঋণে।
শুনিয়া একথা বিষম ব্যথিত গ্রামের গরীব দুখী,
কেবল কজন আত্মীয় তাঁর হয়েছিল কিছু সুখী।

আলি নওয়াজ নীরবে সহেন মরমের ব্যথা মনে,
অস্ফুট তার গভীর বেদনা জানে শুধু একজনে।
চাহিয়া পাঠালে কত আত্মীয় শুধে দেয় ঋণভার,
আলি নওয়াজ করিবে কি নত উন্নত শির তার ?
সে যে মোখাদিম নহে ত বেতস দুখ ভারে হবে নত,
দাঁড়ায়ে পুড়িবে বজ্র আগুনে ভীম তাল তরু মত।
আলি নওয়াজ করিলেন স্থির আল্লা করেন যাহা,
ঋণ শোধ দিয়া মদিনা যাবেন কাটায়ে দেশের মায়া।
হল যদি হায় ফল-ছায়া-হীন বিশাল বিটপী হেন,
পথিকের দয়া লইতে এখানে দাঁড়ায়ে রহিবে কেন ?

পুড়িছে পটকা উড়িছে হাউই ছুটিছে আতসবাজি,
ঘরে ঘরে শত জ্বলিতেছে দীপ হিঁদুর দেয়ালী আজি।
অশ্বে আরোহি' নওয়াজ সাহেব দেখিতে গেলেন ঘটা,
আঁধার হৃদয়ে আসিয়া পড়িল খর আলোকের ছটা।
ফিরালেন ঘোড়া, দেখিলেন দূরে বিজয় দাঁড়ায়ে আছে,
চমকি' উঠিল হৃদয় তাঁহার—কোনো কথা বলে পাছে।

আভূমি আনত সেলাম করিল আসি শেঠ তাড়াতাড়ি,
বলিলেন আলি "সেলাম শেঠজী এই আপনার বাড়ী ?"
বিজয় বলিল, "হুজুর আজিকে এসেছেন এই পথে,
ছাড়িয়া দিবনা আমার গৃহেতে পদধূলি হবে দিতে।"

বুঝিলেন আলি ঋণের কথাই গোপনে বলিতে একা,
চতুর বিজয় গৃহে লয়ে যাবে, করিতে এসেছে দেখা।
যা হোক নামিয়া বিজয়ের সাথে গেলেন ভবনে তার,
কি জানি কী বলে এই ভাবি হৃদি কাঁপিল যে কতবার।
সজ্জিত গৃহে চারু কেদারায় বসায়ে তাঁহাকে হেসে,
বিনয়ের সাথে বিজয় বসিল জানু পাতি ভূমে এসে।
মুগ্ধ নওয়াজ হেরিয়া বিনয়—দেখেন আলোকরাজি।
মাগেন বিদায়, শেষ হল যবে পোড়ানো আতসবাজি।
বিজয় বলিল "হেরিলেন যাহা সে সব তবু তো ফাঁকি
মোর হাতে গড়া রঙবাতি আলো দেখাতে রয়েছে বাকি।"

এত বলি ধীরে বাক্স হইতে গুটানো কাগজখানি
প্রদীপে ধরিয়া পোড়াতে পোড়াতে সুমুখে ধরিল আনি।
"কী কর, কী কর, বাতি নয় ও যে আমারি সে তমসুক"
"জানি আমি তাহা," বলিল বিজয় পুলক মাখানো মুখ।
"আপনার স্নেহে জনক পালিত শুনিয়াছি বহুদিন,
শুভ আগমনে করিলাম তাই এই রোশনাই ক্ষীণ।"
'আজিকে আমার সুখের দেয়ালি', বিজয় বলিল হাসি
আলি নওয়াজের বিশাল নয়ন শুধু জলে গেল ভাসি।

আম গাছ

দুখিনীর ছিল শুধু একটি আমের গাছ
নিজ দুয়ারের কাছে তার।
বছর বছর তাতে গাছ ভরা আম হ'ত
ছেলেরা কুড়াত অনিবার।
একদিন কুপ্রভাতে ছেলেরা দেখিল তার
দুজন কুঠার লয়ে করে

চারিদিক ঘুরি ঘুরি দেখিছে গাছের মূল'
বালকেরা শিহরিল ডরে।
ছুটিয়া মায়ের কাছে কাঁদিয়া বলিল গিয়া
দেখ মাগো কাহারা আসিয়া,
দুখান কুঠার লয়ে দেখিছে গাছের গোড়া
লয়ে যাবে বুঝি বা কাটিয়া।
আমাদের চারাগাছ মুকুলেতে ছেয়ে আছে
এ বছর কত আম হবে
আমরা খাব না আম, তারা সব নিয়ে যেয়ে
গাছটি কাটিবে কেন তবে ?
মলিন বদনে মাতা বলিল, তা শুনিবে না,
তোমরা বাড়িতে এসো ধন,
ধারের দায়েতে কত রাজার রাজত্ব যায়
মহাজন শোনেনা বারণ।
গরিবের ছেলে মেয়ে বাহিরে গেল না আর
খেলাঘরে বসিল উঠানে,
কুঠারের ঘা যেমন গাছের গোড়ায় পড়ে
চাহে এ উহার মুখপানে।
খেলাতে বসে না মন কানে যে পশিছে সাড়া
বাজিছে কোমল বুকে কত,
নিষেধ করেছে মাতা বাহিরে যাবে না আর
বসে আছে পুতুলের মতো।
আর কতখন হায় গাছ নোয়াইল শির
শিশুদল চাহিয়া রহিল।
ভূতলে পড়িল তরু তারি সাথে আঁখি ক'টি
জলভারে নামিয়া পড়িল।
গাছের তলাতে শুধু ভাঙা খেলাঘর আছে
একটিও প্রাণী নাই সেথা,
পড়ে আছে ভ্রষ্ট নীড়, গেছে উড়ি পাখিগুলি,
পথিকের হৃদে দিয়ে ব্যথা।

একি আশা, একি ভ্রম মায়ার ছলনা একি !
আজও দুটি ছোট ছোট ছেলে,
প্রভাতে উঠিয়া ওগো ঘটি ভরে জল দেয়
কাটা সেই প্রিয় তরু মূলে।

অখিল মাঝি

অজয়ের বুকে সারাদিন, সারাদিন তরী বাহে,
সন্ধ্যাবেলায় আঙিনায় জাল বুনে আর গাহে
সুখে আছি আমি হরি হে অভাবেরে আমি ডরিনে,
আমার হিংসা করে না ক কেউ আমিও হিংসা করিনে।

(২)

চাঁদ দেখে তারে প্রথমে, সম্ভাষে আগে রবি,
কোকিলের ডাকে জাগে সে প্রগাঢ়-শান্তি লভি,
ধরে পাড়ি আর গাহে গান হরি কারো ধার ধারিনে
কাহারো মন্দে থাকিনে ক আমি কাহারো হিংসা করিনে।

(৩)

যবে মন্দিরে বাজে শঙ্খ সন্ধ্যা ঘনায়ে এলে,
দাঁড় থামায়ে সে ক্ষণ-কাল রহে দুটি বাহু তুলে।
শরীরেতে তার নাহি রোগ দেহে লাগে বটে কাদা,
বন টগরের মত তার হৃদি খানি রহে সাদা।

(৪)

একদা গ্রামের জমিদার ক'ন তরী হতে নামি
জগতের মাঝে শুধু তোর হিংসা করিরে আমি
জমিদারী দিয়ে ডিঙ্গি খান নিতে সদা আছি রাজি,
বিনিময়ে তোর মত প্রাণ পাই যদি ওরে মাঝি।

কালিয়া

এসেছিল হায় বালক 'কালিয়া', দূর নাগপুর ছাড়ি
চাকুরী করিতে অন্নের দায় মোর মামাদের বাড়ী।
সে ছিল তাঁদের ভবন মাঝারে ঘরের ছেলের মত
সেরে গৃহকাজ আমাদের সাথে হাসিত খেলিত কত।
ভূলে গিয়েছিল নিজ মাতা পিতা অথবা ছিল না কেহ
দিনেকের তরে যায়নি সে দূরে ত্যজিয়া মোদের গৃহ।
'দেশে ফিরে যাব' একথা সে কভু বলেনি কাহারো কাছে,
ভাবিত সকলে মহুয়ার ফুল ফুটিল কি গাব গাছে ?
জ্যৈষ্ঠ মাসের কুনিশায় এক কালিয়া পড়িল জ্বরে,
তৃষ্ণার জল খেতে গিয়ে প্রাতে কাঁপিয়া উঠিল ডরে,
শঙ্কিত সবে কি হয়েছে বলি শুধাইল বারে বারে,
শুনিল হায় গো ছয় মাস আগে কুকুরে কেটেছে তারে,
অল্প সে ক্ষত দুদিনে গিয়াছে বাড়ীতে বলেনি তাই,
মলিন বদনে সকলে বলিল নাই কোন ভয় নাই।
কি জানি কালিয়া কি লাগি বলিল, ওগো করে দাও গাড়ী
দেশ ছেড়ে আমি বহুদিন আছি এইবার যাব বাড়ী।
ডাক্তার তারে বুঝায় কতই প্রবোধ মানেনা হায়
পোষা শুক আজ কনক পিঁজারে আর না থাকিতে চায়।
পীড়ার যাতনা বাড়িছে যতই গভীর আঁধার রেতে
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কালিয়া বলিছে 'আর দিলে না গো যেতে'।
মলিন প্রভাতে শান্ত কুটিরে কালিয়া ঘুমায় পড়ি,
পথিকের আঁখি পুরবাসী আঁখি সলিলে গিয়াছে ভরি।
তেমনি পেলব কচি মুখখানি মুদিত নয়ন জোড়,
আকাশ ভাঙ্গিয়া যে ঘুম এসেছে তাতেই রয়েছে ভোর।
উঠাইল শব অতি ধীরে ধীরে চারি জন লোক ধরি,
দেখ যেন ওগো ভাঙ্গেনা ও ঘুম ধীরে বল হরি হরি।
সমাধি তাহার ওই দেখা যায় শ্মশান অশথ তলে,
ভিজে উঠে নিতি গাছের পাতার নীহার নয়ন জলে।
কাছ ঘেঁসে তার নদী বহে যায় করে নাক কূলকুল

ঝরে পড়ে ধীরে সমাধি উপর হলুদ সোঁদালি ফুল।
নাহি কোলাহল বিহগ নীরব জনহীন চারিধার
প্রকৃতি জননী শঙ্কিত সদা পাছে ঘুম ভাঙ্গে তার।
তবুও দারুণ জ্যৈষ্ঠ নিশায় পবন উঠিলে মেতে
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কে যেন বলে গো দিলে না আমারে যেতে

আতুরী

ওরে ঐ দেখ পড়িয়াছে বান অজয়ে,
ঘাট মাঠ বাট সব দিল আজ ডুবায়ে,
থাকি থাকি দেখ চমকি উঠিছে বিজুরী,
হাঁসগুলি তোর ডেকে নিয়ে আয় আতুরী।
মার কথা শুনে ছুটিল কৃষক বালিকা,
সে যে সোহাগিনী দয়াবতী পশুপালিকা।
পদ্ম দীঘির পদ্মের হেরি মাধুরী
তি তি করে তার হাঁসগুলি ডাকে আতুরী।
বালিকা চকিতে দেখিল নিকটে আসিয়া,
বন্যার জলে হাঁসগুলি যায় ভাসিয়া।
হংস ধরিতে লাফায়ে পড়িল দুলালী,
পদ্মদীঘির যেন সে স্বর্ণমরালী।
আর হাঁস লয়ে কই সে এলো না ফিরিয়া,
বাপ মা তাহার কেঁদে খোঁজে গ্রাম ঘুরিয়া।
দেখে সবে হায় পরদিন সেথা আসি যে,
পদ্মের মাঝে সে মুখকমল ভাসিছে।

পথে

'প্রহরী রয়েছে দ্বারে, সুন্দর বাড়ীখানি—
ওই যে জাগিছে পাশে—মনে হয়, চিনি চিনি।
কত গ্রাম পার হয়ে আমরা তো আসি যাই,
তার মাঝে এই খানি কেন ভাল লাগে ভাই ?'

বুড়া ভৃত্যের সাথে কথা কহে ধীরে ধীরে,
চলিছে একটি শিশু ছাতিটিও নাই শিরে।
বুড়া বলেনাকো কথা সে যে ভাল করে জানে
কার ছিল ওই বাড়ী কারা ছিল ওইখানে।
আজি হেন দীনবেশে কে যে সাথে যায় হেঁটে,
বুড়া ত সকলি জানে বুক তার যায় ফেটে।
তার সে জনম দিনে উৎসব রোশনাই,
শিশু যেতে পারে ভুলে, ভিখন তো ভোলে নাই।
দারুণ নিয়তি ফেরে পর হয়ে গেছে বাড়ী,
কমলা বিমুখ আজ বিকায়েছে জমিদারী।
তবু শালোণ্ডা গ্রাম রায়েদের নামে গাঁথা,
তাঁদের তনয়ে হেরি কে না পাবে বল ব্যথা ?
প্রণমিছে দুই পাশে গ্রামবাসী হেরি তায়,
বুঝিতে না পারি শিশু ভিখনের পানে চায়।
কপালেতে দেয় হাত কাতর ভিখন আজ,
শত দুখ-আলাপন হয়ে যায় তারি মাঝ।
জানিনে বুঝিল কিনা শিশু এ সবার মানে—
কই একটিও কথা পশেনি তো তার কানে ?
গ্রাম পার হয়ে শুধু বালক বলিল, ভাই,
চোখেতে পড়েছে কুটা দেখ, জল আসে তাই।'
বুড়া বলে 'ওরে শিশু, কে তোরে শিখালো ছল—
আয় দাদা, আয় কোলে, কাঁদিলি কেন রে বল' ?
'কই কাঁদি নাই আমি' শিশু বলে বার বার,—
বুড়া নিজ আঁখিজল থামাইতে নারে আর।

একটি আলো

গ্রামের উত্তরে একটি ঘাটকে 'কটার মায়ের' ঘাট বলে। অভাগিনীর পুত্রের নাম 'কটা' ছিল। সে ঘাটের নিকটেই অজয়ের ভাঙন আসিয়া পড়িয়াছে।

কত যে বরষা কত যে ঝঞ্ঝা কত বান বহে গেল
কুমুরের কূলে তবু রাতে জ্বলে এখনো একটি আলো।
কেহ বলে উহা নয়নের ভুল কেহ বা আলেয়া বলে—
জানে শুধু ভালো কারণ ইহার নিশার নাবিক দলে।
শুনি বলে তারা ওইখানে ছিল এক দুখিনীর বাড়ী
ভগ্ন ভিটার ও অশথতরু নিজে হাতে রোপা তারি।
সে ছিল ওখানে বহু অনটন অনেক কষ্ট সয়ে—
আঁধার কুটীরে আশার প্রদীপ একটি তনয়ে লয়ে।
থাকিতে নারিত ছেলেকে বারেক কাছছাড়া করি কভু
কষ্টে মরিত আঁচলের নিধি আঁচলে রাখিত তবু।
বড় হলে ছেলে সারা দিনমান মনিবের কাজ সারি
'অন্ধ মুনি'র 'সিন্ধু'র মত ফিরে সে আসিত বাড়ী।
যদি কোনদিন বেশী রাত হত ফিরিতে তাহার ঘরে
আশাপথ চেয়ে রহিত জননী ধরি দীপখানি করে।
এক রজনীতে এলো না তনয়। মাতা সারানিশি জাগি,
খনে শতবার দ্বারে ছুটে আসে ব্যাকুল সুতের লাগি।
বাতাসে কপাট যদি নড়ে আহা—আশায় ভরে যে বুক
ধীরে খুলে দেখে আঁধার, আঁধার নিরাশে শুকায় মুখ।
পোহাইল রাতি—এলো না তনয় শেষ আশা গেল টুটি—
নয়নে আসিল অশ্রু জোয়ার ভূমে সে পড়িল লুটি।
আত্মীয়জন বুঝাইল তারে মরেনি তনয় তার—
কোলছাড়া করে লয়ে গেছে দূরে 'আড়াকাটী' দুরাচার।
বেশী দিন নয় দেখিতে দেখিতে পাঁচ বরষের পরে
তনয় তাহার হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিবে ঘরে।
কোথা মরিসাস্? কোথা অভাগিনি দেখা হইবার নয়—
তবু সে বলিল মরে যাওয়া চেয়ে দূরে যাওয়া প্রাণে সয়।

আশায় বাঁধিল ভাঙা বুকখানি মুছিল নয়ন বারি
জল দিয়া নিজে রাখিল জিয়ায়ে তনয়ের তরুসারি।
ছেলের হাতের মাছধরা 'তগী' রাখিল যতন করে
তনয় যে তার দুদিনের পর ফিরিয়া আসিবে ঘরে।
সন্ধ্যায় একা বিবশা দুখিনী গৃহ তুলসীর তলে,
পড়িয়া রহিত ভিজাইত মূল দুটি নয়নের জলে।
নিশিতে নিত্য জ্বালি দীপখানি আপনি আপনা ভুলে
দাঁড়াত যখন দূরের তরণী আসিয়া লাগিত কূলে।
কতদিন হল অভাগিনী হায় গেছে চলি' ধরা ছাড়ি,
বিশটি বরষা তপ্ত ভবনে ঢেলেছে শান্তিবারি।
মত্ত ঝটিকা বরষ বরষ গেছে সেই দিকে চলি,
নিশিতে কিন্তু দীপটি তাহার তেমনি উঠে যে জ্বলি।
কোথা ছেলে তার আসিলনা ফিরে আছে কোন দূর দেশে
কুন্নরের বানে ভবনের শেষ চিহ্নও গেছে ভেসে।
তবুও জ্বলিছে, জলিবে এখনো কত নিশি নাহি জানি
ভাবনা জড়িত জননী হিয়ার স্নেহের প্রদীপখানি।

নোটন

নাহি কাজ তার, নাহি অবসর বাড়ী বাড়ী ফেরে ঘুরি,
সারা গ্রামখানি খুঁজে দেখ তার মিলিবে না আর জুড়ী।
কতক গোয়ালে, কতক মাঠেতে, ফেরে গরু তার যত,
বেড়াহীন গাছ ছাগলেতে খায়, দেখিতে পায় না সেত।
জন মজুরেতে লাঙল চালায় আধা দিন দেয় ফাঁকি
মাঠে যেতে বল নোটনকে আর দেশেতে পাবে না ডাকি
নূতনহাটে সে সাতবার যায় নিত্য পরের লাগি,
পরের বিপদে ঘুম নাহি চোখে কাটায় যামিনী জাগি।
কোথায় ছেলেরা করিতেছে খেলা, করিছে চড়ুই ভাতি,
প্রভাত হইতে নোটন সেখানে হয়েছে তাদের সাথী।
গ্রামের ভিতর যাত্রা আসিলে যাবে না ফিরিয়া কভু,
ঘরে নাই ভাত, বাড়ী বাড়ী চাঁদা নোটন তুলিবে তবু।

নূতন কেহই আসিলে এ গ্রামে চাকর চাহিনে তার
সব কাজ তার নোটন করিবে কাছে রবে অনিবার।
সে তোমার চিরবাধ্য চাকর, করেনা কিছুরি আশা,
বকো না হাজার কিছুতেই তার কমিবেনা ভালবাসা।
জুয়াচোরে যদি কেঁদে ধার চায়, ধার করে দেবে এনে
ছাগল বেচিয়া শুধিয়াছে ধার, শেখে না ঠকিয়া জেনে।
সকলের কাজ করিবে সে হেসে, আপনার কাজ ছাড়া,
আপনি ভুগিবে পরের লাগিয়া এমনি আপনাহারা।
ভায়েরা বকিছে দিন রাত, তবু লজ্জা ত নাহি তার ;
আপনার চেয়ে, গ্রামবাসী তার আরো যেন আপনার।
ভায়েরা এখন চিনেছে তাহাকে দেয়না পয়সা হাতে
লক্ষ্মী ছাড়ার কোন খেদ নাই, কোন দুখ নেই তাতে।
নাহিক অভাব, তেমনি স্বভাব না থাকুক কড়ি কাছে
গিয়াছে কমলা, হৃদয় কমল, তেমনি ফুটিয়া আছে।

কাপালিক

ষোড়শ বর্ষের যুবা, বৈভব, সংসার তুচ্ছ করি,
ভৈরব ত্রিশূল করে, মাখি ভস্ম, ব্যাঘ্রাজিন পরি,
বাহিরায় গৃহ হতে, সাধু এক বলেছিল তায়,
লভিবে সে মহা সিদ্ধি অম্বিকার উগ্র তপস্যায়।
ধরি কাপালিক ব্রত অভ্যাসিয়া কঠোর সংযম,
দৃঢ়তার হৃদিখানি করেছে সে আজি দৃঢ়তম।
সাঙ্গ করি এতদিনে ভারতের তীর্থ পর্যটন,
পুণ্য তীর্থ উজানিতে উপনীত আসি সে এখন।
মহাপীঠ 'উজানির' 'খড়্গামোক্ষণের' পূত মাঠে,
বিজন 'ভ্রমরাদহ', খুল্লনার চিহ্নিত সে ঘাটে—
শ্যামল বিল্বের তলে কাপালিক রচিল আসন,
সুবৃহৎ হোমকুণ্ড, পঞ্চমুণ্ডী দেখিতে ভীষণ।
সূচিভেদ্য অন্ধকার, ঝটিকা মুখর অমানিশি,
নিবিড় জলদ জাল সব তারা মেঘে গেছে মিশি।

সহসা উঠিল জ্বলি সন্ন্যাসীর হোমকুণ্ড ম ঝ,
নয়ন ঝলসি ভীম উজ্জ্বল বহ্নির শিখা আজ।
পার্শ্বে কৃষ্ণ শবদেহ, হস্তপদ রজ্জুতে বন্ধন,
নরকপালের মাঝে অপূর্ব নৈবেদ্য আয়োজন।
সিন্দুরাক্ত হাড়মালা ধরি কাপালিক নিজ গলে,
পরিয়া কৌশিক বস্ত্র, রক্তসূতা বাঁধিয়া কপালে।
আঁকি অঙ্গারের ফোঁটা রুদ্র জটা তুলি শিরোপর,
চণ্ডাল শবের পরে বীরাসন রচিল সত্বর।
আরম্ভিল তপ যোগী, আসে বিভীষিকা, প্রলোভন,
হ'লে সাধনার সিদ্ধি, লভিবে যে শ্যামার দর্শন।
মগ্ন তাপসের পাশে প্রথম আসিল হাসি হাসি,
উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী আলু থালু কৃষ্ণ কেশ রাশি।
স্ফীতবক্ষ উঠে কাঁপি, চঞ্চল অঞ্চল উড়ে পড়ে,
বিভ্রম বিলাস কত করিল সে তপ ভাঙিবারে।
সংযমী রহিল থির ধ্যানমগ্ন নয়ন স্তিমিত,
লজ্জায় মোহিনী মায়া পলকে হইল অন্তর্হিত।
তারপর মধু বাদ্য, কলকণ্ঠ অপ্সরীর গান,
মদন উৎসবে শত ষোড়শীর সলাজ আহ্বান।
সৌন্দর্য্যের সমারোহ রত্ন মাণিক্যের ছড়াছড়ি,
আসবে অলস নেত্র, এল মত্ত নাগর নাগরী।
অচল সংযমী চিত্ত দুই চক্ষু বহি পড়ে নীর,
'মা' 'মা' রব উচ্চারয়ে থাকি থাকি কণ্ঠ সুগম্ভীর।
তারপর উলঙ্গিনী নিশাচরী রাক্ষসীর দল,
দীর্ঘ দন্তে নর মুণ্ড ভ্রুকুটিয়া চিবায় কেবল।
দুই ওষ্ঠ বহি পড়ে দর দর শোণিতের ধার,
অর্দ্ধ কবলিত শিশু প্রাণপণে করিছে চীৎকার।
ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের সারি, শৃগাল গৃধিনী শত শত,
বদন ব্যাদান করি আসিতে লাগিল অবিরত।
তবু নড়িল না সাধু, অটল রহিল বীরাসন,
আয়ত বিশাল বক্ষ হল যেন পাষাণ মতন।

তারপর শ্রান্তপদে একাকিনী সুমন্দ গমনে,
আসিল কি এক মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর মানস নয়নে।
ক্ষীরধারা বহে স্তনে, দুটি চক্ষু জলে গেছে ভরি,
ডাকিল সে সন্ন্যাসীর শৈশবের ডাক নাম ধরি।
চমকি উঠিল যোগী সে মধুর সে করুণ স্বরে,
যুগ যুগান্তের কথা আজ যেন জাগিল অন্তরে।
সহসা পড়িল মনে সেই গ্রাম, সেই গৃহখানি,
শত পরিচিত মুখ, শত কথা কে আনিল টানি।
বিস্ময়ে মেলিল আঁখি সব শূন্য অট্ট অট্ট হাসি,
ভাঙ্গি তাপসের ধ্যান পলাইল নিরাশা রাক্ষসী।
বুঝিল সন্ন্যাসী হায় মোহময়ী মায়ার ছলন,
ভূতলে লুকায়ে মুখ লুটাইয়ে করিল রোদন।
নিভাইল হোমকুণ্ড, কাটি দিল শবের বন্ধন,
ভাঙি দিল পঞ্চমুণ্ডী, নৈবেদ্য করিল বিসর্জ্জন।
ফেলিল 'ভ্রমরা' জলে কণ্ঠের সে হাড়মালা টুটে,
বসিল তটিনীকূলে সাশ্রুনেত্রে যুক্তকর পুটে।
"দয়াময়ী মা আমার ক্ষম এ দীনের অপরাধ,
মিটিয়াছে চিরতরে ভক্তের এ জীবনের সাধ।
শৈশবে সংসার ত্যাজি করিবারে তোমার সাধন
কাটানু জীবন সারা, বিফল হল মা এ পূজন।
যৌবনের প্রলোভন, রূপ বিত্ত, নিখিল সংসার,
পারে নাই ভাঙ্গিবারে ক্ষণতরে যে ধ্যান আমার,
শ্মশানে জননী কণ্ঠে ডাকি মায়া করিল চঞ্চল
কঠিন শাক্তের চিত্ত, করিল মা সকল বিফল।
আমি অসংযমী মাতা দেখিলাম শক্তি নাই মোর
কাটিবারে সংসারের অতি মাত্র ক্ষীণ স্নেহডোর।
চল্লিশ বৎসর ধরি, স্নান করি শত নদী স্রোতে,
ধুতে নারিলাম মাতা সেই স্মৃতি হৃদি পট হতে।
এত বলি কাপালিক 'ভ্রমরার' ঘন কৃষ্ণ জলে,
ঢালিতে তাপিত দেহ দুই হস্ত প্রসারিল বলে।

আরাধ্যা মঙ্গলামাতা হাসি হাসি দুটি কর ধরি,
অবশ সাধক দেহ রাখিলেন নিজ ক্রোড়ে করি।
বলিলেন, উঠ বৎস মহাব্রত পূর্ণ তব আজ
আশীষ নির্ম্মাল্য লহ আজি তব সিদ্ধ সব কাজ।
ব্যর্থ নহে তোর পূজা, দেব গ্রাহ্য সার্থক সুন্দর
প্রীতা আমি উঠ বৎস, লভ নিজ আকাঙ্ক্ষিত বর।
স্নেহ প্রেম প্রীতিহীন কর্কশ কঠিন কারাগার,
হয় না হয় না কভু দেবতার বিলাস আগার।
আপনার জননীরে জেনো বৎস পারে যে ভুলিতে
বিশ্ব জননীর স্নেহ সে কখন পারে না লভিতে।

ভাঙা মসজিদ

দশ বছরের আগে মঙ্গলকোটের পথে যে পথিক গিয়াছিল চলে
সে যদি ফিরিয়া আসে চিনিতে নারিবে গ্রাম লোকে যদি নাহি দেয় বলে।
গাজি সাহেবের আহা সুন্দরভবনখানি কে না চেনে ? এ পথে যে যায়,
আজ তার আধখানা তীরেতে দাঁড়ায়ে আছে আধখানা কুনুরের গায়।
বিশাল ভবন-দ্বারে আব সে প্রহরী নাই নাই সেই জনকোলাহল,
ভবনের মাঝ দিয়ে নদী হয়ে বহে গেছে শত নয়নের আঁখিজল।
মসজিদের শিরে শিরে উঠেছে অশথ গাছ কাক রচিয়াছে বাসা তায়,
ঈদের দিনেও আজ জনহীন পড়ে থাকে ভয়ে সেথা কেহ নাহি যায়।
বিশাল গুলঞ্চ দুটি প্রাঙ্গণ বেড়িয়া আছে বিষাদের কালিমা ছড়ায়ে,
সাঁজে কোনো দীন ভক্ত তৈলহীন দীপখানি রেখে যায় ধুলাটি সরায়ে।
গাজি সাহেবের সবে ছেলে দুটি লয়ে তার জীবনের পারে চলে গেছে,
কেবল অদূর গ্রামে পাগলিনী কন্যা তাঁর শ্বশুরভবনে বেঁচে আছে।
শুনিয়াছি পাগলিনী কহেনা কারেও কথা সারা নিশি জানালাটি দিয়ে,
আয় আয় বলে ডাকে হাসে কাঁদে নিজ মনে সেই ভাঙা বাড়ী পানে চেয়ে।
মসজিদ প্রাঙ্গণে কেহ পশে নাকো কোনোদিন তবু দেখিয়াছি নিজ চোখে,
ঝরা ফুল পাতাগুলি কে যেন সরায়ে দেছে আঙিনা তেমনি তকৃতকে।
সেই বুড়া হাফেজের চেনা গলা কত রাত সভয়ে শুনেছে গ্রামবাসী,
অজু করিবার ঠাঁয়ে সদ্য সলিলের ধারা প্রভাতে দেখেছে সবে আসি।

তীর্থযাত্রা

"পঞ্চাশ পার হয়েছে বয়স বাঁচিব বা কতদিন,
দেখিছ না মোর দেহ একে একে হইয়া আসিছে ক্ষীণ?
যাহা আনিয়াছি, তাহাই দিয়েছি শুধু তোমাদের পাছে,
তীর্থে যাইব কড়িটিও আজ নাহিকো আমার কাছে"—
পিতার বচন শুনিয়া তনয় বলিল ঈষৎ হাসি—
"যে রূপেতে পারি দিব ত্নশো টাকা করে এসো গয়া কাশী।
রঘুনাথ তব সঙ্গে যাউক, কষ্ট হবে না পথে—
পনেরো দিনের বেশী দেরি যেন হয়নাকো কোনো মতে।"

শুভদিন দেখি নফরচন্দ্র রঘুনাথে সাথে করি,
তীর্থ ভ্রমণে বাহির হলেন শ্রীমধুসূদনে স্মরি।
কোথা গয়াধাম, কোথায় মথুরা, কোথা বা সুদূর কাশী,
শালোগু। গ্রামে রায়েদের বাড়ী উঠিলেন তিনি আসি।
ডাকি কর্তারে অশেষ বিনয়ে নফরচন্দ্র কয়—
"আপনার কাছে দুইশত টাকা ঋণী আছি মহাশয়।
অল্পবিত্ত—এত দিনে তাহা পারি নাই শোধ দিতে,
আজিকে এনেছি, টাকাগুলি হবে আপনাকে গুনে নিতে।"
বিস্মিত রায় বলিলেন খুঁজি, খাতাপত্তর দেখি—
"ঋণের কোনোই উল্লেখ নাই, কী কথা বলেন একি!
লেখাপড়া ছাড়া বলুন কেমনে প্রত্যয় মোর হয়?
অকারণে লওয়া পরের অর্থ আমার সাধ্য নয়।"
নফরচন্দ্র ছল ছল চোখে বলিলেন তাঁরে পুনঃ,
"লউন এ টাকা, সত্যই তব, নাহি এতে পাপ কোনো।
পিতা যবে মোর তিন বছরের, পিতামহ যান চলি
'রায়েদের বাড়ী দুইশত টাকা ঋণী আছি আমি' বলি।
অল্প বয়সে ইহলোক ছাড়ি পিতাও গেলেন পরে,
পারি নাই মোরা শুধিবারে ঋণ দুইটি পুরুষ ধরে।
নয় বছরের শিশু আমি যবে বিদায়ের দিনে মাতা,
বলিয়াছিলেন প্রপিতাদেবের এই সে ঋণের কথা।

তারপর হায় নানা ঝঞ্ঝাটে চলে গেল কত দিন,
আমারও সময় ঘনায়ে আসিছে, শুধিতে পারিনু ঋণ।
আসল কেবল করেছি জোগাড়—সুদের অবধি নাই,
দুইশত টাকা লয়ে কৃপা করি উদ্ধার করা চাই।
পিতামহ তব দেছিলেন ঋণ, দলিলে কী আছে কাজ?
পুরুষে পুরুষে রয়েছে যে লেখা আমাদের হৃদিমাঝ।"

বহু মিনতিতে শ্রীমন্ত রায় টাকা কটি হাতে তুলি,
সজল নয়নে সম্ভ্রমে দোঁহে করিলেন কোলাকুলি।
বিদায় লইয়া নফরচন্দ্র সাত দিবসের পর
তীর্থে না গিয়া তীর্থ করিয়া ফিরিয়া এলেন ঘর।
পথে রঘুনাথ তাঁহার কথায় করিল অঙ্গীকার,
একথা কারেও বলিবে না কভু—মরণের আগে তাঁর।
কোথা নামাবলী বরগুঞ্জ মালা, কোথায় প্রসাদ ভাই—
কাশীর পেয়ারা গয়ার পেড়া ত একটীও আনে নাই?
গৃহেতে তনয় বধূ দুহিতারা সকলে বলিল, 'ছি—
দুই শত টাকা লয়ে বাবা সেথা করিয়া এলেন কি?"
নফরচন্দ্র সুস্থ হৃদয়ে এতদিন পর আজ।
শুইলেন আসি আপনার সেই পৈত্রিক গৃহমাঝ।
হেসো না শুনি এ তীর্থভ্রমণ—হে পাঠক মহাশয়,
গয়ার পিণ্ডে পিতৃপুরুষ এত কি তৃপ্ত হয়?

শ্রীমন

নামটি তাহার মন্মথ কি অন্য কিছু হবে,
শ্রীমন বলে কিন্তু তারে ডাকে গ্রামের সবে।
শিশুকালে শেখে নাই সে অধিক লেখাপড়া,
সত্য ছিল তাহার কাছে সরার মত ধরা।
প্রতি মাঠে, প্রতি ঘাটে গ্রামের প্রতি গাছে
আজো বুঝি তাহার পায়ের ধূলার চিনে আছে।

খেলতো শুধু ঝুলঝাপ্পুর ডাণ্ডাগুলি খেলা
পলের মত চলে যেত দীর্ঘ দিনের বেলা।
দেখা দিত পাঠশালে সে দু এক দিবস আসি,
সোহাগের পানকৌড়ী যেন উঠত হঠাৎ ভাসি।
কণ্ঠ তাহার মধুর ছিল গীতেই ছিল টান,
লেখাপড়া শিখতো ভালো ছাড়তো যদি গান।
গাইত যখন হাত তুলে সে সংকীর্তনের দলে
গান শুনে তার গ্রামের বুড়া ভাসত আঁখি জলে।
কেটে গেছে শৈশব তার প্রভাতকালের মত
এখন গায়ে পড়েছে তার খর কিরণ শত।
চলে গেছে বড় দু ভাই ভবন আঁধার করি,
সঙ্গী ছাড়া বনের পাখী একলা আছে পড়ি।
ভবন ভরা পোষ্য তাহার সেই ত তাদের আশা,
পাপিয়া কি গাইতে পারে রচতে হলে বাসা।
বিরল এখন হাসির খেলা তাহার মলিন মুখে
বিষম পাষাণ পড়েছে রে কোমল তরুণ বুকে।
দারিদ্র্যের হায় শতেক পীড়ন শতেক ব্যথা মাঝে
শৈশবের সেই রাগিণী তার হৃদয় কোণে বাজে।
সারা দিবস খেটে খুটে সন্ধ্যাবেলা হায়।
এখনো সে খিন্ন পদে লোচন পাটে যায়।
ক্ষণেকতরে হাসে নাচে তেমনি গায় গান,
নিশার হিমে জাগে যেন মানসকুসুম খান।
নীলকণ্ঠের যাত্রা যদি দুক্রোশ দূরে হয়
সবার আগে তাহার সেথা না গেলেই ত নয়।
খোলের সাড়া পশলে কানে থাকুক না সে যেথা
দূরে ফেলি শতেক ব্যথা আসবে ছুটে সেথা।
বিঁধিয়াছে হৃদয়খানি মরমভেদি বাণে
মুগ্ধরে কুরঙ্গ তবু ব্যাধের বাঁশীর গানে।

আশুতোষ

এসেছিলে গাইতে তুমি পাওনি গাহিতে
সোণার তরী ডুবে গেল দুদিন বাহিতে।
মিশে গেলে রশ্মি জালে শুক্রতারাটি,
তোমার তরে নীহার ঝরে রাত্রি সারাটি।
নিশির মুখে নিভলে দুখে আমার দেয়ালি
প্রভাতকালে পড়লে ঝরে স্বর্ণ সেফালি।
তোমার স্মৃতি দুলছে নিতি শোভার দুকূলে
তোমার ব্যথা রইল গাঁথা শুষ্ক মুকুলে।

শেষ

দীন পল্লীর মেঠো গান তোর
কে শুনিবে রাজ সভাতে,
কি করিবি আর বসিয়া একাকী তফাতে।
সুতার সেতার বাঁশরী বীণায় কেবলি
যেখানে লহরী নিয়ত উঠিছে উথলি,
মাঠের জলের জলতরঙ্গ
সেথায় এলি রে শুনাতে,
দীন পল্লীর মেঠো গান তোর
কে শুনিবে রাজ সভাতে

(২)

এ হাটে ও তোর শ্যামলতা ফুল
বল কে রে ভালবাসিবে ?
দীনতার ছবি দেখে লোকে শুধু হাসিবে।
পাপিয়া কোকিল শুক ময়নার কাকুলি
পিপাসু শ্রবণ যেথায় রেখেছে আগুলি
সেথায় লাজুক ও শ্যামার শিষ
কে আর শুনিতে আসিবে!
এ হাটে ও তোর শ্যামলতা ফুল
বল কে রে ভালবাসিবে ?

(৩)

চল গা'বি গান উদাস বাতাসে
তোর চেনা মাঠে সেখানে,
নদী কল্ কল্ মিলাইবে স্বুর যেখানে।
উঠানে সূর্যমুখীটী উঠিবে আকুলি
সোহাগে ঘাসেতে গড়াগড়ি দিবে সেফালি,
তুই কবি তোর পল্লীরাণীর
শ্যামল মাধবী বিতানে,
চল গা'বি গান উদাস বাতাসে
তোর চেনা মাঠে সেখানে।

———

একতারা

শরাহত কপোত

নদী তীরে একা ভ্রমিতে ছিলাম একদা ফাগুন প্রাতে,
দেখিনু কপোত সমুখে পতিত-নিষাদের শরাঘাতে।
কাতরতা মাখা রাঙ্গা আঁখি দুটি, ম্লান চাহনীটিতে তার,
যাতনা মথিত, ধূলি লুণ্ঠিত, সে কোমল দেহভার।
দিনু গায়ে হাত, বারেক পক্ষী চাহিল নয়ন তুলি,
পিয়ে মরণের কূট হলাহল পলকে পড়িল ঢুলি।
তার সে চাহনী যে কথাটি হায় কয়ে গেল মোর প্রাণে,
অর্থ তাহার পাইনে খুঁজিয়া বিশ্বের অভিধানে।

কৃষ্ণা রজনী

বুঝি সেদিন সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার,
এমনি প্রখর ঝটিকা মুখর চারিধার।
সতী সাবিত্রী মৃত পতি কোলে
একাকিনী ভাসে নয়নের জলে,
শিয়রে শমন কত কথা বলে
দমকে দামিনী বারেবার।
বুঝি সে দিনো সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার।

(২)

বুঝি সে দিনো এমনি গুরুগর্জ্জন অবিরল,
মত্ত পবনে বরুণ রাজ্য টলমল।
গাঙ্গুরের নীরে ভাসাইয়া ভেলা,
মৃতপতি দেহ আবরি বেহুলা
চলে অসহায়া একাকিনী বালা
ঝরে নিশিদিন আঁখিজল,
বুঝি সে দিনো এমনি গুরুগর্জ্জন অবিরল।

(৩)

বুঝি সে দিনো এমনি ঝলসে বিজলি খনেখন
আঁধার নিশার আঁধার বাড়ায়ে অনুখন।
বারাণসী ধামে গঙ্গার তীরে,
ধূলি লুণ্ঠিতা শৈব্যার ক্রোড়ে
চণ্ডালবেশী নৃপতি নেহারে
মৃত পুত্রের সে বদন,
বুঝি সে দিনো এমনি ঝলসে বিজলী খনেখন।

(৪)

বুঝি সে দিনো এমনি জলের কাতর কলকল,
বন মর্ম্মরে ভীত চকিত মৃগদল।
দময়ন্তীরে ফেলি বনমাঝ
কোথা পলাইয়া গেল নলরাজ,
কাঁদে রাজবধূ অনাথিনী আজ
মলিন বদন শতদল।
বুঝি সে দিনো এমনি জলের কাতর কলকল।

(৫)

তব সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার,
কত শ্মশানের অঙ্গার কত আঁখিধার।
শোকের কালিমা যুগ যুগ ধরি
তোমার আঁধার দিয়াছে যে গড়ি'
কত সুষমার কত চিতা মরি
নিভেছে জ্বলেছে অনিবার।
তব সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার।

প্রত্যাবর্তন

কুলি যুবা ফিরছে ঘরে যুগের পরে আজ
কতই সুখ ও দুখের ছবি জাগছে হিয়া মাঝ।
পুঁটুলিটি দেখছে খুলে মায়ের তরে তার,
কলের কাপড় যাচ্ছে লয়ে, শীতের কাঁথা আর।

কাঁচের চুড়ি বেলোয়ারি প্রণয়িণীর তরে,
ক্ষুদ্র অতি আর্শীখানি যত্নে কাগজ মুড়ে।
ক্ষণে ক্ষণে লয় সে তুলে সখের বাঁশী খান
গায় যে বসি মনের সাধে নূতন শেখা গান।
যেই বিচিত্র চিত্রে তাহার হৃদয়খানি আলা
কোথায় লাগে তাহার কাছে রোমের চিত্রশালা।

উপবাসী

উপবাসী আজ কন্যার সাথে দুখিনী
ঘরে নাই চাল অন্ন ও আজ জোটেনি।
কাটে না দিবস, কাতর প্রহর গণিয়া,
মহান্ত ভাত পাঠাইয়া দেন শুনিয়া।
অনাহারী হায় যেতেছে আহারে বসিতে
বহু দিন পরে তনয় আসিল দেশেতে।
কন্যা জননী অনাহার দুখ ভুলিয়া,
মহা আনন্দে হারানিধি নিল তুলিয়া।
তাহারে খাওয়ায়ে কত সুখী হল দুজনা
ভুলে গেল ক্ষুধা শত দুখ ক্লেশ বেদনা।
তারা তিন জনে বসে হাসি ভরা বদনে,
অশ্রু জোয়ার আসিল আমার নয়নে।

স্নেহময়ী

দারুণ পীড়ায় অতি বিশীর্ণ দেহ,
গৃহের বাহিরে তনয় বসিয়া আছে—
পার্শ্বে জননী হৃদয়ে অপার স্নেহ
বীজন করেন বসিয়া একাকী কাছে
নিশা জাগরণে কালিমা-ক্লিষ্ট-তনু
শত আতঙ্কে ভরা প্রাণটুকু তাঁর,

তনয়ের লাগি দেহ প্রাণ অণু অণু
দান করিছেন যেন মাতা অনিবার।
ছিন্ন পক্ষ শাবকে বক্ষে ঢাকি
সারসী যেমন যতনে আগুলি রাখে,
তেমনি জননী সদা জাগ্রত আঁখি
সারা প্রাণ দিয়া ঘেরিয়া আছেন তাকে

কুলীর মৃত্যু

পাহাড়ের পাশে পাশে চা গাছের সারি
শূন্য ঘর সেই শুধু একা পড়ে আছে,
আপনার কাজ লয়ে ব্যস্ত সবে ভারি
স্নেহ দয়া দেখাইতে কে আসিবে কাছে।
দুষ্ট 'আড়কাঠি,' লোভে ভুলাইয়া তারে
আনিয়াছে হেথা, তার স্থিতি ছ বছর,
আরো ছ বছর পরে ফিরে যেত ঘরে,
মৃত্যু আসি অসময় দিল অবসর।
আজ শান্ত আঁখি কোণে ভাসে বার বার
তার সেই ছোট ঘর গোমতীর বাঁকে,
আশা পথ চায় যেথা প্রিয়া বার বার
পানিয়া ভরনে যায় কলসীটা কাঁকে।
প্রাণ তার কেঁদে উঠে ছুটে যেতে চায়
বর্ষার বলাকা সম সেই সুখ নীড়ে;
আঁধারী আসিছে ধরা তবু চক্ষু ভায়
তার সেই ছোট ঘর গোমতীর তীরে।

ডাকার মত ডাক

মায়ে ঝিয়ে দুইজনে গোবর কুড়ায়ে ভ্রমে
বৃদ্ধ গোপ শায়িত শয্যায়,
অবসর নাহি তিল খাটে দোঁহে নিশিদিন
দরিদ্রের বিশ্রাম কোথায়।
গোবরের ঝুড়ি মাথে ফিরে যবে গ্রাম্য পথে
দেবালয়ে নিনাদে কাঁসর,
তিলেক নামায়ে ঝুড়ি বলে দোঁহে করজোড়ি
ডাকিতে দিলেনা অবসর।
প্রণমি চিন্তিত মনে ফিরে যায় গৃহ পানে
যখন মন্দিরে বাজে শাঁখ।
ভেবনা দুখিনী তুমি শুনিবেন অন্তর্যামী
প্রথমেই তোমাদের ডাক।

নৌকাপথে

মাঝি—ভিড়ায়ো না চলুক তরী নদীর মাঝে,
তরী—এঘাটেতে বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।
ওই ঘাটে ওই বকুল গাছে
জলটি যেথায় ছুঁয়েই আছে,
এখনো ওই যে ঘাটেতে পল্লীবালার কাঁকন বাজে
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

(২)

ডুবছে রবি নীল গগনে যদিই আঁধার হয়ে এসে,
তবু নদীর মাঝে মাঝে তরী মোদের চলুক ভেসে।
এই গাঁয়ের হায় নামটি শুনে
প্রাণটি এমন করে কেনে,
ঘুম পাড়ানো কোন্ বেদনা জেগে ওঠে হৃদয়-মাঝে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

(৩)

মৌন সাঁজের ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা আনছে ডেকে,
গ্রামের সাঁজের দীপটি ছোট, বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে
একটি গৃহ হোথায় কিনা
ছিল আমার বড়ই চেনা,
ছবিটি যার আজও আমার হৃদয়-কোণে সদাই রাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

(৪)

এই নদীরই এই ঘাটেতে এমনি সাঁজে আমার প্রিয়া
যেত ছোট কল্‌সীটিরে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া ;
সোহাগে জল উথ্‌লে উঠি
বক্ষে তাহার পড়ত লুটি,
পথের মাঝে আমায় দেখে ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

(৫)

ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে, তটিনীর ওই শ্যামল-কূলে
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজো যে সেই চিতার 'পরে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে,
আজও মধুর মুখখানি তার দেয় যে বাধা সকল কাজে,
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে।

বিধবা

শ্বশুর ভবনেতে কত যে দিন পরে,
দুখিনী পতিহারা এসেছে আজিকেরে।
মলিন দীনবেশে হিমের কমলিনী,
একের অভাবেতে বিধুরা অনাথিনী।

সেই সে তরুলতা, সাজান ঘর বাড়ী,
তাদের যত শোভা গিয়াছে সব ছাড়ি।
সাঁজে প্রদীপ লয়ে শয়ন গৃহদ্বারে,
হৃদয় কাঁপে, কাঁপে চরণ বারে বারে।
শয়ন হেরি আসে নয়নে ঘন বারি,
হৃদয়ে ফুটে উঠে সে মধু মুখ তারি।
স্বরগে সব আশা, ভরসা সুখ তার,
ধরাতে শুধু ত্যাগ, ক্ষমা, পরোপকার।
বলরে বিধি কোন পাষাণে বাঁধি হিয়া
আনিলি কমলারে যোগিনী সাজাইয়া।

প্রজাপতির মৃত্যু

প্রজাপতি এক মধু বৈশাখী প্রাতে
করবী কুঞ্জে একটি করবী পাতে
মণি সন্নিভ দুইটি ডিম্ব রাখি,
বারেক ফিরাল মৃত্যু আঁধার আঁখি।
শেষ বিদায়ের করুণ চাহনি মরি,
সুত মঙ্গল কামনায় দিল ভরি।
স্নেহ ভাণ্ডারে সঞ্চিত শত নিধি,
নিঃশেষ করি ঢালি দিল যেন হৃদি।
সময় আসিল কাঁপিল কবরী শাখা,
মৃত প্রজাপতি টলিয়া পড়িল পাখা।

বাৎসল্য

বিদ্রোহী সিপাহী দল দয়া মায়াহীন প্রাণ
বাছে না বালক বৃদ্ধ কেটে করে খান খান।
হেরি এক শ্বেত শিশু সিপাহী জনেক হায়
কুসুম কোমল দেহ সঙ্গিনে বিঁধিতে চায়।

শিশুরে উপরে ছুড়ি', পাতিল সঙিন তার,
হি হি করে হাসে শিশু ভাবে এ আদর কার।
বক্ষে ধরি শিশুটিরে সঙিন নামায়ে রেখে
ফিরিল সিপাহী তার ক্ষুদ্র গৃহ অভিমুখে !

স্নেহের জয়

(১)

ভীষণ সমরে বিক্রমে যুঝি' রাজপুত গেল হারি,
প্রবেশিল আসি তুর্কী সৈন্য হিন্দুর বাড়ী বাড়ী।
জহর-ব্রতের পুণ্য অনল
দহিল অযুত স্বর্ণ-কমল,
ব্রহ্মার কোলে পশিল পুলকে সীতা-সতী সারি সারি।

(২)

বিজয়ী সৈন্য দেখিল মুক্ত বিশাল ভবনে ঢুকে,
একটি রমণী পিয়াইছে দুধ তনয়ে ধরিয়া বুকে।
প্রাণেশ বালার সমরের মাঝ
বীরের শয়নে ঘুমায়েছে আজ
জল নাই চোখে বেদনা দারুণ ফুটিয়া উঠিছে মুখে।

(৩)

অরাতি-শিশুরে সৈন্য জনেক জোরে নিতে চায় কেড়ে
ঝাপটি ধরিল বক্ষে জননী আপন তনয়টিরে।
এত কি কঠিন বাহু সুকোমল,
ছাড়াতে নাড়িল সৈন্য সবল
গর্বিত সেনা অসির আঘাত হানিল জননী শিরে।

(৪)

রুধিরের ধারা ঢাকিয়া ফেলিল বালকের সারা দেহ,
দূর হ'তে তাহা দেখিয়া সেনানী প্রবেশিলা আসি গেহ।
বলিলেন ডাকি, "ওরে নরাধম
মানুষের হৃদি এত নির্ম্মম,
পাস্‌নি পামর কখনো কি তুই নিজ জননীর স্নেহ ?"

(৫)

সভয়ে সরিয়া দাঁড়াল সৈন্য নত করি আঁখিজোড়,
সেনাপতি বলে, "ও বাহু ছাড়াতে সাধ্য কি আছে তোর ?
স্নেহের অযুত কঠিন বাঁধন
অসিতে কি কাটা যায়রে কখন,
ভরতপুরের চেয়ে দুর্জয় ও যে জননীর ক্রোড় ।"

(৬)

জননী কণ্ঠে জড়াইল শিশু দুটি বাহু সুকোমল,
দেখি' সেনানীর বিশাল নয়ন হয়ে এলো ছলছল ।
বলিলেন বীর, "ক্ষম অপরাধ,
ছেড়ে চলিলাম তোমার প্রাসাদ
স্নেহের দুর্গ ভাঙিতে নাই মা আমাদের বুকে বল ।"

অমর বিদায়

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
পোহাইলে সুখরাতি যে হবে অযোধ্যাপতি,
যোগীর বল্কল বাসে তারে কে সাজায় ?
অভিষেক নির্বাসন বোধনেতে বিসর্জন
পূর্ণিমায় অমানিশি দেখে কে কোথায় ?
শ্রীরাম যায় গো বনে সীতা লক্ষ্মণের সনে,
জগৎ সজল আঁখি থমকি দাঁড়ায় !
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায় ।

(২)

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
ক্রূর অক্রূর সাথে হরি গেল মথুরাতে,
শ্যামসোহাগিনী রাধা ধূলায় লুটায় ।

গাহে নাকো শুক সারী, অধীর যমুনাবারি,
শ্যামলী ধবলী আজি তৃণ নাহি খায়,
কাঁদে গোপবালাগণে চাহি তমালের পানে,
ভাসানো কলসী কোথা ফিরিয়া না চায়।
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

(৩)

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
বুদ্ধদেব গৃহ ত্যজি লভিতে চলেন আজি
জনম মরণ জরা প্রশম উপায়,
মায়ার বাঁধন টুটি বিশ্বপানে যান ছুটি
অহিংস পরম ধর্ম বুঝাতে সবায়।
কাঁদে রাজা শুদ্ধোদন কাঁদে গোপা অনুক্ষণ
কাঁদিছে কপিলবাস্তু পাষাণ হিয়ায়।
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়!

(৪)

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
আঁধিয়ারি নদীয়ারে কাঁদাইয়া শচীমারে
নিমাই সন্ন্যাস লন আজি কাটোয়ায়।
কেঁদে মরে ক্ষৌরকার হাত নাহি উঠে তার
কেমনে সাজাবে দণ্ডী নবীন যুবায়,
ভকতের আঁখিজলে কঠিন পাষাণ গলে
ডুবু ডুবু শান্তিপুর নদে ভেসে যায়।
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

(৫)

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
'কোরেসের' অত্যাচারে ওই চলি যান দূরে
ইরম্মদ মহম্মদ ত্রিদিব প্রভায়,
ওরে সে যে সর্বত্যাগী ডরে না প্রাণের লাগি,
পবিত্র ইসলাম ধর্ম জানাবে সবায়।
দিতে এসেছিল ধরা তখন বুঝেনি ধরা,
এখন কাঁদিছে বসি পূত মদিনায়।
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

(৬)

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়
আহা—অমর বিদায়,
ওই ক্রুশে আরোপিয়া মারিছে যন্ত্রণা দিয়া
চিরক্ষমাশীল যীশু নর দেবতায়,
কণ্টকমুকুট শিরে দিয়া কি করিবি ওরে
ত্রিদিব কিরীট যার শিরে শোভা পায়,
যীশু হায় ক্রুশে থেকে জগৎ পিতারে ডেকে
বলেন,—ক্ষমিও পিতা অবোধ সবায়।
যুগ যুগ ধরি কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

বলিদান

মাগো, আমার গা মুছিয়ে দিয়ে
তাড়াতাড়ি পরাও কাপড়খান,
আজকে আমি ভুলুর সাথে গিয়ে
আসবো দেখে কেমন বলিদান।
দেখে 'বলি' কেমন আমোদ হবে

নাচবে সবাই, বললে ভূলু মোরে,
'মা' 'মা' ব'লে ডাকবে তখন সবে,
বাজবে ঢোল খাজ্ জিঝাঝো ক'রে।

শেষে যখন ফিরলো খোকা বাড়ী,
মুখটি মলিন, চোখ যে ছল ছল,
জননী তার শুধায় তাড়াতাড়ি,
কেমন 'বলি' দেখলি বাছা বল ?
কেঁদে খোকা বললে—কোথায় বলি ?
শুধু আহা, কাটছে ছাগলগুলি।

গুরুদণ্ড

পড়িতে পারে তবু, তবু পড়েনা একবার,
দূরেতে বই ফেলে পালায় বারবার,
নিষেধ মানেনা সে, দুষ্টু অতিশয়
গুরু কি গুরুজন করেনা কারে ভয়।
শুনিয়া রোষ ভরে আনানু বেতখান
ধরিনু হাতদুটি মুখটি হলো ম্লান।
কাজল জলে ভেজা চাহিল আঁখি তুলি
সকল দোষ তার নিমেষে গেনু ভুলি।
আসামী শিশুটিরে লইয়া কোলে তুলে,
বলিনু ভাল করে পড়িস বোকা ছেলে।

গফুর

খিন্ন শ্যেন শাবক এক পড়িয়া পথ মাঝারে
অর্দ্ধমৃত তৃষ্ণাতুর চক্ষু দুটি প্রসারে।
তুচ্ছকরি চলেছে সবে, দেখে না কেহ নিরখি,
দীন কৃষক গফুর সেথা দাঁড়াল আসি থমকি।

গামছাখানি আদ্র করি সলিল ভরি, আনিয়া
শ্যেন শাবক চঞ্চু পুটে ঢালিয়া দিল ছানিয়া।
সলিল পিয়ে চাহিয়া পাখি মুদিল দুটি আঁখিরে,
নীরব শত আশিষ ধারা ঢালিয়া গেল গফুরে।

(২)

বহু বরষ কাটিয়া গেছে গফুর আজি বৃদ্ধ—
এবার হজে মক্কা যাবে ব্যকুল বড় চিত্ত।
গুছায়ে তুলি দ্রব্যগুলি চলিল সব যাত্রী.
সুখ আলাপে দিবস কাটে সুখ স্বপনে রাত্রি।
জাহাজ হতে নামিয়া যবে মক্কা করি লক্ষ্য,
উষ্ট্রোপরি লাগিল যেতে ভক্তিভরা বক্ষ।
দিবস গতে যামিনী ভোরে দৈব প্রতিদ্বন্দ্বী,
বিসূচিকা যে গফুরে আহা করিল তার বন্দী।

(২)

মরুর মাঝে নামায়ে তারে—চলিল সব পান্থ,
রোগের বিষে অবশ তনু দীর্ণ প্রাণ শ্রান্ত।
দারুণ তৃষা বক্ষ ফাটে—কাঁদে গফুর ত্যক্ত,
আল্লা আজি রক্ষা কর—মরে যে তব ভক্ত।
মূর্চ্ছাতুর পড়িয়া আছে বালুকামাখা অঙ্গে.
কে যেন ধীরে ক্লিষ্ট শির তুলিল উৎসঙ্গে।
শিরেতে দিল আশিস্ বাণী, অভয় বাণী কর্ণে।
কর পরশে কান্তি দিল পাণ্ডু দেহ বর্ণে।
পেয়ালা ভরি পিয়ারে মধু সঞ্জীবনী শরবত
মিলাল পরী হিরণ হুরী আলোকি নবু পর্বত।
জড়িমা ভরা শ্রবণে রোগী শোনে কে বলে শূন্যে—
আল্লা জেনো আহ্লাদিত ভক্ত তব পুণ্যে।
করেছিল যে শ্যেন শাবক চক্ষু দুটি সিক্ত,
দিন দুনিয়া মালিক কাছে হয়নি তাহা রিক্ত।
কাঁপিয়া উঠে গফুর হৃদি ভক্তি ভরা হর্ষে
সহসা তার আবেশ ভাঙ্গে শীতল বায়ু স্পর্শে।
চাহিয়া দেখে কোথায় মরু, এ যে মরুর উদ্যান,
'আজান' গান আনিছে বহি নব দেশের সন্ধান।

খেয়া শেষ

ওগো আজিকে তুফান ভীষণ তুফান নদীতে
এলো সাঁজের আঁধার ঘিরি,
ওগো পড়ে গেছে বেলা, আমি যে এলাম দেরীতে
বল কে আনে তরণী ভিড়ি।
শুনি অনিবার করি শুধু ঘোর কলকল
ছুটে চৌদিকে ফেনিলোচ্ছল রাঙা জল,
ঘন বটছায়ে বাঁধি তরী খানি
মাঝি গেল গৃহে ফিরি,
ওগো আজিকে তুফান ভীষণ তুফান নদীতে
এলো সাঁজের আঁধার ঘিরি।

(২)

ওই জমে আসে গগনের কোলে কালো মেঘ
ঘোর ঝটিকা উঠেছে মেতে ;
হের, রোষে ফুলে উঠে আবর্ত্তময় নদীবেগ
পারে কি পাবনা যেতে ?
যতবার দ্বীপ জ্বালে দেববালা নভো গায়,
আজি দুর্য্যোগে শুধু বারবার নিভে যায়,
শিহরি উঠিছে ক্লান্ত এ দেহ
আঁধারে খেয়ার পথে
ওই জমে আসে গগনের কোলে কালো মেঘ
ঘোর ঝটিকা উঠেছে মেতে।

(৩)

ওগো বহু দূর হ'তে বহু আশা করে আমি আজ
এসেছি এসেছি ছুটি,
মহা উৎসবে ভেটিব বারেক হৃদি রাজ
শত বন্ধন টুটি।

দূরে মন্দিরে শোভে ওই দীপ অগণন,
পূজার বাদ্য বহিয়া আনিছে সমীরণ,
আমিই কেবল রহিনু একাকী
তরু পাদমূলে লুটি।
ওগো বহু দূর হতে বহু আশা করে আমি আজ
এসেছি এসেছি ছুটি।

(৪)

যাও সুখীদল যাও ডাকিব না পিছু আর,
আমি এ পারেই থাকি,
এতখন ধরে কেন মিছিমিছি এতবার,
করিলাম ডাকাডাকি।
শোভন অর্ঘ্য সবাই এনেছে ভাই—
পুলক অধীর আমি কিছু আনি নাই
রিক্ত এ করে ভেটিব না হৃদিরাজ
আমি এ পারেই থাকি।
এতখন ধরে কেন মিছামিছি এতবার
করিলাম ডাকাডাকি।

(৫)

ওগো ভালই হয়েছে তুফান উঠেছে নদীতে,
বন্ধ হয়েছে খেয়া,
ভালই হয়েছে দেবতা চরণ পূজিতে,
ওপারে হল না যাওয়া
যে পূজা অর্ঘ্য বহিয়া এনেছি হায়
সে যে গো কেবল আঁধারেই দেওয়া যায়,
সমারোহ মাঝে দীনের সে দান
যাবে না যাবে না দেয়া
ওগো ভালই হয়েছে তুফান উঠেছে নদীতে
বন্ধ হয়েছে খেয়া।

———

বীথি

হিন্দু

লভি যদি পুনঃ মানব-জন্ম হই যেন আমি হইগো হিন্দু,
যায় দেবাগার শ্যামল পাহাড়, যার দেবাসন সুনীল সিন্ধু।
দেবতার নামে হয় নিশি ভোর, দেবতার নামে প্রভাত-কৃত্য,
দেবতার নামে শত্রুমিত্র, পুত্রকন্যা প্রভু ও ভৃত্য।
তীর্থ যাহার নদনদী কূলে, অতল সাগরে অচল শৃঙ্গে,
হরিনাম যার কুঞ্জে কুঞ্জে গায় প্রতিদিন বিহগ ভৃঙ্গে।
যোগ বলে লভি শক্তি বিপুল চাহে না যে রাঙা চরণ ভিন্ন,
দেবতা যাহার বহেন রক্ষে নিয়ত ভকত-চরণ-চিহ্ন।
দেবময় যার অনল অনিল, প্রখর তপন, শীতল ইন্দু,
লভি যদি পুনঃ মানব-জন্ম, হই যেন আমি হইগো হিন্দু।

ভবনে যাহার আসে দশভূজা শ্যামল ধান্য শেফালি গন্ধে,
আগমনীগান গাহে কবিকুল পুরাতন-চির-নূতন ছন্দে।
হরি-দোল-রাসে পূত পূর্ণিমা, পূতা অমানিশি শ্যামার বর্ণে
শ্যামের আভায়, নভ ঘন নীল, মাখা শ্যামরূপ বিটপী পর্ণে।
জোছনা নিশীথে শ্যামের বাঁশীতে উজান যাহার বহায় বক্ষে
আঁধার রাশিতে শ্যামার হাসিতে ভীষণ মশান প্রকটে চক্ষে।
প্রকৃতি যাহার দেবে দেবময়ী, পুষ্প যাহার দেবের ভোগ্য,
ভক্তি যাহার বিতরে মুক্তি চণ্ডালে করে ঋষির যোগ্য।
দেবময় যার অনল অনিল প্রখর তপন, শীতল ইন্দু,
লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম হই যেন আমি হইগো হিন্দু।

যার চোখে এই বিপুল বিশ্ব দেবের মিলনে সতত রম্য
দেবতা যাহার মাতা পিতা সখা, নহে অদৃশ্য অনধিগম্য।
কর্ম্মে যাহার শুধু অধিকার, ফল যার দেব চরণে ন্যস্ত,
নিষ্কাম যার ধর্ম্ম সাধনা, সংযমে যার দেবতা ত্রস্ত।

ব্রাহ্মণে যার ভক্তি অতুল, গাভীয়ে যে গণে জননী তুল্য,
সন্ন্যাসি পদে লুটায় নৃপতি, বিভবের যেথা নাহিক মূল্য।
নামে রুচি আর জীবে দয়া যার গুরুর দত্ত প্রথম দীক্ষা,
রাজা চলে যায় ব্রজের পথেতে, কাঁধে ঝুলি লয়ে করিতে ভিক্ষা
মোক্ষ না পাই দুঃখ তাহাতে নাহিক আমার নাহিক বিন্দু,
লভিয়া ভক্তি হৃদয়ে শক্তি হই যেন আমি হইগো হিন্দু।

পুরীর উপকণ্ঠে

বিদায় হৃদয় রাজ,
নয়নের জলে এ দীন কাঙাল বিদায় মাগিছে আজ।
লয়ে অতি ক্ষীণ ভকতির কণা
বহু দূর হতে এসেছে এ-জনা,
ভবনে তোমার ঠাঁই দিলে প্রভু হরিলে সকল লাজ।

(২)

মন্দির বায়ু শত ভকতের ভরা অনুরাগ মাখা।
ভকতি-নম্র অক্ষয়-বট ছায়াময় তারি শাখা.
তৃষিত অযুত আঁখির আলোক,
ভকত-হিয়ার অধীর পুলক—
দেবতা-চরণ-চিহ্নিত পথ মরমে রহিল আঁকা।

(৩)

দুর্ব্বল হিয়া কাঁপে দুরু দুরু দাঁড়াইতে তব আগে,
ও বিশাল আঁখি হেরি পাপ-তাপ সভয়ে বিদায় মাগে
বেদী পরশিতে শিহরে যে বুক,
পূত শঙ্কায় শুকায় এ মুখ।
পাষাণ-হৃদয় হয় বিগলিত গলে যায় অনুরাগে।

(৪)

রাখিয়া গেলাম আঁখির পিয়াসা আরতির দীপে তুলি,
হিয়ার ভকতি রাখিয়া গেলাম পাদ্য সলিলে গুলি।
মিশায়ে গেলাম বিদায়ের ক্ষণে
কাতর কামনা পদধূলি সনে,
তোমার প্রসাদে ভিখারীর আজ পূর্ণ হয়েছে ঝুলি ॥

ত্যাগের জয়

হারাইয়া গেছে একশত বিঘা দেবোত্তরের ছাড়,
জানিতে পারিয়া করে কাড়াকাড়ি দয়াহীন জমিদার।
বহু বহু দূরে মহারাজ কাছে বহু দরবার করি,
নব ছাড় পুনঃ পেলে ব্রাহ্মণ রহি বহু দিন ধরি।
কোথায় তাহার পল্লী ভবন কোথা সেই রাজধানী
বাহিরিল দ্বিজ নামাবলী সনে বাঁধিয়া কাগজখানি।
সব পথিকের মাঝে মাঝে চলে চলে অতি সাবধানে
কোন্ পথ দিয়া আসে যে বিপদ বল কে গণিতে জানে।
একদিন এক দস্যুর দল পথিকে করিল তাড়া
প্রাণ ভয়ে ছুটি চলে ব্রাহ্মণ নামাবলী হয়ে হারা।
মূর্চ্ছিত হয়ে পথি পাশে এক তরু তলে রহে পড়ি,
লভিয়া চেতন সব গেল বলি কাঁদে হাহাকার করি।
দেখি তার দশা পথিক জনেক বলে শুন ব্রাহ্মণ
অদূরেতে ওই সাধুর আবাস, হের ওই তপোবন।
তাঁহার কৃপায় হারাইলে মিলে যাও তুমি তাঁর কাছে
তোমার দুঃখ নিবারিতে শুধু তাঁহারই শক্তি আছে।
ব্যাকুল হইয়া গেল ব্রাহ্মণ নিবেদিল মনোব্যথা,
সাধু শুধু হাসি বলিলেন বেটা 'ছাড় তোর পাবি কোথা?
ব্রাহ্মণ তুমি শেখ নাই ত্যাগ হায় এত মায়াহত,
ছার ছাড় খানা হারাইয়া ফেলি কাঁদিছ পাগল মত।

হে অবোধ ভাবি দেখ দেখি তুমি হাত পা টা আছে কিনা
দেবতার সেবা করিতে নারিবে রাজার করুণা বিনা।
ঠাকুরের নামে চাহে ভোগ সুখ একিরে দুনিয়াদারী
রাজার দণ্ড ছাড় রাজরাজ নিজে লয়েছেন কাড়ি”।
শুনি ব্রাহ্মণ সজল নয়নে কাতর বচনে কয়,
“ধন্য হইনু নূতন দীক্ষা দিলে আজি মহাশয়।”

* * *

এক মাস পরে রিক্ত হস্তে দ্বিজ নিজ গৃহে ফিরে,
রজনী প্রভাতে পত্নীরে সব জানাইল ধীরে ধীরে—
‘পথেতে আসিতে দস্যুর দলে কাড়িয়া লয়েছে ছাড়,
ভিক্ষা করিয়া চালাইব পূজা কোন আশা নাহি আর”।
পত্নী তাহার বলিল, “হে প্রভু করিয়ো না কোনো ভয়,
ভকতিতে বাঁধা মদনমোহন সেবা উঠিবার নয়।
ভোগ আমাদের নহে তো ধর্ম্ম চিরদিন জানি মনে,
কালিকার লাগি এক মুঠা চাল রাখিব না গৃহকোণে।
দুইটি পয়সা সঞ্চয় আছে তাহাতেই কিবা কাজ
তুলসীর তলে হরির লুটেতে বিলাইয়া দাও আজ”।
মহা উল্লাসে বাতাসা হানিতে বলি পুত্রেরে ডাকি,
স্নান করিবারে গেল ব্রাহ্মণ সুখের নাহিক বাকী।
ফিরিয়া আসিয়া আহ্নিক শেষে তুলসী তলায় গিয়া
দেখেন মোদক বাতাসা দিয়াছে কাগজেতে জড়াইয়া।
বলে ব্রাহ্মণ “হায়রে অবোধ এনেছ কাগজে মুড়ে
এ জিনিষ আমি মদনমোহনে নিবেদি কেমন করে ?”
কাগজ হইতে বাতাসা লইয়া না করিয়া নিবেদন
হরি হরি বলে তুলসীর তলে ছড়াইল ব্রাহ্মণ।
পূজা শেষে হায় কাগজের পানে দৃষ্টি পড়িল তাঁর,
দেখেন চাহিয়া একি এ যে তাঁহারি হারানো ছাড়।
বিস্মিত দ্বিজ পত্নীরে ডাকি বসি মন্দির দ্বারে
কাঁদে আর বলে ‘মায়া ডোরে কত বাঁধিবেহে বারে বারে।
যাহার লাগিয়া পথে পথে কাঁদি সারা হইয়াছি খুঁজি,
ছার ছাড় আজ ফিরাইয়া দিয়ে ভুলাইবে মোরে বুঝি।

তুচ্ছ কাগজে উঠিবে না মন, তুমি ধন লহ স্বামী,
ভিক্ষা করিয়া যাপিব জীবন জেনো অন্তরযামী'।
তৃষিত নয়নে চাহে দুই জনে মদনমোহন পানে
দরদর ধারে ঝরে আঁখি ধারা কোন বাধা নাহি মানে।

লোচনদাস

অজয়ের তীরে রহিতেন কবি পর্ণ কুটিরবাসী
লোষ্ট্র সমান দূরে পড়ে কত ত্যক্ত বিভব রাশি।
বৈশাখে নব চম্পক হেরি ভাসিতেন আঁখি নীরে,
মনে পড়িত যে শ্যাম সোহাগিনী চম্পক-বরণীরে।
মাধবী জড়ানো শ্যাম সহকার মধুর যুগল ছবি,
হেরিয়া বিভোর কৃষ্ণ-ধেয়ান কৃষ্ণ পরাণ কবি।
নব ঘন শ্যাম স্মরিতেন মনে হেরি নব জলধরে,
সতিমির রাতি মেদুর পবন কাঁদাত রাধার তরে।
বেদনা বিধুর হৃদয় কবির জ্বালায়ে ভকতি বাতি,
শ্রীরাধার সাথে পথ দেখাইতে রজনীতে হত সাথী।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর ঘনশ্যাম তরুরাজি,
নিতুই করিত ব্রজের ভ্রান্তি নব নব বেশে সাজি।
শরৎচন্দ্র পবন মন্দ কুসুম গন্ধ বনে,
রাসের ছবিটি ফুটায়ে তুলিত নিত্য কবির মনে।
'কুনুরে' হইত যমুনার ভ্রম অশ্রু পড়িত ঝরি,
সুনীল গগন নীল-বরণেরে রহিত নয়নে ধরি।
রামধনু পানে চাহি ভাবিতেন চূড়া ঘেরা শিখী পাখা,
মিলাইলে ধনু আঁখি পল্লব হত যে শিশির মাখা।
হিমে কমলিনী হেরি স্মরিতেন বিরহ বিধুরা রাধা,
মথুরার পানে চেয়ে চেয়ে কাঁদে নাহি মানে কোন বাধা
হায় তাঁরি দুখে সমদুখী কবি কাঁদেন সখীর ভাবে,
বুঝান তাহারে ধৈরজ ধর পুন মুরারীরে পাবে।

নিশার বাঁশরী হৃদয়ে কবির কি যে ছবি দিত আঁকি,
উতল ব্যাকুল উঠিতেন জাগি জলে ভরে যেত আঁখি।
মধু মাসে হায় মাধবীরে হেরি মাধবে পড়িত মনে,
হেরি কিংশুক ফাগে লালে লাল কবি হাসে মনে মনে।
আজ বিভাবরী সুখে গোঁয়াইব হেরি বাঞ্ছিত মুখ,
হরি সমাগমে নিমেষে লুকায়ে শত ব্যথা শত দুখ।
কোকিল ডাকুক লাখে লাখে আজ মধু আজি সব মধু,
বহু দিন পর কুঞ্জে তাঁহার ফিরিছেন শ্যাম বঁধু।
প্রাতে পাখি রবে উঠিতেন কবি কুঞ্জ-ভঙ্গ স্মরি,
হারাই হারাই সদা এই ভয় কি দিবস বিভাবরী।
প্রতি গাভী হায় শ্যামলী ধবলী মুগ্ধ কবির চোখে,
রাখাল বালক হেরিয়া বিভোর দেখে হাসে যত লোকে।
শ্যাম ধ্যান জ্ঞান শ্যাম সুখ দুখ সকলি শ্যামের ছবি,
হেরি শ্যামময় হরি অনুরাগী সাধু বৈষ্ণব কবি।

বৈষ্ণব

মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হরি মাখন চোরা,
যুগল রূপের উপাসী যে, পিপাসী যে রসের মোরা।
স্মরণে তাঁর পরশ মধু, নামে ঝরে পিযূষ ধারা
মুগ্ধ মোদের মানস বধূ পেয়ে তাহার গীতের সাড়া।
কোথায় কুরুক্ষেত্র কোথা পাঞ্চজন্য যেথায় বাজে
গাণ্ডীবের ভীম টঙ্কারেতে দলে দলে সৈন্য সাজে,
আমরা তাহার ধার ধারিনে, খুঁজি কোথায় তমাল ছায়ে
মিশেছে রাই কনকলতা কল্পতরু শ্যামের গায়ে।
জ্ঞান-বিজ্ঞান তোমরা লহ, শাস' বরুণ প্রভঞ্জনে,
তুচ্ছ কর বিশ্বনাথে দর্পহারী নিরঞ্জনে।
জ্ঞান তাহারে চিনিয়ে দেবে, প্রমাণ তারে আনবে কাছে,
এমন দারুণ দুষ্ট আশায় বৈষ্ণবের হায় প্রাণ কি বাঁচে?

চাইনে মোরা শক্তি ওগো, ভক্তিভরে ডাকবো তাঁরে,
প্রণয়ী সে রাখাল রাজা দূরে কি আর থাকতে পারে ?
মগ্ন রব সেরূপ ধ্যানে মনে মনে গাঁথবো মালা,
আসবে হৃদয় কুঞ্জে ওগো আসবে ফিরে চিকনকালা।
তোমরা প্রবল, তোমরা প্রখর, নিত্য নূতন বাঞ্ছা মনে,
ক্ষুদ্র তবু চাই যে ধরা ঢাকতে প্রেমের আচ্ছাদনে।
যুদ্ধ কর শত্রু নাশ, কাঁপাও ধরা গর্জ্জনেতে,
আনন্দ পাই আমরা মাগো, শান্তি যে পাই বর্জ্জনেতে।
রক্ত মেখে তোমরা নাচ—টলাও ভারে বসুন্ধরা
প্রীতির আবীর কুঙ্কুমেতে হোলি খেলাই করবো মোরা।
দাও দেবে দাও টিটকারী ধিক্ নিত্য রটাও নতুন কথা
নিবিড় মিলন আনন্দে সব ভুলবো মোরা প্রাণের ব্যথা।

ত্যাগেন ভুঞ্জীথাঃ

রাজার বাড়ী সহিস তাঁরি আনিত কেটে নিত্য ঘাস,
শ্রম-বিহীন কর্ম্মে দিন যাপিতে তার নিত্য আশ,
বিধাতায় সে নিন্দা করি বলিত 'নাহি চক্ষু তোর,
সুখ-সাগরে নৃপতি ভাসে আমার বক্ষে চক্ষে লোর'।
এড়াতে ব্যথা বেদনা রাশি বিরাগ এলো চিত্তে তার,
রাগিয়া ফেলি খুরপা থলি, করিল ঝুলি কন্থা সার।
কাননে গিয়া হরিরে ভজে হরির একি পক্ষপাত,
ধরিয়া কাঁথা গেলনা ব্যথা কত যে দিন মিলেনা ভাত।
দিনের শেষে কে দেয় এসে আধেক পোড়া রুটি দুখান,
কভু বা মেলে মেলে না কভু ভুগিয়া সাধু বিরস প্রাণ।
কালেতে সেথা নৃপতি আসি কানন মাঝে রচিল বাস।
কাঁধেতে তাঁর রাজিছে ঝুলি কটীতে শোভে গেরুয়া বাস,
বিভব ত্যজি নৃপতি আজি আসিয়া বাণপ্রস্থে হায়,
কত সাধুর বচন মধু কত লোকের ভকতি পায়।
কেহ বা জল কেহ বা ফল কেহ বা আনে দুগ্ধ ক্ষীর,
হেরি সে সুখ সহিস কাঁদে রোষে ক্ষোভেতে চক্ষুথির।

"হায়রে বিধি করুণাহীন হেন বিচারে কি সুখ পাও,
আমার বেলা দগ্ধ রুটি রাজারে ক্ষীর নবনী দাও,
বুঝিনু আমি বিশ্বস্বামী বিচার তব রাজ্যে নাই,
বনেও এসে ভিন্ন ভেদে ঘৃণা ও লাজে মরিয়া যাই।"
কাঁদিছে খেদে শূন্য হ'তে কে হাসি ডাকি বলিছে তায়—
"দুখের লাগি তুমি ত রাগি খুরপা থলি ত্যজেছ হায়।
সুখের আশে এ বনবাসে এসেছ পরি হিংসাহার,
দগ্ধ রুটি ইহার বেশী বল কি হবে লভ্য আর!
রাজা যে এলো তুচ্ছ করি অতুল ধন রত্নরাশ,
হরিরে ডাকি দিবস নিশি করিছে পাদপদ্ম আশ।
সকলি দেছে হরিরে সে যে এটা কি তুমি বোঝনা ধীর
তাইতে হরি মাথায় করি বহিয়া আনে নবনী ক্ষীর।
না ত্যজি কিছু না দিয়ে প্রেম হরিরে পেতে করোনা আশ
হরি যে দেখে হৃদয়খানি ভোলে না দেখে গেরুয়া বাস।"

অন্বেষণ

নাইক আলাপ তোমার সাথে তবু দেখলে তোমায় চিনতে পারি,
তুমি যে শ্যাম শশধর হে—আমার মানস গগনচারী।
বুভুক্ষু ওই আহার পেয়ে আছে দাতার পানেই চেয়ে,
ওই দেখ ওই তুমি এলে ঝরাবে তার নয়ন বারি,
দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি।
বিদ্রোহী ওই রাজার কাছে কাতরে প্রাণ ভিক্ষা যাচে,
তুমিই ক্ষমার আজ্ঞা দিলে বারেক এসে বক্ষে তারি,
দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি।
ওই যে সাধু নদীর তীরে বসে আছেন আদুল গায়ে,
তুচ্ছ করি হিমের পীড়ন অতি দারুণ পৌষের বায়ে।
তাহার বিমল পুলক মাঝে জাগ'ছ যে হে সকাল সাঁজে,
উজল আঁখির দীপ্তিতে তার পড়ছ ধরা দুঃখ হারী,
দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি।

জননীর বেশ নিজেই ধরি আছ তনয় বক্ষে করি,
দাতার বেশে দিচ্ছ তুমি অন্য বেশে নিচ্ছ কাড়ি,
দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি।
ওই দেখ ওই রাজার সাজে করছ দমন দুষ্ট জনে,
ওই দেখ ওই জ্ঞানীর বেশে মগ্ন কিসের অন্বেষণে।
কতই ভাবে কতই বেশে দিচ্ছ দেখা নিত্য এসে,
চঞ্চল, এ অঞ্চলে হে বারেক তোমায় ধরতে নারি—
দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি।
ছড়ানো রূপ পীযূষ কণা পিয়ে যে মোর বুক ভরে না,
বৃন্দাবন চন্দ্র রূপে দাও হে দেখা বংশীধারী—
দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি।

শূদ্র

সেবা তোমার ধর্ম্ম মহান, ধৈর্য তোমার বক্ষ ভরা
যত্ন কেবল পরের লাগি আপনারে তুচ্ছ করা।
ভক্তি ভরে দাস হয়েছ হওনি নত অত্যাচারে,
গুণজ্ঞ যে নোয়ায় মাথা নিত্য গুণী জ্ঞানীর দ্বারে।
জানতে তুমি চাওনি কভু বেদ পুরাণের গুপ্তকথা,
গুরুর মুখে শুনেই সুখী অন্বেষণে যাওনি বৃথা।
সত্ত্ব গুণের ভৃত্য তুমি নরদেবের আজ্ঞাবহ,
জগৎ মাঝে মহৎ তুমি শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

(২)

চাওনি তুমি জ্ঞান গরিমা, নও হে ধন রাজ্য লোভী,
আপনারে ধন্য মানো, ব্রাহ্মণ পাদপদ্ম সেবি।
নাইক তোমার কৃচ্ছ্র সাধন, হোম করনা অগ্নি জেলে,
তপোবলের গর্ব্ব নাহি, সেবায় তোমার মোক্ষ মেলে।
অভ্রভেদি বিন্ধ্যগিরি উচ্চ হয়ে তুচ্ছ ছিল,
গুরুর পদে লুটায়ে শির ধন্য এবং গণ্য হল।
মহত্ত্ব ও গৌরব তার ধরায় কেবা তুল্য কহ
জগৎ মাঝে মহৎ তুমি শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

(৩)

দাস্য তোমার মাথার মণি উচ্চ চূড়া গৌরবেরি
ভক্ত থাকে মুগ্ধ হয়ে, তোমার হিয়ার শৌর্য্য হেরি।
সমাজ দেহের ভিত্তি তুমি, নিম্নে আছ অন্তরালে,
উঠতে তোমায় বল্‌বে শুধু মূর্খ লোকের তর্কজালে।
নদ'নদী চায় নিম্নে যেতে মেঘ নত হয় সলিল ভরে,
হালকা বায়ু অল্প আয়ু উর্দ্ধে যেতেই চেষ্টা করে।
করুক তোমার নিন্দা লোকে, হাস্য মুখে নিন্দা সহ,
জগৎ মাঝে মহৎ তুমি, শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

শাক্ত

মা আমাদের দয়াময়ী, মা আমাদের সর্ব্বনাশী,
ভালোবাসি আমরা মায়ের বরাভয় ও অট্টহাসি।
তোমরা লহ সকল আলো, আমরা রব অন্ধকারে,
অন্ধকারে মায়ের কোলে থাকতে বলো ভয় বা কারে?
তোমরা সবাই ধ্যান কর গো জপ কর গো আপন মনে,
মায়ের নূপুর কিন্‌কিনিতে নাচবো মোরা মায়ের সনে।
তোমরা ভুবন ভাগ ক'রে লও আমরা থাকি শ্মশান মাঝে,
যম যে দূরে থমকে দাঁড়ায় যখন মায়ের শঙ্খ বাজে।
পুণ্য পাপের ধার ধারিনে ভয় করিনে দুঃখ রাশি,
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্ব্বনাশী।

(২)

কান্ত কোমল শান্ত যাহা, তোমরা বাঁটি লও গো সবে,
আমরা লব কঠিন কঠোর বীভৎস যা রুদ্র ভবে।
সূচীভেদ্য অন্ধকারে শ্মশানেতে জাগবো রাতি,
চণ্ডালের ওই সাধন-শবের বক্ষটিতেই শয্যা পাতি।
কণ্ঠে ল'য়ে অস্থি মালা কপালে ত্রিপুণ্ড্র এঁকে
পঞ্চমুণ্ডী রচবো মোরা অঙ্গে চিতা ভস্ম মেখে।

ছিন্ন করি, কণ্ঠ নিজের প্রস্রবণের উষ্ণ ধারে,
হৃদয় ভরে শোণিত ধারা পিয়াবো মা অম্বিকারে।
চামুণ্ডার ভীম তাণ্ডবেতে শাক্ত মোরা হর্ষে ভাসি,
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্ব্বনাশী।

(৩)

শুষ্ক হাড়ের খট্‌খটিতে, শোকের কাতর কণ্ঠরোলে,
নিরাশার ভীম অট্টহাসে চিত্তদোলা আর না দোলে।
চক্ষে মোদের অশ্রু নাহি, শঙ্কা নাশি' ডঙ্কা মারি,
মৃত্যু পায়ের ভৃত্য মোদের, নিত্য আছে আজ্ঞাকারী
কর্ম্ম মোদের ধর্ম্ম মানি, ধর্ম্ম জানি সংযমেতে,
হৃদয় শোণিত ঢালতে পারি ছয়টি রিপুর তর্পণেতে।
সোনার টোপর সপ্ত ডিঙা ডুবলে রহি হাস্য মুখে,
মা যে কমল-কামিনী গো অপার ভব সিন্ধু বুকে।
মায়ের সনে আমরা কাঁদি, মায়ের সনে আমরা হাসি,
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্ব্বনাশী॥

বেরুলি

নাচিছে তালে তালে গভীর কালো জল
তরুর ছায়াগুলি ভাঙিতে অবিরল,
লহরী সনে ঢলি পড়িছে 'কাঁসাতলি'
সরমে মুখ চাপি হাসিছে শতদল।
নাচিছে তালে তালে গভীর কালো জল।

(২)

সবুজ শ্যাম খেত ঘিরেছে চারিধার,
হলুদ শোন ফুল শোভিছে মাঝে তার,
আখের খেতে খেতে বাতাস ওঠে মেতে,
অস্ফুট বেদনায় স্বনিছে বারবার।
সবুজ শ্যাম খেত ঘিরেছে চারিধার।

(৩)

'ঢুনী-র' তালে তালে কৃষক গাহে গান,
সমীরে ভাসা সুর মোহিত করে প্রাণ।
ফিঙেরা ঝাঁকে ঝাঁকে বসি বাবলা শাখে
ডাকে আঁধারে ঢাকি আঁধার তনুখান।
'ঢুনী'র তালে তালে কৃষক গাহে গান।

(৪)

একাকী বসে আছি মধু মাধুরী মাঝ,
দেখাবো কারে কেহ কাছে যে নাহি আজ
আকাশে তারকাটী উঠিছে ধীরে ফুটি,
পড়িছে মনে কার বদন ভরা লাজ।
একাকী বসে আছি মধু মাধুরী মাঝ।

কাক

কোন কবি হিয়া হয়নি মোহিত শুনিয়া রে তোর ডাক,
হয়নি মুগ্ধ কেহ তোর রূপে ওরে রূপহীন কাক,
তবু চিরদিন ভালবাসি তোরে সুখ প্রভাতের সাথী
তোর ডাক শুনি বুঝিতাম আমি নাহি আর নাহি রাতি
টোকা ভরা মুড়ি খই লাড়ু লয়ে খেতাম উঠানে বসি,
বেড়াতিস তোরা চারিপাশে মোর আসতিস কাছ ঘেঁসি,
ছড়ায়ে দিতাম মুঠা মুঠা মুড়ি ক্ষুধা ত যেত না তাতে,
হাত হতে লাড়ু কাড়িয়া নিতিস্ ঠোকারে দিতিস হাতে
বিকালেতে যবে 'ফুলবাগানের' 'বড় আমগাছ' থেকে
ধীরে ধীরে তোরা উড়িয়া যেতিস নীড় পানে একে একে,
উঠানেতে বসি শুনিতাম আমি দেখিতাম চেয়ে চেয়ে,
অজ্ঞাত এক বিরহ বেদনা হৃদিখানি দিত ছেয়ে।
আজ এ সুদূরে তোর ডাক শুনি, কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ,
জাগিছে নয়নে সেই সুখদিন সেই প্রিয় বাড়ী খান।

মনে পড়ে সেই আগুন পোহানো স্থয্যি মামারে ডাকা,
গায়ে দিয়ে সেই ছিটের দোলাই দুয়ারে বসিয়া থাকা।
মনে পড়ে সেই সুখ সাথী দল কত গেছে তার চলি,
কালের পরশে শুকাইয়া গেছে কত অস্ফুট কলি।
ফিরাইয়া আনে কত প্রিয় ছবি কত সুখ-দুখ ব্যথা,
আধভোলা এক পুরানো জগৎ সখা সাথীদের কথা।
যেথা দেখি তোরে মনে হয় মোর পুরাতন প্রিয় জনে,
কত জনমের প্রীতি রহিয়াছে গাথা তোমাদের সনে।

নিষ্কর্ম্মা

পাড়াগাঁয়ের অকেজো দল গ্রামকে তারা ভবন জানে,
জটলা করে এক সাথেতে দিবস নিশি তামাক টানে।
বকুল তলে চাটাই পেতে সারা দুপুর খেলায় পাশা,
চীৎকার এবং হাস্য করে, সংশোধনের নাইক আশা।
রাত্রে কবির আখড়া দেওয়া, খোল্ বাজিয়ে নৃত্য করা,
'মতিরায়ে'র নূতন পালা এক সাথেতে সবাই পড়া।
জরুরি কাজ এসব তাদের, বকুনি খায় গেলেই গৃহে,
তবু তাদের ভক্ত আমি, মুগ্ধ আমি তাদের স্নেহে।

(২)

বরযাত্রী যায় তারাই আগে, বরযাত্রীরে ঠকায় তারা
নষ্টচন্দ্রে রাত্রি সারা ঘুরে বেড়ায় সকল পাড়া।
তারাই করে পরিবেশন ভোজে কাজে তারাই আগে
অষ্টপ্রহর তারাই করে, মেলায় চাঁদা তারাই মাগে।
তারাই করে নিত্য পূজা, তারাই ত যায় নিমন্ত্রণে
আত্মীয়তা তারাই রাখে আপন করে সকল জনে।
সকল লোকের কার্য্য করে অকেজো তাই সবাই বলে,
স্মরি তাদের গুণের কথা ভাসি আমি নয়ন জলে।

(৩)

গ্রামে কোন অতিথ এলে আদর করে তারাই ডাকে,
গ্রামের রোগী দুখীর খবর সবার আগে এরাই রাখে।
রাত দুপুরে ডাকলে পরে লম্ফ দিয়ে তারাই আসে
সম্পদেতে সুখের সুখী, মুক্ত প্রাণে তারাই হাসে!
গ্রামবাসীদের বিপদ কালে তারাই আগে কোমর বাঁধে,
গ্রামের মৃত গঙ্গা লভে চড়ে কেবল তাদের কাঁধে।
গ্রামে গ্রামে হে ভগবান অকেজো দল এমনি দিয়ো,
তারাই গ্রামের গৌরব যে, আমার পরম বন্দনীয়।

তীর্থযাত্রা

এবার পুজার বন্ধে করিলাম মনে
যাব বন্ধুর সাথে তীর্থ পর্যটনে।
শুধু সংসারের চিন্তা, সহরের গোল
করিয়াছে ঝালাপালা, লভি শান্তি কোল
জুড়াই দুদশদিন। শুভদিন দেখে
বাহিরিয়া বাসা হতে কাশী অভিমুখে
নামিলাম গুস্করায়, বন্ধু গৃহ হয়ে
যেতে হবে। যাব সাথে তাহারে যে লয়ে।
বেলা অপরাহ্নে এক ক্ষুদ্র গ্রামে আসি
জানিলাম সেই গ্রাম পথিকে জিজ্ঞাসি।
করিতে বন্ধুর নাম জনেক আসিয়া
সযত্নে সে গৃহ মোরে দিল দেখাইয়া।
দেখিলাম বন্ধু মোর ঘাস লয়ে হাতে
বাছুর গুলিরে নিজে দিতেছেন খেতে।
গৃহে ঢুকিবার পথে যে দিকেতে চাই
কেবল উঠান জোড়া ধানের মরাই।
প্রকাণ্ড খড়ের 'পল' পুষ্ট গাভী দল
রয়েছে গোয়ালে বাঁধা বলদ সকল।

সারি দিয়া বাঁধা আছে। দূরে জন দুই
মজুর আপন মনে পাকায় বাবুই।
কাছেই পুকুর এক চারিদিকে গাছ
চলেছে বালক দল ধরিবারে মাছ।
উঠানে নাহিক গাছ এক পাশে খালি
করবী দুঝাড় আর একটি সেফালি।
দূরেতে নিকানো তল তুলসীর গাছে
গৃহস্থের যত্নটুকু সব পড়িয়াছে।
হেরিয়া আমারে বন্ধু জোরে হাত টানি
লয়ে গিয়ে বসাইল মার কাছে আনি।
তখন বন্ধুর মাতা জপাহ্নিক সারি
উঠেছেন, দেখি মোরে, আসি তাড়াতাড়ি,
বলিলেন, এসো বাবা ভাল আছ বেশ,
পথেতে বাছার কত হইয়াছে ক্লেশ।
করাইয়া জলসেবা অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পর
ডাকিলেন স্নেহভরে জননী তৎপর।
কি রন্ধন! সে যেন গো দেবের প্রসাদ,
খেয়েছি সে কতদিন আজো খেতে সাধ।
তারপর সুধালেন দাসীকে ডাকিয়া
ও পাড়ার 'বিধু' 'শ্যামা' গেছে ত খাইয়া?
ভাত লয়ে গেছে হরি? অম্বিকের মেয়ে,
পড়েছিল এতদিন আহা জ্বর হয়ে,
আজিকে পাইবে পথ্য, সরু চালগুলি
দিয়ে ত এসেছ তাকে? রেখেছিনু তুলি।
রাগিয়া কহিল দাসী, খেয়েছে সবাই,
ইচ্ছা হয় খাও তুমি, এ এক বালাই।
শুনিলাম অনাহারী এখনো জননী,
গ্রামের না খাওয়া হলে খান না আপনি।
বলেন, শুধালে, বাছা লক্ষ্মী যদি রয়
সবারে খাওয়ায়ে তবে নিজে খেতে হয়।

বাহিরে আসিয়া বসি ভাবিলাম মনে
হেন পুণ্য-কাশী কোথা মিলিবে ভুবনে।
সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা দেখিলাম যবে
বৃথা বারাণসী আর কেন যাব তবে।
ভক্তি ভরে ক্ষুদ্র গ্রামে তিন দিন ধরি,
জীবন্ত দেবীর সেই মূর্ত্তি পূজা করি,
তীর্থ ভ্রমণের কথা বন্ধুরে না বলি
লভি তীর্থ ফল, গৃহে আসিলাম চলি।

গ্রামের শোক

খাঁ খাঁ করিছে যেন চারি ধার গিয়াছে মোড়ল মারা,
চড়ে নাই হাঁড়ি আজ কারো বাড়ী শত চোখে আঁখি ধারা
গ্রামে কেহ আজ ধরে নাই হাল হাটে লোক নাই আজি
ঠাকুরের পূজা হয়নি এখনো পারে যায় নাই মাঝি।
মোড়ল ছিল না ধনী জমিদার কবি কি নাট্যকার,
দানের কাহিনী উঠেনি গেজেটে, শুন পরিচয় তার।
ক্ষুদ্র গ্রামের কর্তা সে ছিল বিঘা যাট ছিল জমি,
বাড়ীতে তাহার বহু পরিবার খরচ ছিল না কমি।
দীন দুখী জনে ছিল তার দয়া সবাকার সনে প্রীতি,
দুয়ার তাহার অতিথির তরে মুক্ত রহিত নিতি।
প্রথম ফসল না বিলায়ে সবে তুলিত না সে যে ঘরে,
দিনে রাতে গৃহে তামাকু পুড়িত, ভাত দিত অকাতরে।
ছিল না তাহার মধুর আদরে বচনের পরিপাটি,
চিনি দেওয়া জলো দুধ নয় সে যে, টাটকা সে দুধ খাঁটি।
শাসন তাহার কঠোর কোমল অকপট ভালবাসা,
'সাধুভাষা' নয়, ছিল গো তাহার সাধুতায় ভরা ভাষা।

পল্লী কবি

অজয় পারে ওই যে ভাঙ্গা দেয়াল আছে পড়ি,
শিউলি এবং শ্যাম লতাতে করছে জড়াজড়ি।
বছর বিশেক আগে
মনের অনুরাগে
থাকতো হোতায় পল্লী কবি অনেক দিবস ধরি।

(২)

ভোর হলে সে ডাঙ্গার মাঠে আগেই যেত ছুটি
মুখটি তাহার দেখতো রবি সবার আগে উঠি।
কোকিল নিশি ভোরে
ডাকতো তাহার দোরে
না উঠতে সে, কুসুমগুলি উঠতো আগেই ফুটি।

(৩)

সাঁঝের বেলা থাকতো পারের ঘাটটি পানে চেয়ে
ফিরতো বাড়ী কৃষক তা'রি তৈয়ারী গান গেয়ে।
হাসতো শুনে কবি,—
ডুবতো নভে রবি,
মাঝিরা সব যেত তা'দের বোঝাই নৌকা বেয়ে।

(৪)

গ্রামখানিকে ঘিরতো যখন রাঙা 'অজয়' বানে
উঠতো যেন কি এক তুফান কবির কোমল প্রাণে।
শশক শিশু ধরি
রাখতো বুকে করি
বাঁচাতো সব পাখীর ছানায় স্নেহের ছায়াদানে।

(৫)

রাখাল রাজার ভক্ত ছিল রাখালগণের প্রিয়,
অতিথিদের সৎকারেতে পুণ্য তাহার গৃহ।
সর্ব্ব জীবে দয়া
অতুল স্নেহ মায়া
হরিনামে চোখের বারি পরম রমণীয়।

(৬)

গেছে কবি নামটি তাহার গাঁয়ের বুকে আঁকা
তরুলতার শ্যামল গায়ে মমতা তার মাখা
আজও তাহার গানে
তা'রেই ফিরে আনে,
আজও তাহার বিহনে গ্রাম ঠেকছে ফাকা ফাঁকা।

একটি তারার প্রতি

ওগো সুদূরের রাণী!
কোন অমরার দ্রাক্ষা নিঙারি ভরেছ কুম্ভখানি।
নয়নে নয়নে এত মধুকথা, সোহাগিনী তুমি শিখিয়াছ কোথা,
আকুল আঁচলে পলকে পলকে মুখে বুকে লহ টানি।

(২)

নীল আকাশের তারা
গভীর নিশীথে পশে মোর কানে তব নূপুরের সাড়া
তুমি স্বরগেতে আমি ধরাগায় তবু চেনা চেনা লাগে যে তোমায়
সুধামাখা কার মুখখানি যেন তোমাতে হয়েছে হারা।

(৩)

ওগো গুরুজন ভীতা
তুমি যে আমার মানসমোহিনী নহ ত অপরিচিতা,
কত নিরজনে কত সন্ধ্যায় শত বার দেখা তোমায় আমায়
তুমি যে আমার হৃদি মালঞ্চে কনক অপরাজিতা।

(৪)

দাঁড়াও দাঁড়াও আলি,
তৃষিত পথিকে ও দ্রাক্ষারস দাও দাও সখি ঢালি,
পিয়াও পীযূষ ওগো বরনারী, হউক অমর তোমার পূজারী
কনক বরণি, কনক কুম্ভ হবে না তোমার খালি।

অস্থির

সুদূর ফুলের গন্ধ সম তোদের গতি চঞ্চলা
ধরে তোদের রাখতে নারে ধরা শ্যামল অঞ্চলা।
কোন কাননের কোকিল তোরা থাকিস্ রে কোন নন্দনে
দুদিন এসে পলাস্ হেসে ভরাস জীবন ক্রন্দনে।
তোরা সুখের সঙ্গী ওরে, তোরা সখের যাত্রী যে
দিস্‌নে রবি পড়তে ঢলে দেখিসনে কাল রাত্রিকে।
পথ যে তোদের ভরা আলোয় মধুর ভ্রমর গুঞ্জনে
শান্ত হৃদয় রঞ্জনেরি প্রণয় পীযুষ ভুঞ্জনে।
জমাট মেলায় 'ধূলোট' করিস, ঢাকিস সুনীল অম্বরে,
মুকুলধরা শুকাস তরু ব্যথা কি আর সম্বরে।
দোলের মাঝে মাথুর আনিস, সুখের মাঝে যন্ত্রণা,
আসর ভেঙে হঠাৎ পলাস বলরে এ কার মন্ত্রণা।
কোথায় রে 'সম' তোদের গানে কোথায় যে ছেদ ছন্দেতে,
ফোটার আগে পড়িস ঝরে অন্ধ ত্রিদিব গন্ধতে।
থামিয়ে দিস অস্থায়ীতে প্রাণ ভোলানো সঙ্গীতে
হঠাৎ ফেলিস যবনিকায় নিভাস্ আলোক ইঙ্গিতে।

অনুরোধ

রূপের লাগি যদি আমারে ভালবাস
চরণে ধরি ভালবেসো না
রবিরে ভালবাস রূপের আকর সে
আমারে দিওনা সখা যাতনা।
ধনের লাগি যদি আমারে ভালবাস
মিনতি করি ভালবেসো না
জলধি ভালবাস রতন আকর সে
মিটিবে সখা তব কামনা।
আমার লাগি যদি আমারে ভালবাস
জনম জনম সখা ত্যজো না

হৃদয় ফুলসম দিব হে তব পায়
আপনি বিকাইব আপনা।
রূপ ত দুদিনের সুখ সে স্বপনের
দুদিনে নিভে যাবে রবে না,
প্রেম যে চিরদিন রহিবে হৃদে লীন
কভু বিপথ পানে যাবে না।

খেলা শেষ

ধূলা খেলার সঙ্গী আমার দাওগো বিদায় দাও
আবার কেন কাতর চোখে আমার পানে চাও।
উঠান ভরা রৌদ্র আছে ডাকছে দোয়েল আম্র গাছে
নলিন নয়ন মলিন কেন যাও খেলগে যাও
ধূলা খেলার সঙ্গী আমার দাওগো বিদায় দাও।

(২)

তোরা নে ভাই যত্নে গড়া আমার খেলা ঘর,
আমার গড়া পাতার টোপর তোরা মাথায় পর।
রাঙতা দেওয়া পুতুলগুলি তোরা সবে নে ভাই তুলি,
আমার গাঁথা বকুল মালা আদর করে ধর,
বেলা এখন অনেক আছে কররে খেলা কর।

(৩)

খেলবো আমি কেমন করে হারিয়ে গেছে যে
মায়ের দেওয়া আমার পুতুল সোনার পুতুল রে,
সে যে আমার প্রাণের সাথী সাথেই থাকে দিবস রাতি,
হঠাৎ আমার বুকে থেকে ছিনিয়ে নিলে কে
তারে ছাড়া খেলবো আমি কেমন করে রে।

(৪)

মনে পড়ে সে মুখখানি আজকে পলে পল,
মনে পড়ে তাহার দুটি নয়ন শতদল।
মনে পড়ে দীর্ঘ বেলা মনে পড়ে সাধের খেলা
অধর কোণে হাসির রেখা শুভ্র নিরমল,
মনে পড়ে মুখখানি তার আজকে পলে পল।

(৫)

বিদায় আজি হৃদয় সখা তোমরা কর খেলা
আমার রবি ডুবু ডুবু ফুরিয়ে গেছে বেলা
শূন্য আমার খেলার ঘরে ধূলার স্মৃতি রইলো পড়ে,
কেউ বা তারে আদর করো কেউ বা অবহেলা
বিদায় আজি হৃদয় সখা তোমরা কর খেলা।

বৈষ্ণব পদাবলী

ভক্তির ভাণ্ডারে ওগো তোমরা সুন্দর
অক্ষয় উজ্জ্বল মণি, অমূল্য অতুল,
প্রেমের নন্দন বনে আছ নিরন্তর
চিরস্ফুট মধুময় পারিজাত ফুল।
প্রীতির পীযূষ সবে তোমরা নির্ম্মল,
চির নভ সুরভিত নীল ইন্দীবর
হরি পাদপদ্ম মাঝে চির অচঞ্চল
তোমরা সুতৃপ্ত মুগ্ধ প্রমত্ত ভ্রমর।
রাধার চরণ স্পর্শে উঠেছ কি ফুটি
ভক্তি বৃন্দাবনে শত অশোক মঞ্জরী
কিংবা মুকুতার মালা অভিমানে টুটি
ছড়ালো কবিতা কুঞ্জে ব্রজের সুন্দরী ?
না গো না বৈষ্ণব ভক্ত রেখে গেছে হেতা,
ছোঁয়ায়ে হরির পদে তুলসীর পাতা।

প্রতীক্ষায়

এখনো নদীকূলে রেখেছি তরীখান
নিরাশে কেটে গেল দীরঘ দিনমান।
অদূরে নীলাকাশে
তপন নিভে আসে
দিনের আলো ধীরে হ'ল যে অবসান
এখনো নদীকূলে রেখেছি তরীখান।

(২)

গহন কালো মেঘ জমিছে নভ গায়
ঝটিকা হু হু করে মরম বেদনায়।
ধূসর তরু শিরে
আঁধার নামে ধীরে
পথিক আর কেহ পথে না দেখা যায়
গহন কালো মেঘ জমিছে নভ গায়।

(৩)

ডেকেছে বান আজি ফুলিছে নদী জল
আঘাতি দু'টি তীরে করিছে কল কল।
ভাঙা এ তরী মোর
ভাসাতে করে জোর
তরণী ঘায়ে ঘায়ে কাঁপিছে অবিরল,
ডেকেছে বান আজি ফুলিছে নদী জল।

(৪)

দিতেছি খেয়া আমি বহু দিবস ধরি,
যাহার পথ চেয়ে হেথায় আছি পড়ি,
মোর সে প্রাণ প্রিয়
ভুলে কি গেল গৃহ,
সে চির পরিচিত এলো না আজো মরি,
দিতেছি খেয়া আমি বহু দিবস ধরি।

(৫)

পাব এ বুক মাঝে তাহারি পদ জোড়
কাষ্ঠ তরীখানি হবে কনক মোর।
রয়েছি হেথা হায়
এখনো সে আশায়,
তটিনি সাথে মোর মিশিছে আঁখিলোর
পাব এ বুক মাঝে তাহারি পদ জোড়।

(৬)

আঁধার ঘন ঘোর নব তুফান মাঝ
তরণী ডুবু ডুবু, বুঝিগো শেষ আজ,
আজিকে শেষ দেখা
দাও হে প্রাণ সখা,
হৃদয় মাঝে এসো, এসো হৃদয়রাজ,
আঁধার ঘন ঘোর নব তুফান মাঝ।

চূণ ও কালি

পুণ্যশ্লোক

লোকটা তিনি সত্য বটে ছিলেন পুণ্যশ্লোক
নামটি শুধু প্রভাত কালে করত না ক লোক
করতে কিছু বাকী বড় ছিল না ক তাঁর
করেন নাইকো জীবনেতে পরের উপকার।
সেই খেদটা মিটিয়ে গেলেন এত দিনের পরে
জীবনে যা করেননি তা করে দিলেন মরে।

প্রগল্‌ভ

মদমত্ত চামচিকা এক গরুড় পাখীর ঘাড়ে
উড়ে যেতে পড়ল গিয়ে সাঁজের অন্ধকারে।
প্রাতে গিয়ে বললে একটা কাণ্ড শোন খুড়া
আমায় পাখায় লেগে গরুড় কালকে হ'ত গুঁড়া।
ভাগ্যে একটু সামলে ছিল নৈলে হত সাফ,
কৃষ্ণ তারে রাখতে জেনো পারত নাক বাপ।
পক্ষীরা সব এসব কথা তুললে গরুড় কানে
চামচিকেটার অহঙ্কার যে যায় না সহা প্রাণে।
হেসে গরুড় বলেন তারে দাও গো বলিহারী
জানুক সবাই চামচিকেরি কাছেই আমি হারি

তার্কিক

রয়েছে 'ভাটপাড়া' ছাড়িয়া ভাট,
নাহি সে বাবু আছে 'বাবুর ঘাট',
নামটা 'শুকচর', নাহিক শুক,
দেখিয়া বাড়িয়াছে মোদেরও বুক।
চলিয়া গেছে যদি দেশেতে এতখানি,
হিঁদু না র'বে কেন ছাড়িয়া হিঁদুয়ানি।

আদর্শ শিক্ষক

পড়োর পিতা আসি করিয়ে সবিনয়
বলিছে ছেলে মোর বোকা কি অতিশয় ?
যা কিছু শিখেছিল বাড়ীতে মহাশয়
এখানে ভুলে গেল এটাত ভাল নয় ?
রাগিয়া কহে গুরু সড়াতে হবে মাটি
তবে ত পাকা 'ভিত' বসানো যাবে খাঁটি।
আইরি নাড়াগুলা তুলে না দিলে হেন
জ্ঞানের সারো কচু বসানো যাবে কেন ?
এসব সোজা কথা বোঝ না জ্ঞানহীন
জোলাপ্ না দিলে কি ধরে হে কুইনিন।

অপূর্ব্ব ওভরসিয়র

মণ্ডলদের দালান গেল বিশ বছরে ফেটে
ওভরসিয়র দেখে রেগে গেল্লেন বড়ই চটে।
বলেন আমি দালান করে দেখিয়ে দিতে চাই
মাল মসলার জ্ঞানটা লোকের একেবারেই নাই।
বিজ্ঞানেতে নেইক দখল পণ্ডিত যে সবে
দালানগুলো স্থায়ী বল কেমন করে হবে।
হ'ল দালান দুই বছরে ধরলো মহাফাট
গ্রামের লোকে হাসির রোলে লাগিয়ে দিলে হাট
বসেছিলেন যারা শুধু ওভরসিয়র কাছে
বলেন যত কারিগরি ফাটের মাঝেই আছে।

নীচ

সাত সমুদ্র তের নদী এলেন যেথা দোড়ে
এল নাক সেথায় রোষে খ'ড়ে এবং ফ'ড়ে।
এলেন যেথা হরি হরে আনন্দেতে মাতি
এলো নাক সেথায় কজন বকাসুরের জ্ঞাতি।

সকল পাখী এলো ছুটে তপোবনে সাধুর
রোষ করিয়া এলো নাক কালপেঁচা ও বাদুড়।
দুঃখ তাতে এতই বা কি তোমরা বল দেখি
মহাপ্রসাদ না খান যদি মড়াখেকো খেঁকী।

দারোগা

ভূতপূর্ব্ব দারোগা এক দাগীরে কন ডাকি
দেশে তোদের চোরের সংখ্যা তেমনি আছে নাকি ?
দাগী বলে একেবারে মিথ্যা নয় যা রটে
আপনি আসায় চোরের সংখ্যা কমতি কিছু বটে।
আমরা ত তাই দিবা নিশি করছি তোলাপাড়া
হুজুর বিনে হয়ে আছি অভিভাবক হারা।

ইচ্ছামৃত্যু

দুটি বছর জ্বর ও শোথে পেয়ে অশেষ কষ্ট
ভীমরতিতে দুমাস আগে স্মৃতিই হল নষ্ট।
মুখে নাইক হরেকৃষ্ণ নারায়ণ কি গঙ্গা
দুদিন আগে হারাইল একেবারে সংজ্ঞা।
রাখতে শেষে ডাক্তার এবং আত্মীয়দের মানটা
অনেক কষ্টে অনিচ্ছাতে ত্যাগ করিলেন প্রাণটা।
বলে লোকে অবাক হয়ে, দেখুক এবার বিশ্ব
মরণ বলে মরণ এ যে মলেন যেন ভীষ্ম।
একেবারে ইচ্ছামৃত্যু, মরণ নয় এ মোক্ষ,
ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটে নাইক এইটুকু যা দুঃখ।

ভীষণ চোর

সুধায় পথিকে এক ভদ্রলোক ডাকি
এই হুঁকা কোথা পেলে মোরে কহ দেখি।

এ যে মোর হুঁকা আছে সহস্র প্রমাণ
জল পুরে টানিলেই বেজে উঠে টান।
বলিহারী দাগাদারি পাছে হয় গোল
সেই ভয়ে বদলেছ নলচে ও খোল।

পক্ক ইচড়ের গান

আমার পাকার যখন কথা ছিল তখন পাকিনি,
আমি আগে ভাগে পেকে গেছি খেয়াল রাখিনি।
আষাঢ়েতে পাক্‌লো যে ধান,
'সমের' আগেই থামলো রে গান
না দেখিয়াই মজলো রে মন এমন দেখিনি ;
আমার পাকার যখন কথা ছিল তখন পাকিনি।
দিন দুপুরে উঠলো রে চাঁদ আমার গগনে
'বলো হরি' করলে আমায় বিয়ের লগনে,
এ ব্যথা কি ফুরায় কয়ে,
ললিত গেল বেহাগ হয়ে,
কুঞ্জে আমার করলে কালীএ কোন ডাকিনী
আমার পাকার যখন কথা ছিল তখন পাকিনি।

বনমল্লিকা

অস্ফুট

ফুটে গন্ধ বিলিয়ে যারা পড়লো ঝরে পড়লো গো,
তাদের লাগি আকুল সারা কুঞ্জ যে,
গন্ধ বুকে বন্ধ করে, না ফুটে যে ঝরলো গো
তাহার তরে কই না ভ্রমর গুঞ্জরে।

(২)

পলায় যে জন ধরায় করে সুধার ধারা বৃষ্টি গো,
হয় যে সে সুর শতেক প্রাণে ঝঙ্কৃত।
না গেয়ে যে পড়লো লুটি, বিফল কি তার সৃষ্টি গো
কোথায় ব্যথা রইলো তাহার অঙ্কিত।

(৩)

যে বীজটি হায় গড়লো তরু, সফল তাহার জন্ম গো,
হারিয়ে গেল বিরাট মাঝে ক্ষুদ্র সে,
বুঝবে কে তার গুপ্ত ব্যথা, বুঝবে কে তার মর্ম গো,
ক্ষুদ্র করে রাখলে যে তার রুদ্রকে ?

(৪)

মহারাজের পুত্র সে যে থাকলো হয়ে ভৃত্য গো,
পর্ণবাসে যাপলো জনম দুঃখেতে,
গাণ্ডীবী হায় বৃহন্নলা মগ্ন লয়ে নৃত্য গো,
তূণীর তোলা রইলো শমীবৃক্ষেতে।

(৫)

শ্রীবৎসরাজ রইলো মিশে কাঠুরিয়ার সঙ্গে গো,
নল রাজের কাটলো জীবন রন্ধনে,
কৌস্তভে হার চিনলো না কেউ, উঠলো না শ্রী অঙ্গেতে,
চন্দন কাঠ লাগলো ধরার ইন্ধনে।

(৬)

পুণ্যমুকুল পারিজাতের শুকিয়ে গেল বৃন্ত গো,
হেম মরালের কণ্ঠে ছিল পত্রটি,
অমৃতের সে বার্তাবহ নারলে তারে চিনতে গো,
পেলে না তার পড়তে লিপির ছত্রটি।

(৭)

সে যে কালের জতুগৃহে দারুণ তাপটা সইলো গো,
করলো না তো দিনেক তরে রাজ্যভোগ,
বিরাট গৃহে ক্ষুদ্র হয়ে রইলো সে যে রইলো গো,
জীবনে আর আসলো না তার ইন্দ্রযোগ॥

অপূর্ণ

মাগিতেছে পূর্ণাহুতি দীপ্ত হোমানল,
কোথায় ঋত্বিক? ধরা করিতেছে খেদ,
কোন ইন্দ্র হরে নিল তুরগ চঞ্চল,
অপূর্ণ রহিয়া গেল মহা-অশ্বমেধ।
কোন অবিশ্বাসী দিল মুক্ত করি দ্বার—
অর্দ্ধগড়া মূর্ত্তি, হ'ল বিশ্বকর্মা চুপ;
দেবতা গঠন সাঙ্গ হলনাক আর,
অসমাপ্ত রয়ে গেল অফুরন্ত রূপ।
অর্দ্ধলেখা কাব্য রাখি গেল চলে কবি
প্রেম গেল স্মৃতি রাখি হৃদি কোকনদে,
গেল শিল্পী রাখি রম্য অসমাপ্ত ছবি
পূর্ণতা কাদিয়া মরে অপূর্ণের পদে।
শুক্লা চতুর্থীর চাঁদে বৃত্ত রেখা ক্ষীণ
আলোকের আবছায়ে হয়ে থাকে লীন।

বিষাদ ছবি

তোমায়ে দেখেছি ওগো আকুলিত লোচনে
অনুখন শোচনে ও আঁখিজল মোচনে,
রাঙা রাঙা ভাঙা মেঘে সবিতার শ্মশানে
সুষমার চিতা পাশে বিজয়ার ভাসানে।

(২)

ফলশেষ তরুতলে ফুলশেষ লতাতে
আঁখিজলে বাধা পাওয়া আধা আধা কথাতে।
বুকে চাপা দুখে কাঁপা দুখিনীর অধরে,
পোকা ধরা নুয়ে পড়া ফুলকলি অধরে।

(৩)

শিশুহারা হরিণীর ছলছল আঁখিতে,
ভোল নাই ভাবাকুল আঁখি তব রাখিতে।
বিহগেরে খরশরে বেঁধে যেই নিষাদে
বুকে তারে ধরি কাঁদ বিষাদিনী বিষাদে।

(৪)

রঙ আঁকা ধুলাঢাকা বিধবার মুকুরে,
ঘুনধরা কাঁচাবাঁশ পদহারা নূপুরে।
এসো কেঁদে কেঁদে ফোলা আঁখিকোলে মসিতে,
মিশে রও নিশিশেষে ঢুলেপড়া শশীতে।

(৫)

বল কোন উচাটন ব্রতে ছিলে লগনা,
ছিলে কোন ধূমাবতী ধ্যানে তুমি মগনা?
হলে তুমি বল কার বঞ্চিত সোহাগে,
মরমের বীণা তার বাঁধিয়াছ বেহাগে?

ভাঙা

ভাঙা তুমি রবে রাঙা চিরদিন রক্তে
যুগে যুগে আঁখিজলে কাঁদাইবে ভক্তে।
ফুলধরা ভাঙা শাখী, চৈতে ভাঙা ক্ষেত্র
ম্লানমুখে চেয়ে থাকে ছলছল নেত্র।
তাপিতের ভাঙা কথা, ভাঙা নাল পদ্ম
করে রাখে মরমেরি কাতরতা বদ্ধ।
ভাঙা বুক, হতসুখ, জনপদ ত্যক্ত,
অকথিত কাহিনী যে করে নিতি ব্যক্ত।

মহিমায় সোমনাথ মোছেনাক ধ্বংসে
অপরূপ পুরুভুজ পূর্ণিত অংশে।
দেয় স্মৃতি অনুভূতি অমরতা বরগো,
জড়ীভূত হয় পাণি, লেগে রয় খড়্গ।
অস্ত্রেতে গৌরব হয় না ক অস্ত
কাল কাঁদে ধরি কালাপাহাড়ের হস্ত।

নান্নুর

বঙ্গের বৈশালী তুমি, গুপ্ত তপোবন,
গীতের গঙ্গোত্রী তুমি বন্দি শ্রীচরণ।
প্রেমের পবিত্র নীরে করিবারে স্নান
আনিয়াছি বহি হেথা ভগ্ন দেহ প্রাণ।
কোথা সেই দুষ্ট ছেলে যে হেথায় বসি
অনুদয়ে নেহারিল নদীয়ার শশী।
রাখালের সাথে মিশে যেই ভাগ্যবান,
রাখালরাজের আহা লভিল সন্ধান।
পেলে যার পুণ্য হৃদি প্রেমে ভরপুর
রামীর কাঁকণে, রাই মঞ্জীরের সুর।
ভোগবতী উচ্ছসিত ভোগপথে যার,
মালা হ'ল হরির হিয়ার হেমহার।
কোথা ওগো রজকিনী গরবিনী তুই
ফুটেছিলি জবা সাথে অৰ্দ্ধফোটা যুঁই।
বঁধুর মধুর প্রেমে হারাইলি নাম,
নয়ন অনলে করি ভস্মীভূত কাম।
চন্দ্র হ'ল তোর ক্ষুদ্র কপালের টিপ
স্বরগবৰ্ত্তিকা হল বাসর প্রদীপ।
তুই সোহাগিনী বড় আদরিণী ধনি
নীলাম্বরী খুঁটে বাঁধা নীলকান্ত মণি।

রামকমল

রামকমল অতিশয় আমুদে লোক ছিলেন, বৃদ্ধ বয়সেও বালকের ন্যায় উৎসাহ ও সরলতা ছিল। তাঁহার বার্দ্ধক্যকে আমি 'শুক্লসন্ধ্যা' বলিতাম।

বুকখানি তার তেমনি আছে মুখখানি তার শুকিয়েছে,
কেবল বুড়ার মুখোস্ পরে বুকের শিশু লুকিয়েছে।
জড়িয়ে যাওয়া প্রাণের শিকড় নড়িয়ে তারে তুলবে কি,
রোদের তাতে শ্বেত করবী সুরভি তার ভুলবে কি?
মাথায় কালো কেশগুলি তার কাল ত সাদা করছে রে
কেদারনাথের মন্দিরেতে শীতের তুষার ঝরছে রে।
কণ্ঠে তাহার কস্ লেগেছে মনের ভিতর গান গাহে,
শিবের মাথায় কুলকুলিয়ে উঠছে আজি গঙ্গা হে।
প্রজাপতির ঝাঁক বসেছে বৃন্তশিথিল রঙ্গনে,
খোঁপের কপোত দিচ্ছে বাজি প্রাণের গগন অঙ্গনে।
আনন্দ তার পদ্ম মধু করবে কে তায় তিক্ত নিম্
'তপ্ত তোয়া'র উষ্ম ধারা না'রবে জরা করতে হিম।
জীবন ভোরের ভাবমাখা হায় পূর্ণিমারি সন্ধ্যাতে,
শিউলি কলি পড়ছে নুয়ে শুভ্র নিশিগন্ধাতে।

প্রণতি

মোরা ভকত মহত পদ রেণু পিয়াসী।
তাই চরণে লুটাতে শির, ভাল যে বাসি।
তোমরা গরবে শির কর না নত,
হাসিয়া বহিয়া যাও ঝড়ের মত,
আহা চরণে দলিয়া যাও আশীষ রাশি।
মোরা ভকত মহত পদ রেণু পিয়াসী।
ও ধূলার কত গুণ জান না ধনি?
ও যে লোহারে কনক করা পরশমণি।
অশনি কুসুম হয় পাষাণ গলে,
মরুরে ভাসায়ে দেয় জোয়ার জলে,

ও যে ধরার বেদন বঁধু কলুষনাশী—
মোরা ভকত মহত পদ রেণু পিয়াসী।
ওই স্বরগের দেওয়া স্বাতী তারার জলে
হৃদয়ে ভকতি মহা মুকুতা ফলে,
ওযে শ্যাম অনুরাগীদের আবীর কণা
কলুষ কালিয়ানাগ লুকায় ফণা,
ও যে মূকেরে মুখর করে মরি সাবাসি
মোরা ভকত মহত পদ রেণু পিয়াসী।

রামপ্রসাদ

তুমি আসিবার আগে ফুটিত না হেথা
আমাদের গৃহ জবা বারোমেসে ফুল,
তুমি আসিবার আগে রাঙা রঙে তার
সে রাঙা চরণ ব'লে হ'ত নাকো ভুল

২

তুমি আসিবার আগে রাজ-রাজেশ্বরী
শুভঙ্করী ভয়ঙ্করী ছিল মা মোদের,
মায়েরে মা ক'রে নিলে তুমিই প্রথম
চিনাইলে অন্নপূর্ণা ধাত্রী জগতের।

৩

তুমি যে দামাল ছেলে আদুরে গোপাল,
কেড়ে নিলে মুণ্ড মালা, অসি খরধার,
মায়ের আটাসে ছেলে, অতুল সোহাগ,
দশ হস্তে ঘুরে ফিরে ঝিনুক খোঁকার।

৪

ভক্তি আর শক্তি এক, নহে ভিন্ন ভেদ,
তুমিই দেখায়ে দিলে করিলে প্রচার,
গান আর প্রাণ তুমি ক'রে দিলে এক,
ভক্তিকে করিয়া দিলে পূজা উপচার।

৫

হে ভক্ত, পূজার লাগি গড়ে দিলে তুমি
ভক্তি ভরে যেই শিব গঙ্গা মৃত্তিকার,
জাগ্রত দেবতা হয়ে মহামহিমায়
হ'ল তা অনাদি লিঙ্গ পূজিত সবার ॥

পুরাণো প্রেমপত্র

হঠাৎ যেন উঠলো বেজে হুলুধ্বনি বাজনা শাঁক
শিষ দিয়ে কে আনলে ডেকে হারানো মোর পায়রা ঝাঁক।
শুকনো ডালে উঠলো যেন কুসুম কোরক মুঞ্জরি
পাঁপড়ি ঝরা বৃন্তে এলো মত্ত ভ্রমর গুঞ্জরি।
দোলের আবির ছড়িয়ে দিলে ত্যক্ত তিমির কুঞ্জে কে
জ্বাললে ভাঙা নাট্যশালায় সুপ্ত দীপ পুঞ্জ রে।
যৌবনেরি লজ্জা হাসি চুম্বনেরি দ্রাক্ষারস
কেমন করে রাখলে ধরে শুষ্ক কালীর কৃষ্ণ কস্।
কাল যাহারে রাখতে নারে কালী তারে রাখলে গো
যৌবনেরি যৌতুকেরে যতন করে আগলে গো।
হারা তরীর পণ্যরাশি বাঁশীর হারা সঙ্গীতে
ফিরায়ে কে আনলে আজি অমনি আঁখির ইঙ্গিতে।
কোন অলকার যক্ষবালা দক্ষ তুমি মোর প্রিয়ে
রাখ্‌লে প্রেমের মণি মাণিক এমন করে যক্ দিয়ে।

প্রবাসী

বনবাস মোর শেষ হবে কবে, জান যদি কেহ কহ রে?
চৌদ্দ বরষ রয়েছি যে আমি পাড়াগ্রাম ছাড়ি সহরে।
কাননে রামের বহু সুখ ছিল, ছিল ফুল তরু লতা হে,
স্বচ্ছসলিলা ছিল গোদাবরী ভুলাতে পারিত ব্যথা হে।
এখানে তো নাই বনমর্মর, বনবিহগের সাড়াটি,
অগাধ জলের বদলে পেয়েছি ক্ষীণ কলজল ধারাটি।
কোথা আমগাছ ঝুল ঝাপ্পুর, কোথা বটগাছে ঝুলবো
কোথা অজয়ের সেই শ্যামকূল যেথা বুনো ফুল তুলবো।

কোথা কসকুসে কাঁকুরের ক্ষেত, ছোলা মটরের ভুঁই মা,
রাজা হব কোথা, বিমাতার মত বনে পাঠাইলি তুই মা।
যাব মিথিলায় মহাসমারোহে কোথা হরধনু টুটতে,
তুই মা আমারে বনে পাঠাইলি মারীচের পিছু ছুটতে।
হাঁপ ছাড়িবার সময় নাহি মা, জঠরে নাহি মা অন্ন,
দিশেহারা হয়ে ছুটেছি কেবল স্বর্ণমৃগের জন্য।
আর কি তোমার কোমল কোলে মা পাব নাকো আমি ফিরতে,
শৈশব সুখস্বর্গ আমার সরযূর তীর তীর্থে ?

মা

কি মহিমা মায়ের নামে কেমনতর টান,
গোলক ছেড়ে বালক হতে চায় যে ভগবান।
বসুন্ধরা অধীর সে ত' মায়ের স্নেহ স্থির
ক্ষীরোদ সাগর কোথায় পাবে এমন মিঠে নীর ?
সাতটী জনম সাত সাগরে যত্নে ঢেলে গা—
স্বর্গ হতে মূর্ত্তি ধরে মর্ত্তে আসে মা।
সাত সাগরের রত্ন আনে, যত্নে হৃদিতল,
সাত সাগরের পীযুষ আসে স্নিগ্ধ ঢল ঢল।
চক্ষে আসে সূর্য্য শশী, বক্ষে বরুণা
ইন্দিরা বর স্বর্ণ ঘটে শুভ্র করুণা।
গাভীর বাঁটে দুগ্ধ আসে, নদীর বুকে জল,
লতার বুকে পুষ্প হাসে, তরুর বুকে ফল।
মায়ের নামে গঙ্গা পূজা লক্ষ্মী পূজা পান,
মা করে দেন মহামায়ার স্নেহের পরিমাণ।
তীর্থে ঘোরে নিত্য লোকে স্বর্গ লাগি হায়
স্বর্গ আসে দেখতে মরত মায়ের পদছায়।

খোকা

একটি বছর গিয়েছিল শুধু বিদেশে,
দুষ্টামি আর করে নাক কেন সে এসে।

জ্ঞানটি হল ছ বছরে এত কি বেশী
ছেড়ে দিলে এমন করে ছেলে মানুষী ?
অপ্রতিভ সে সদাই যেন সকল কথাতে
চিন্তা এলো কোথায় থেকে তাহার মাথাতে।
'খোট করা' তুই ভুলে গেলি কার কথা শুনি ?
গাণ্ডীবে তোর ফেলে দিলি ওরে ফাল্গুনি।
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল মোরে বল দেখি
ফেললি রঙিন পাখা ছিঁড়ে ওরে মোর শিখী ?
দুষ্টামি তোর ছাড়িস নাকো শোন তোরে বলি
মৃণালে তোর থাকুক কাঁটা রে কমল কলি।
তৃপ্ত ধরা দীপ্ত মধুর জ্যোৎস্না পেলে,
কাজ কি কালো দাগটি চাঁদের মুছিয়া ফেলে।

দেবরোষ

সকল ছেলের হাতে তুমি মিষ্টি দিলে তুলে,
ইচ্ছা করে গেলে তুমি খোকায় দিতে ভুলে।
বুকটা তোমার এতই পাষাণ করলে তুমি কি ?
গরিব বলে রিক্ত করে ফিরিয়ে দিলে ছি।
কুসুম কলি মলিন হ'লে নিশির শিশির ঝরে
বাছার মলিন বদনখানি দেখলে কেমন করে ?
বিফল তোমার বাদ্য ঘটা জগৎ নিমন্ত্রণ
দোলের গোপাল ফিরিয়ে দিলে বিফল আয়োজন।
অমৃতেরি অংশ পেলে সকল দেবদল
শিবের তরে রাখলে তুমি কেবল হলাহল !
জড়িয়ে দিলে ঋষির গলায় সর্প মৃত এনে
দুর্ব্বাসারে অবজ্ঞাটা করলে জেনে শুনে।
যুধিষ্ঠিরের রক্ত ও যে শিশুর চোখের জল
মুছাও মুছাও পড়বে যেথা আন্‌বে অমঙ্গল।

চৈত্র বৈশাখী

বসলো নাতি ঠাকুরদাদার কোলটি সারা জুড়ি,
সংসারেরি পক্ক ফল ও নূতন ধরা কুঁড়ি।

ওপারেরি যাত্রী এবং নূতন আগন্তুকে
পারের ঘাটে মধুর আলাপ করছে মনোসুখে।
প্রভাতকালে পশ্চিমেতে অস্তাচলে বসি,
সম্ভাষিছে অরুণেরে শুভ্র রাকাশশী।
লক্ষ্মীজোলে পাকার পাশে নূতন রোয়া ভুঁই
ধুতুরারি পত্র ফাঁকে অর্দ্ধ ফোটা যুঁই।
বাঁধলো অতীত ভবিষ্যতে দিয়ে সোনার রাখী
ফুলল ভোর ও শ্যামল সাঁজে মধুর মাখামাখি।
কালো মেঘের মাঝে উজল কণক কিরণ রেখা,
ভরত বাক্য শেষে নূতন প্রস্তাবনা লেখা।
মাথুর এসে মিশলো হঠাৎ পূর্বরাগের সনে
মধুরতর নিবিড় মিলন—বোধন বিসর্জ্জনে।
হৃদয় ভরা কোলাকুলি সাদা কালোর সাথে
যুক্ত ত্রিবেনীতে মিলন গঙ্গা যমুনাতে।
হংস উঠে শিউরে শিখী পুচ্ছ তুলি নাচে
কার্ত্তিকেয় দাঁড়ায় যবে চতুর্ম্মুখের কাছে।

সাপুড়ে

সাপটি তাহার মরে গেছে কাঁদছে আজি বুড়া,
সঙ্গে তাহার কাটলো যে হায় সাতটি বরষ পূরা
শুকায়নিকো হস্তে তাহার দংশনেরি ক্ষত,
হায় রে তবু সাপের লাগি'দুঃখ করে কত।
নীরব প'ড়ে তুবড়ী পাশে শূন্য ঝাঁপিতল,
চক্ষু ফেটে আসছে বুড়ার টস টসিয়ে জল।
এ যেন রে কাঁদছে আজি দস্যু খুনের বাপ,
সইলে যে হায় জীবন ধরে সুতের লাগি' তাপ।
যাহার লাগি ঝালাপালা নিতুই জ্বালাতন,
তার তরেও অশ্রু ঝরে হায়রে পোড়া মন।
কখন উড়ে বসিস্ জুড়ে হঠাৎ রচিস্ ঘর
সাবাস্ স্নেহ সর্ব্বনেশে তোর চরণে গড়।

ভিখারী

এই লোকটি আমাদের বাড়ী ভিক্ষা করিতে আসিত। আমার একজন বন্ধু তাহাকে দেখিয়া তাহার পরিচয় দিলেন। তাহাদের বাড়ী বন্ধুর গ্রামে ও তাহাদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। সে আর সে দিন হইতে আমাদের বাড়ী ভিক্ষা করিতে আসিত না। আর দেখিও নাই।

আজ দেখ সে আমার কাছে ভিক্ষা চাহে নি,
তুল্‌লে কেন তাহার গত সুখের কাহিনী?
তোমার গাঁয়ে উহার বাড়ী কাউকে বল না,
আজ দেখ হায় ভিক্ষা উহার করাই হল না!
ভগ্ন পদ ছিন্ন পাখা ত্যক্ত মরালে
কেন তুমি মানস সরের তীরটি স্মরালে?
কর্দ্দমেতে লিপ্তপদ পতিত ভ্রমরে
অতীত পরিমলের বাসে কাঁদায় গুমরে।
শিকলি বাঁধা হরিণ ছিল সকল পাসরি
বনের কথা আন্‌লে মনে কাহার বাঁশরী?
এ যেন রে পড়ো বাড়ীর ভগ্ন উঠানে
উঠলো বেজে সানাই বাঁশী বোধন বিহানে।
প্রাণ দিলে এ মিশর মমির বক্ষে কি করি?
ভস্ম খুঁড়ে করলে বাহির পম্পী নগরী!

বন-ভোজন

চড়ুই ভাতি করছে মাঠে ছোট ছেলের দল
ভোজন চেয়ে দ্বিগুণ বেশি পুলক কোলাহল,
উনানেতে ফুঁ দেয় কেহ চক্ষু করে লাল
কাঠের লাগি ভাঙছে কেহ শুকনো মোটা ডাল।

(২)

আনছে কেহ বেগুন তুলি আনছে কেহ শাক,
ঐ যে উনান জ্বল্‌লো বিষম চিন্তা গেল যাক্।
আতপ আছে, দুগ্ধ আছে, আছে নলিন গুড়
সবার চেয়ে অধিক আছে আনন্দ প্রচুর।

(৩)

সন্তরণে অজয় জলে তুলছে কেহ ঢেউ
কাঁচা রোদে বালির চরে ডিগবাজী দেয় কেউ।
বটের গাছে কেউ বা দোলে কেউ বা করে গান,
আমোদেতে নাই রে খেয়াল যায় যে দিনমান।

(৪)

ঘরে আমি একলা বসে ব্যস্ত কাজে মন,
হঠাৎ দিলে সোহাগ সাড়ায় সাদর নিমন্ত্রণ।
জোর করিয়া হাত ধরে যে সবাই দিল টান
উঠলো ভেসে চড়ায় লাগা প্রাণের ডিঙিখান।

(৫)

বেদনারি খনির তলে নিত্য করি কাজ
তারে কেন সাজবে বল 'নিষাদবাগে' আজ।
শুষ্ক তালু যে জন যাচে কণা ফটিক জল
'বসুধারার' কাছে তারে আন্‌লি কেন বল ?

(৬)

শৈশবেরি রাজসূয় এ দেবের মহোৎসব,
হেতায় কেন সাজবে ভুকা কাঙালীদের রব।
আনন্দের এ অন্নপ্রাশন, ন'বৎ বীণা বাজ !
বিরাট পাঠের পুরোহিতে নাইকো কোন কাজ।

উৎসব তিথি

নিদাঘের চাঁপা তুমি, শরতের সেফালি,
দিবসের ছায়া তুমি, রজনীর দীপালী।
সন্ধ্যার মেঘে তুমি তারা হেমবরণী,
কুলহারা তুফানের কণ্ডকের তরণী।

ঝরাপাতা ভরা বনে আনো তুমি রসালে,
পোড়াবাড়ি ভরে দায় রঙ বাতি মশালে।
পাহাড়ে বুকে তুমি জনারের ক্ষেত গো,
একটানা বেদনায় পূর্ণচ্ছেদ গো।

ভাঙা ঘরে এসো তুমি ভুলাইতে ব্যথাটি;
দেবহীন দেউলের ফাটা বুকে লতাটি,
শান্তির কোঁটা তুমি দাও দীন কপালে,
ভাণ্ডীর বনে তুমি এনে দাও গোপালে।

হে অতিথি নব নিতি দেখা দিতে ভুলো না,
ঝর ঝর বারিধারে ঝুলাইয়ো ঝুলনা,
মাঘে যবে পড়ে রবে জীবনের বেলা গো,
তুমি তাতে বসাইয়ো কুম্ভের মেলা গো।

প্রথম চিঠি

এইখানি তার প্রথম চিঠি হাতের প্রথম লেখা
আঁখরগুলি হিজি বিজি সারগুলি সব বাঁকা,
অফুট ফুলের সৌরভ এ গৌরবে তার ভরা
খেলার ঘর এ তাজমহলের শিল্পী শিশুর গড়া।
বালক ফিডিয়সের পুতুল তৈরী নিজের হাতে,
শিশু কালিদাসের কাব্য লেখা খাতার পাতে।
র‍্যাফেলের এ হাতের ছবি শৈশবেতে আঁকা,
খনির প্রথম মণি এ যে কাদা ধূলায় মাখা!
তানসেনের এ সা রি গা মা লীলার অঙ্করাখা,
ডিমস্থিনির তোৎলামি এ মধুরতায় মাখা।
অর্জুনের এ খেলার সায়ক, প্রভাত রবির ছটা
আষাঢ়েরি প্রথমে এ নবীন মেঘের ঘটা।
বসন্তের এ প্রথম কলি, চাঁদের প্রথম আলো,
এইখানি তার প্রথম চিঠি বাসি যারে ভালো।
কোকিলার এ প্রথম সাড়া শিখীর প্রথম কেকা
এইখানি তার প্রথম চিঠি হাতের প্রথম লেখা।

মেঠো গান

অষ্টাঙ্গেতে নাইকো কোথাও অষ্টরতি সোণা
পরণেতে রাঙা পেড়ে শাড়ি তাঁতের বোনা।

পা দুখানি আলতা রাঙ্গা পাড়া গেঁয়ে মেয়ে,
কর্ম্মকাজে গিয়া ধনী আত্মীয়দের গৃহে—
থাকে যেমন উপেক্ষিত তেমনি মেঠো গীত
সাহিত্যেরি হর্ম্ম্যে ফিরে হয়ে সশাঙ্কিত।
নেইক তাহার গয়না গাঁটি নাইক ভাল বেশ,
অমার্জ্জিত রূপটি তাহার,অসংযত কেশ।
যদি বা কয় দু'এক কথা শুনে কথার টান,
হাস্য করে অন্য সবে রয় সে ম্রিয়মান।
একটি কথা বলতে গিয়ে খায় সে থতমত,
একটি দিবস হয় যে মনে একটি যুগের মত।
সভ্যতা হায় চেড়ীর মত রয় তাহারে ঘিরি—
কাঁদে বালা পঞ্চবটীর কুটীরখানি স্মরি।

ভাঙা দেওয়াল

কাঁদে ও দেয়াল ভাঙা ভাঙা তার বাটিকা,
এ যেন আধেক লেখা বিষাদের নাটিকা।
একমেটে প্রতিমা এ রেখে গেছে পূজারি,
হৃদয়ের সব সাধ দিয়ে গেছে উজারি।
যত কথা যত ব্যথা যায় নি সে বলিয়া
এ দেয়াল দেয় বলি পাটে পাটে গলিয়া।
যত আশা ভালবাসা রেখে গেল বাসাতে,
আজ তাহা জাগে বন মর্ম্মর ভাষাতে।
আসি বলে গেছে চলে তাই এত ব্যথা রে
পাবে তীর মরণের নীর সে কি সাঁতারে।
কে জানে কণকতরী স্থির জলে তলাবে,
আধগড়া বাসা ভুলি বুলবুলি পলাবে।
যতনের ফুল কলি ফুটিল না ফুটিল,
বৃথা হল জলসেচ ওরে কাল কুটিল।
ফুরালো আতস বাজী আলোকের মালা রে,
নিভে গেল কুহকীর ক্ষণিকের খেলা রে।

অজ্ঞাত

গীতটি জানি রচিত কার জানিনে তার নাম
কোন দেশেরি লোক সেটি গো কোথায় তাহার ধাম
এই সহকার বনস্পতি যত্নে রোপা কার,
নাইক জানা, ফল ছায়া সে দিচ্ছে উপহার।
এই মনোহর মন্দির হায় শিল্প কাজে ভরা
জানতে ওগো পারবে না ত কাহার হাতে গড়া।
এই যে মহাগ্রন্থখানি রাজার নামে খ্যাত,
তৈরি কাহার আর পৃথিবী জানতে দেবে না ত।
এগুলিরে দেখলে পরে কান্না আমার আসে
পরের ছেলে কাটাচ্ছে দিন ছেলেধরার বাসে।
কেউ বা যেন পোষ্য পুত্র ইচ্ছাতে হায় দেওয়া
কিংবা কিছু অর্থ দিয়ে আপন করে নেওয়া।
কাহার ঘরের গৌরব হায় কাহার ঘরে নীত,
কর্ণ স্থতপুত্র বলে সবার পরিচিত।

অভয়

বিপদ সাগর গর্জ্জে যদি ভয় করোনা মন
অগস্ত্য যে আসছে পথে দণ্ড কতক্ষণ।
রাজার চেয়ে নইত কমি গরব কিসের তার
ফকির চেয়ে নই যে বড় কিসের অহঙ্কার।
জীবন আমার অফুরন্ত অন্ন কোথা হায়
পলের সে যে ইন্দ্রধনু ওই মিলিয়ে যায়
বাড়তি নহে কম্‌তি নহে নিক্তি ধ'রে দান,
দারুণ ভগবান সে যে গো করুণ ভগবান!

(২)

ভয় ও আছে, অভয় আছে, আছে বুকের বল,
কাঁটাভরা মৃণাল আছে, সোনার শতদল,
শিশু পালে বধ ক'রে সে, রাখালে দেয় কোল,
ইংগিতে সে জগৎ দোলায় কদম্বে খায় দোল,

বলির মাথায় দেয় সে পদ, ভৃগুর পদে বুক,
ভয়কে করে অভয় সে যে দুখকে করে সুখ,
আছে পাঞ্চজন্য ধ্বনি, আছে বাঁশীর গান,
দারুণ ভগবান সে যে গো করুণ ভগবান।

দূরের যাত্রী

নাইক দেরী ছাড়বে তরী আঁখির পলকে
শেষ মালা মোর জড়িয়ে দিলাম তোমার অলকে।
যে ফুল ছিল আমার প্রাণে
দুল হবে সে তোমার কানে
অশ্রু আমার মুক্তা হবে তোমার নোলকে।

(২)

বসন্ত ছয় কাটলো সখি এই সে তীরেতে
বক্ষে মালার ঠাঁই হত না ক্ষুদ্র নীড়েতে।
তীরের স্নেহ তরুর ছায়া
সাথীর প্রীতি নীড়েব মায়া,
ছেড়ে যাবে এমন ক'রে জানতো বল কে?

(৩)

সইরে তব স্বর্ণ স্মৃতি বক্ষ জুড়ানো
রইলো মণি মঞ্জুষাতে যত্নে কুড়ানো।
অনুরাগের অলক্তকে
চরণ তব দিলাম এঁকে
বিদায় ব্যথা রইল গাঁথা হৃদয় ফলকে।

কূলের টান

খেয়ার তরী ছাড়ছে আজি ভাঙন ধরা পার
হাত কেন তোর নড়ছে নারে পড়ছে খসে দাঁড়।
ঘরের শোভা চোখের বানে ধুয়ে গেছে সবাই জানে
দেয়াল যে ওই পড়ছে খসে মায়া কিসের আর?

(২)

ভাব দেখি ওই ভাঙা ভিটায় আছে বা তোর কি ?
রাখবে রোপা অপরাজিতা আগ্‌লে তোরে ছি।
বেণুর শাখা বাতাস পেলে অমন করে নিতুই দোলে
ডাকছে বলে চকিত হয়ে চাস্‌নে বারম্বার ।

(৩)

অমনি লতা জড়িয়ে থাকে নদীর ভাঙা তট,
শ্যামল বাহু বাড়িয়ে থাকে অমনি ক'রে বট।
ছেলে মেয়ে নদীর কূলে অম্‌নি থাকে নয়ন তুলে,
এত পিছু চাইলে যাওয়া উঠবে হয়ে ভার !

(৩)

সকল লেটা চুকিয়ে এলি তবু কিসের টান,
ওই মাটীতে শিকড় গেড়ে ছিল কি তোর প্রাণ।
ভাঙলে ও যে যায় না ভাঙা টানতে ঝরে শোণিত রাঙা
ছিড়ে ও যে ছেঁড়ে না তোর মিনি সুতার হার।
খেয়ার তরী ছাড়্‌ছে আজি ভাঙন ধরা পাড়।

সমাপ্তি

ধূলোট হয়ে গেছে ভাঙ্গিয়া গেছে মেলা,
পাতের ঠোঙা লয়ে কাকেরা করে খেলা।
ভাসান হয়ে গেছে, বিজন পুজাবাড়ি
জাগিছে উৎসব স্মৃতিটী বুকে তারি।
ফুরায়ে গেল ধীরে বিবাহ উৎসব,
নীরব নহবৎ, নীরব হুলুরব,
যেতেছে পায়ে পায়ে মুছিয়া আলিপনা
বিদায় লোকজন, বিফল আনাগোনা।
এই ত শেষ ওগো এই ত সমাপন
হৃদয় খালি করে কাঁদায় প্রাণমন।
সহেনা প্রাণে ওগো আসিয়া চলে যাওয়া
পাওয়ার চেয়ে ভাল ছিল যে পথ চাওয়া।
এ যেন প্রভাতের মলিন রাকা শশী
সুখের চেয়ে এতে দুখ যে মাখা বেশী।

দ্বারাবতী

(নাটক) প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

(কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ শেষে ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাসাদ কক্ষে অর্জ্জুন)

অর্জ্জুন। মহাষ্টমী পূজা শেষ। সাঙ্গ বলিদান।
রক্ত মাখা খড়্গ লয়ে নৃত্য সমাপন।
ওই ধীরে, ধীরে, এলো শান্তির বিজয়া,
ধুয়ে দিতে রক্তধারা নয়নের নীরে।
ভল্লযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, আজি হবে হারা
প্রণয়ের আলিঙ্গনে। কোথা তারা? কোথা?—
কারে দিব আলিঙ্গন? পুত্র প্রাণাধিক,
ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়েরা আজ তারা কই?
বিয়োগান্তে নিদারুণ মহাকাব্য লিখি
বসি একা কাঁদে কবি! ফিরে'ছে ঋত্বিক
নরমেধ-যজ্ঞ শেষে, হোমের বহ্নিতে
দারুণ পিঙ্গল দেহ।
অনৃত মুখর
ওগো ইতিহাস, তুমি করিবে চিত্রিত
কত না বিচিত্র বর্ণে এ জীবন মম!
কলঙ্ক কালিমা লেপি হয় ত করিবে
বিদ্বেষের ব্যঙ্গছবি। হয়ত গড়িবে
হাস্য-উপহাস মাঝে, কুশ-পুত্তলিকা
মোর দহনের আগে দহিতে অনলে।
বুঝি জগতের কাছে, নর-হন্তা বলি
দিবে ঘৃণ্য পরিচয়। হয়ত হইবে
এ গাণ্ডীব, এই বর্ম্ম, কলঙ্ক নিশান
অরাতির যাদু-ঘরে। হয়ত বা পরে,

দূর দূর ভবিষ্যতে, অজ্ঞাত কারণে—
ফিরাবে করুণা আঁখি। নির্লজ্জ বেদনে
গাবে মহত্ত্বের গীত। হে চির চঞ্চল!
কলঙ্কিত চিতা পর, মর্ম্মর দেউল
তুলে দিবে দেশবাসী। করিবেক পূজা
ধর্ম্ম-সংস্থাপক, কিংবা মহাবীর বলি।
একমাত্র তুমি শুধু জানো অন্তর্যামী
নহি রাজ্য-শক্তি লোভী। করে'ছি সংগ্রাম
নিমিত্তের ভাগী হ'য়ে।

(দূরে শিবিরে গীত)

রণ-প্রত্যাগত ওই সৈনিকের গীতে
উঠে প্রাণ উদ্বেলিয়া।

(গীত)

তা'রাই শুধু আসবে না রে, তা'রাই শুধু আসবে না।
সেনানীর ওই মাথার খুলি,
হ'বে কোমল ধরার ধূলি,
সমর-ব্যূহের ব্যাপার জটিল
মোটেই সেথা পশবে না।
ওই পরিখা বুজবে জেনো,
জাগবে সেথা জাগবে তৃণ,
লক্ষ বুকের শোণিত টেনে
কিংশুকও কি হাসবে না।
তারাই শুধু আস্‌বে না রে, তা'রাই শুধু আস্‌বে না।
লুটলো যেথা ভীষ্ম দেহ
পারবেনাক বলতে কেহ—
কাল যে এসে কৃষক বেশে
লাঙ্গল দিয়ে চস্‌বে না।
ওই যেখানে সপ্তরথী
ফেললে কোরক পদ্ম মথি,
বল্‌লে কে ওই দারুণ ভূমি
হাস্য-আলোয় ভাসবে না।

তারাই শুধু আসবে না রে, তা'রাই শুধু আসবে না।
শোণিত যেথায় শোণিত লাগি
করলে কামান দাগা দাগি
হোথায় কি কেউ কুটির রচি
প্রিয়ায় ভালবাসবে না।
মন্ত্রণাগার ওই সে যেথা
রইত রণের চিত্র পাতা
অসম্ভ্রমে চলবে পথিক
শাস্ত্রী তারে শাস্‌বে না।
তারাই শুধু আসবে নারে তারাই শুধু আস্‌বে না

সত্য তা'রা আর হেথা আসবে না ফিরি'।
মোর কর্ণে বেজে উঠে সেই হ্রেষা ধ্বনি,
রথের ঘর্ঘর শব্দ, হস্তীর বৃংহন,
শঙ্খের অম্বুদনাদ কোদণ্ড টঙ্কার ;
চক্ষে মোর ভেসে উঠে সজ্জিত সুন্দর
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী, বর্মাবৃত হিয়া।
আজ তারা কোথা ?
(বাতায়ন পথে দৃষ্টি করিয়া)
দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ বেলা ম্লান হয়ে এলো
কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে রক্ত সন্ধ্যা আসি
করে দিল নভস্থল শোণিতে রঞ্জিত।
এমনই সে আসে যাবে যুগ যুগ ধরি।
সদ্য শোণিতের পরে, জমিবে মৃত্তিকা,
তার পর হবে তৃণ, পরে বৃক্ষ-রাজি ;
সহস্র বৎসর পরে, সেই রণভূমে
দাঁড়ায় পথিক যদি, হয়ত এমনই
হেরিবে এ রক্ত সন্ধ্যা। ভাবিবে সে মনে—
যুগান্তের রক্ত যেন ঘনীভূত হ'য়ে,
লাগিয়াছে সন্ধ্যাকাশে, হয়ত দু' ফোঁটা
নেত্র নীর ফেলে যাবে। হয়ত স্মরিবে

এই গাণ্ডীবীর কথা। প্রশংসা-নিন্দার
কত কথা কয়ে যা'বে। স্মরিবে কি কভু
অর্জ্জুনের তীব্র ব্যথা, এই অশ্রু ধার।

(শিবিরে গীত)

নয়ন ধারা পড়ছে ঝরে
তোমাদের ওই অস্থিতে।
লাগবে শিকড় দ্রাক্ষালতার
থাকবে বিপুল স্বস্তিতে।
বুকের শোণিত বিন্দু বিমল,
ফুটবে হয়ে রক্ত কমল
অমৃত হ্রদ করবে আমোদ
টুটবে না কাল হস্তীতে।
গেলে সুধার কলস পিয়ে
জীবন দিয়ে জীবন নিয়ে,
তোমরা পেলে শাশ্বতেরে
আমরা র'লাম অ-স্থিতে।

গাও গাও হে সৈনিক, সঙ্গীতের সুধা
দাও ঢালি চিতায় উপর, ভক্তিঅর্ঘ
দীনা ধরিত্রীর।

* * * * *

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকার উপকণ্ঠে

* * * * *

অর্জ্জুন। কোথায় দ্বারকানাথ? কোন ত্যক্তপুরে
চিতাময় জনপদে আনিলে সারথি?
নিশ্চয় ভুলেছ পথ।

দূত। দেব
দ্বারাবতী অন্ধকার। যদুকুল পতি
অন্তর্দ্ধান। অন্তর্হিত বীর বলদেব।
এ বিজন পুরী মাঝে আছে শুধু নারী!

আছে শিশু, বীর নাই। আর আছি আমি
শুনাতে নির্ম্মম কথা।

অর্জ্জুন। (স্বগত) হলনাক দেখা।
মনে পড়ে আজ শুধু সেই মুখখানি
ফুল্ল নীল অরবিন্দ, সেই ঘামে ভেজা
দীন সারথির বেশ। আজ আমি একা
একান্ত বান্ধব হীন। ও কি ও গম্ভীর,
সাগর গর্জ্জন আজি। নীল ঊর্ম্মি পরে
ভেসে আসে স্বর্ণ তরী, রয়েছে শয়ান
ওই সেই শ্যামতনু। কোথা স্বর্ণ তরী ?
ওযে রমণীর মূর্ত্তি, মেলি স্বর্ণ পাখা
সোহাগে আবরি নিল বীরে বক্ষে তার
শ্যামদ্যুতি। কি মধুর ও কি ও মিলন !
কোথা কই নারী মূর্ত্তি, ওযে হেমতনু
মোহন নাগর বর, চাঁচর চিকুর।
ও কি ও সন্ন্যাসী ওযে, পরণে কৌপীন
দণ্ড কমণ্ডলু হাতে ! কিন্তু সেই আঁখি,
সেই বিম্বাধর। বাজিছে মৃদঙ্গ
ওই উঠে হরিনাম। নাচে বিনোদিয়া
নাচে তরী, তারি সনে নাচে সিন্ধুনীর
উদ্দণ্ড নর্ত্তনে। ওই ভেসে গেল তরী,
ওই কনকের পাল দিনান্তে মিশায়,
এখনো যেতেছে দেখা, আমার সখার
ওই যেন হস্তের ইঙ্গিত।

তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বারকার পথ

(অর্জ্জুন দণ্ডায়মান)

অর্জ্জুন। আজ মোর মনে পড়ে এই পথ দিয়া
গেনু সুভদ্রায় লয়ে। বকুলের তলে

স্ফটিক-বেদিকা ওই যেথা সখা সনে
রমণীয় অপরাহ্ন মৌনতা মুখর
করেছি যাপন সুখে। ওই তরু শাখে
জাগে হিন্দোলার দাগ, শৈশবের স্মৃতি
প্রৌঢ়প্রাণে।

(সারথির প্রবেশ)

সারথি। সুসজ্জিত রথ আজি। পুর অঙ্গনারা
রয়েছে অপেক্ষিয়া। ত্যজি দ্বারাবতী
নগরীর উপকণ্ঠে হস্তিনার পথে—

অর্জ্জুন। হও অগ্রগামী। আমি মিলিব সত্বর।

(সারথির প্রস্থান)

চলুক নীরবে বিষাদের শোভাযাত্রা
সমাধির পুষ্পরাজি সযত্নে আহরি
লয়ে যাই ইন্দ্রপ্রস্থে। বিসর্জ্জন শেষে
প্রতিমার সাজ-সজ্জা ছিন্ন করি' ল'য়ে
শিশু যথা যায় ঘরে।
(সবিস্ময়ে) একি, একি!
ওই আসি সাগরোর্ম্মি ঘূর্ণিবায়ু সনে
অর্দ্ধেক গ্রাসিল পুরী! ওই ডুবে গেল
প্রলয়ের কালমেঘে শারদ চন্দ্রমা।
সাগরের অশ্রু রসাঞ্জনে গলে গেল
দ্বারাবতী। ডুবে গেল ওই সৌধ রাজি।
ডুবে গেল রঙ্গালয়, রাজ পান্থশালা।
বজ্রদৃঢ় দূর্গ শিরে ওই দিল হানা
স্ফীতবক্ষ মহার্ণব শঙ্খ বাজাইয়া।
কলাভবনেব পর প্রলয়ের তুলি
বুলাইল পারাবার। সঙ্গীত শালায়
সাগর সঙ্গীত জাগে। বিলাস-ভবনে
নৃত্য করে নক্র-তিমি। অন্তঃপুর মাঝে
শুক্তি পাতিয়াছে শয্যা। শুধু জেগে আছে

স্নিগ্ধ শুভ্র অমলিন মন্দিরের চূড়া—
ধর্ম্মের বিজয়-কেতু প্রলয়ের মাঝে।
সখার সে শ্যাম ভালে তিলকের মত
স্বেদার্দ্র সুন্দর।
বিদায় বিদায় সখা! পুনঃ দেখাইলে
এ নূতন বিশ্বরূপ! আর কি দেখাবে
প্রেমময়? কোন রূপে দেখা দিবে পুনঃ,
কোন ব্রজে পড়িয়াছে ডাক!

(গীত)

সময় হ'ল ডাক পড়েছে নদীয়ায়
ওই বাঁশরী শুনা যায়।
আজকে রাইয়ের চন্দ্রাননে,
পড়ছে মনে; পড়ছে মনে
পড়ছে মনে কুঞ্জবনে
ধরা তাহার দুটি পায়।
মনে যে আজ পড়ছে ভাল,
বর্ষা যখন ঘনিয়ে এলো
মেঘের ডাকে থির বিজলি
শ্যাম নীরদে মিশে যায়।
সুধাই হে শ্যাম কখন চুপে
ঢাকলে ও রূপ রাধার রূপে,
ডুবলো কালো কণক আলোয়
ডুবলো অসীম সুষমায়।
সময় হ'ল ডাক পড়েছে নদীয়ায়
ওই বাঁশরী শুনা যায়।

———

রজনীগন্ধা

রজনীগন্ধা

গন্ধ তোমার মধু শান্ত গভীর,
অন্ত না পায় খুঁজি সান্ধ্য সমীর।
        বক্ষ অতল তব,
        সিন্ধু ক্ষীরোদ নব,
মৌন প্রেয়সী তুমি মুগ্ধ কবির।
তব পরিমল পুরী উন্নত শির।
অন্দর মাঝে মহা উৎসব ভিড়।
        লাগে চেনা চেনা ওই,
        চিনিতে পারিনে কই,
পরিচিত আসে কাছে বেশে অতিথির।
কত কথা কয় তব চঞ্চল বাস,
কানে যায় আলাপে অস্ফুট ভাষ।
        কথাহীন শুধু সুর
        হিয়া করে ভরপুর
পরাণে গোপনে পাই প্রেমেরি আভাস।

তৃণ-কুসুম

অণুর বুকে আনন্দটীর মত
        ক্ষুদ্র কুসুম ফুটলি হেতা তুই ;
হাঁরে বাছা, বয়সটী তোর কত ?
        —তোর চেয়ে যে অনেক বড় যূঁই
তুই বুঝিরে ফুলের বাড়ীর ফুল,
        প্রবাল এবং পুঁতির দেশের পরী,
নীহারিকার সখের ছোট দুল
        প্রজাপতির হাতের কারিগড়ি।

ওই বুকেতে গন্ধ নিয়ে ফোটা।
করলি অবাক সাবাস তোরে মানি।
নীহার গায়েই পূর্ণিমাটা গোটা
কৌটা মাঝেই ভরলি পরীরাণী।
ক্ষুদ্র বলে দুঃখ ত তোর নাই
তুই যে কমল, পারিজাতের ভাই।

বাদলে

আজি দর দর জল ধারে
রয়ে রয়ে মনে পড়ে কারে।
আজি ফুল পরিমলে
বার বার নানা ছলে
কার কথা বলে বারে বারে।

২

আজি ঘন গহন মেঘে
কাল কার অঞ্জন লেগে
চাহে যূথী দুলে দুলে
উঠিতে কাহার চুলে
কার বুক চাহে ফুলহারে।

৩

আজি ম্লান ছল ছল দিনে
লাগে ফাঁকা একা তারে বিনে
যে ছিল গো সুখে দুখে
নিবিড় মিলন বুকে
সে কেন অতিথি আজি দ্বারে!

প্রাণের জাতি

প্রাণের ও হায় জাত আছে,
পাই পরিচয় দিন রাতি তার
কি মধুময় সাথ আছে।

কোথায় গৃহ কোন্ দেশে তার
দুই দিনেরি প্রবাসী,
এক নিমেষে হয় সে আপন
ধন্য আলাপ সাবাসি।
প্রাণ যে প্রাণের স্বর চেনে
নিত্য যাচাই গোত্র ও গাঁই
পাল্‌টি আপন ঘর চেনে।
অভিজ্ঞানের জ্ঞান কি তাদের
আলাপ তাদের সঙ্গীতে,
কিশোর আঁখির ইঙ্গিতে ও
পেলব তনুর ভঙ্গীতে।
নাইক তাদের নাই ধাঁধা
অন্ধকারে চন্দ্র চুমে
সুদূর বুকে যায় বাঁধা।
যুগ যুগেরি নিবিড় মিলন
বুঝতে নারে ভিন্‌লোকে,
তাদের শ্বাসেই সমীর উতল
অশ্রু গড়ায় তিন্‌লোকে।
হয় মধুময় নীরস ধরা
মধুর তাদের গুঞ্জনে,
পাতা পাতি সকল জাতি
মাতে পীযুষ ভুঞ্জনে।

কবির বুক

চোখের কাছে ঘুরছে কেন এত মলিন মুখ,
এত লোকের ঠাঁই কোথা গো ?—আমার ছোট বুক।
অফুট কলি কাঁদছে এসে
মোর পরশে ফুটবে কি সে ?
শুক্তি আসি বুকটি পাতি জানায় মোরে দুখ।

বিদ্ধ সায়ক বিহগগুলি অন্য দিকে চা,
আমায় কেন দেখাস তোদের ভগ্ন ডানা পা।
সুপ্ত চাহে উঠ্‌তে জাগি
ভাব কাঁদিছে মূর্ত্তি লাগি,
নয়নধারা আসছে নেমে উঠছে ঘেমে গা।

এইটুকু ঠাঁই, এক সাথেতে কতই নদী বয়
সরযূ আর গঙ্গা, রেবা সবার সমন্বয়।
সাগর সলিল অথির অতি,
গ্রাস করিছে দ্বারাবতী,
কালিন্দী তার শ্যামের লাগি করছে অনুনয়।

বসলো আমায় আঙ্গিনাতে ঘিরলো গৃহ কোণ,
দণ্ডক এবং পঞ্চবটী দ্বৈত অশোক বন।
দাঁড়ায়ে ওই আমার আগে
'দুর্ব্বাসা' .য পারণ মাগে,
পর্য্যুসিত শাকান্ন সার কোথায় নারায়ণ।

'সাঁজ পূজানি'র সঙ্গতি নাই একি তোমার কাজ?
রাজসূয়েরি ফর্দ্দ এনে করলে হাজির আজ।
আদেশ যদি পালতে হবে
দাও এ বুকে বল হে তবে
চরণ দিয়ে বরণ কর দয়াল রাজ রাজ।

দুঃখের রাজ্য

সেথা রবি উঠে না'ক পড়ে যায় বেলা রে।
হয় না'ক বেচা কেনা ভেঙ্গে যায় মেলা রে।
সেথা শুধু কাঁদে সীতা,
জ্বলে সতী, জ্বলে চিতা
গাঙ্গুরের নীরে ভাসে বেহুলার ভেলারে।

সেথা ধায় আঁখি-নীর গিরি শির গলায়ে
সেথা যায় ভুখারীর পোড়া শোল পলায়ে
সেথা উঠে হা হা বাণী,
শশ্মানেতে রাজা রাণী,
সেথা শুধু উৎসব নব চিতা জ্বালায়ে।

সেথা জাগে দুর্ব্বাসা কপিলের সহিতে
অভিশাপ কহিতে ও কোপানলে দহিতে।
সেথা ভেঁা ভেঁা বাজে শিঙ্গা
ডোবে মাঝি ডোবে ডিঙ্গা
সেথা গেলে অঙ্গুরী তীর্থের রোহিতে।

তবু সুরধুনী এলো সে দেশের লাগিরে
চীর পরি' যুবরাজ তারি অনুরাগী রে
সেথা থামে আনা গোনা
তরী সেও হয় সোণা,
পাষাণও মানবী হয়ে কথা কয় জাগি রে।

তারি লাগি বারে বারে হয় তাঁরে আসিতে
নাশিতে শাসিতে অরি তারে ভালবাসিতে
শুধু তারি আঁখি জল
যমুনায় আনে ঢল,
সেই দেয় নব সুর কৃষ্ণের বাঁশীতে।

কৈশোর

সেথা সোণালী ও রাঙ্গা রাঙ্গা কচি কিশলয়,
সেথা অবুঝের সবুজের নব অভিনয়।
সেথা গুল্ বুল্বুল্
করে পয় পয় ভুল ;
দোলে তুলতুলে ঢুলঢুলে বন ফুলচয়।

২

সেথা লালিমায় টুকটুকে অধরের লাল
সেথা আলোকের চুমা চায় গোলাপের গাল।
সেথা পাপিয়ার স্বর
ঢালে সুধা ভরপুর
সেথা ফেলে চুপ, অপরূপ রূপ শরজাল।

৩

সেথা কমলের পুরে বাজে প্রণয়ের বীণ,
সেথা আবছায়ে পরীদের নাচ্ রাত দিন।
জাগে উৎসব রব,
সেথা উদ্দাম সব,
সেই পুলকের অলকাতে সকলি নবীন।

৪

সেথা ফুলধনু ধনু লয়ে সঙ্কোচে ধায়
সেথা উমা-মুখ-শশী পানে সদাশিব চায়।
সেথা হাসে বধূবর
নাচে কিন্নরী নর
দেখে দেবতারা আসি হাসি গগনের গায়।
সেথা বাসেরি আভাস দেয় মঞ্জরীতে
নহে বীতরাগ অলিকুল গুঞ্জরিতে।
সেথা অঞ্চলালোক
করে চঞ্চল চোখ
ছোটে রামধনু আঁকা পথে সঞ্চরিতে।

ক্ষুর সৎ

নাইক সময় নাইক রে ভাই ঠুনকো মালের কারবারে,
গড় হাজিরই হর ঘড়ি হই রাজ রাজাদের দরবারে।
আম মুকুলের ঘ্রাণটুকু,
ক্ষুদ্র ফুলের দানটুকু,
রঙিন পাতায় ঝিল্‌মিলি ভাই তর সহেনা একবারে।

২

ভাবছি যখন যাই চলে যাই রাত্‌টা কেবল ভোর করে,
আট্‌কিয়ে পথ এমনি বিপদ মেঘ জমে ভাই ঘোর করে।
মৌমাছি সব গুঞ্জরে,
অলকলতা মুঞ্জরে,
আল্‌গা পেলেই পাগলা হাওয়া হাত টানে হায় জোর করে।

৩

কাল বয়ে যায়, জাল বয়ে যায় ক্ষীরের কড়ার আঁচ লাগে,
ফাত্‌না ডুবায় মাছ লাগে হায়, চিল ঘুড়িটায় প্যাঁচ লাগে
রসের হাতায় 'তার' বাঁধে,
হাঁসগুলা সব সার বাঁধে,
লগ্ন আমার যায় বয়ে যায় বা'র না হতেই সাঁজ লাগে।

৪

তোমরা যখন যাও চলে যাও দুই পাশে যাও ডাক দিয়ে
বেজায় তখন কাজের সময় কাজ যে দাঁড়ায় থাক্‌ দিয়ে।
নলিন আঁখির জল গুলি,
ব্যথিত মরমতল গুলি,
কাতর চোখে পিছন ডাকে হৃদ্‌ কবাটের ফাঁক দিয়ে।

হা' ঘরেদের ভোজ

আজকে বড়ই ব্যস্ত আছি সবে
করতে হবে নানান্‌ আয়োজন
হা' ঘরদের ভোজন হেতায় হবে
করতে গেছে সাদর নিমন্ত্রণ।

২

উড়ন্ত ওই পক্ষীদিগে ডাকি
দেখিয়ে দেব কেমন মোদের বাসা
ক্ষণের হেতায় শ্যামল ছায়ে রাখি
জানিয়ে দেব গৃহীর ভালবাসা।'

৩

চলন্ত ওই সজীব পোতের গায়ে
বসিয়ে দেব বন্দরেরি ছাপ
নিরুদ্দেশের কপোতদেরি পায়ে
ঘুঙুর দেব নাইক তাতে পাপ।

৪

আজকে মোরা চঞ্চলেরে টানি
মাখিয়ে দেব অঞ্চলেরি ফাগ
অলক্ষীর ওই যজ্ঞ তুরগ আনি
বসিয়ে দেব জয় পত্রের দাগ।

৫

হয়ত ওসব ভবঘুরের মনে
জাগতে পারে এই সে দিনের স্মৃতি,
হয়ত তাদের শ্রান্তি দুখের ক্ষণে
স্মরবে পরাণ ওই বাসাটীর প্রীতি।

৬

ঘরের সাথে হা'ঘরেদের চেনা
আজকে মোরা দেবই দেব করে,
অকুলেরে কুলের কাছে আনা
চেষ্টা মোদের সারা জীবন ধরে।

ধূমকেতু

প্রস্থান প্রবেশেতে চির নব ঢঙ
সংসার যাত্রায় আসমানী সঙ।
কোথা হতে কোথা যাও
বিশ্ব চমকি দাও
কাইজার, নেপোলিয়াঁ তৈমুর লঙ।

২

চঞ্চল চিনিনা ক বাসা কতদূর
দেখি যবে শান্তিতে ধরা ভরপুরে।

বহে বায়ু ঝির ঝির
বাজে সেতারের মিড়
তুমি ধর সপ্তমে বাজ খাঁই সুর।

৩

এসো তুমি কুঞ্জেতে পরি রণসাজ
শার্দূল বিক্রীড়িত ত্রিষ্টুভ মাঝ
আসি কর প্রশ্ন হে
ভর হৃদি বিস্ময়ে
গৃহ দ্বারে দুর্ব্বাসা ঋষিকুল রাজ

৪

উন্মনা পলাতক অদ্ভুত লোক
বিশ্বের পানে মেলো বিদ্বেষ চোক্
বন্ধন বাধাহীন,
ব্যোমবাসী বেদুইন,
অনাদি কবির কৃত উদ্ভট শ্লোক

কালের ভাণ্ডার

ধরণীর বহুদিন হারা দিনগুলি সুবিশাল ভাণ্ডার ঘরে,
সখি তার গৃহদ্বার দেখাইল খুলি সজ্জিত আছে থরে থরে।
কোনোটী গোমেদ লাল, কোনটী বা নীলা, কোনটি প্রবাল পোখরাজ,
কোনটী বিদূর, হীরা, মণিময় শিলা, বুকে কারো সোনালীর কাজ।
ভিতর গভীর লাল হীরা তুলে ধরি দেখি এক ভীম রণভূমি,
শোণিতের ঢেউ ছোটে দুই কুল ভরি আকাশ পাতাল সব চুমি।
পীত বসনের দ্যুতি নবঘনে মিশি কি ভীষণ কান্ত মনোহর,
'এটি কুরুক্ষেত্র দিন' সখি বলে হাসি ভক্তি ভরে কাঁপি থর থর।
দলিত অঞ্জন সম শিলা তুলি করে বলে 'দেখ প্রভাসের দিন',
আঁধারি ধরণী যবে আহা চিরতরে কৃষ্ণে কৃষ্ণ হয়ে গেল লীন।

শুভ্র এক স্নিগ্ধ দিন কিবা তার শোভা মুকুতার মত ঢল ঢল,
কবিতার জন্মদিন বড় মনোলোভা বাল্মীকির নয়নের জল।

দেখ আষাঢ়ের কিবা প্রথম সেদিন উঠিয়াছে ঢুলঢুলে মেঘ
হের তপোবন-বালা আভরণ-হীন, মধুপের ব্যাকুলিত বেগ।
দেখিতে দেখিতে মোর চোখে গেল পড়ে আমারি হারানো একদিন,
অতি ছোট টুকটুকে লাজে আছে স'রে দেখে যেন লাগিল নবীন।
হাসিয়া কহিনু তারে—"রে সুন্দর দিন, তুই এসে রয়েছিস্ হেথা,
বুকে লয়ে আজও কাঁদি তোর স্মৃতি ক্ষীণ, ধরা মাঝে খুঁজে পাব কোথা ?
ওরে সখি হারাবে কি ? সব জমা আছে, তবে আর বল কিবা ভয় ?
গোলাপী সে দিনগুলি না থাকুক কাছে দূরে যে অমর হয়ে রয়।"

পবিত্র প্রশস্তি

কলুষকে হায় করছে পূজা ধরছে বুকে অহিকে,
পারত্রিকে ত্যাগ করিয়া সার করেছে ঐহিকে।
যায় যে ধরা মলিন হয়ে অবিশ্বাসের ধোঁয়াতে,
নাইক দ্বিধা এ শির সিধা প্রেতের পায়ে নোয়াতে।
চমকপ্রদ বর্ব্বরতা দিচ্ছে নয়ন ঝলসি,
বর্ণচোরা বিষ বহিছে অমৃতের ওই কলসী।
আগচ্ছ পুণ্ডরিকাক্ষ পাবনকারী হে মিত্র,
পরাণ দেহে ভাষায় ভাবে কর সবায় পবিত্র।

২

স্বেচ্ছাচারের রাক্ষসী আজ বসছে দেবীর আসনে
অগ্রাহ্য, অস্পৃশ্য, হেয় উঠছে পূজার বাসনে।
ছেদন কর রঙিন কচু, রোপন কর করবী
রক্ত মেধের গন্ধ নাশি জাগাও ধূপের সুরভি।
সতীরে তার সতীত্ব দাও, সাধুকে দাও সাধুতা,
প্রেমকে কর সুনির্মলও ফিরাও স্বরগ স্বাদুতা,
ভণ্ডে কর লণ্ডভণ্ড জাগাও সবে হে মিত্র
পরাণ দেহে ভাষায় ভাবে কর সবায় পবিত্র।

৩

স্বর্গ হ'তে গঙ্গা আনো ধোয়াও তুমি চিতাকে
পাঞ্চজন্য কম্বু রবে জাগাও নবীন গীতাকে।

কল্যাণহীন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কর পলকে,
দগ্ধ কর মত্ত মদন নেত্র অলক ঝলকে।
উদ্ধারো হে দৈবকীরে কংসাস্থরে বধিয়া
প্লাবনকারী প্রেমের বানে ডুবাও পুন নদীয়া ?
আগচ্ছ পুণ্ডরিকাক্ষ পাবনকারী হে মিত্র
পরাণ দেহে ভাষায় ভাবে কর সবায় পবিত্র।

ফাটলের ফুল

পাযাণ চেয়ে পাষাণ প্রাচীর তাহার কঠিন গাত্রে,
কেমন করে ফুল ফোটালে একটী বাদল রাত্রে।
একটি নিশির শব সাধনে এমন মহাসিদ্ধি
রূপ সাগরের প্রবাল দ্বীপের এমনি কি হয় বৃদ্ধি ?
রুদ্র নভে করলে কে এই রামধনুকের সৃষ্টি,
তীব্র শোকের উগ্র বুকে এ কার সুধা দৃষ্টি !
আনলে কে এই ভাবের জোয়ার এমন নীরস গদ্যে,
'নূর জাহানের' জন্ম এযে উষর মরুর মধ্যে।

শিশু রাজ্য

সেখানে আকাশ রাঙ্গা রাঙ্গা রবি ওঠেনি
কমলেরা চোক মাজে এখনও ফোটেনি,
ডাক শেখে শাবকেরা বসি নিজ কুলায়ে
বহে শিশু সমীরণ লতিকারে দুলায়ে।

২

কথা সেথা ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা রাঙ্গা অধরে,
প্রাচীরের বাধা নাই অন্দরে সদরে।
সুর ফাঁক সঙ্গীতে হার মানে বাঁশরী
তালহীন নৃত্যেতে তন্ময় আসরই।

৩

সাজ সেথা নগ্নতা, কাজ সেথা অকাজে।
তারি সনে বাধে রণ প্রিয়তম সখা যে,

হাস্তেতে যত শোভা, তত শোভা রোদনে,
বিজয়ায় যত ধূম, তত ধূম বোধনে।

৪

রূপ সেথা সেধে পরে কুরূপের ভূষাকে,
কুহেলিতে ঢেকে রাখে শরতের উষাকে।
সেই দেশে গজ গেলে শতদল-বাসিনী
আজও সেথা কমলার, পেচকেরা আসেনি।

৫

নবনীর অবনী সে লাবনীর খনি গো,
উঠে ব্রজ রাখালের নূপুরের ধ্বনি গো।
ফুটে সেথা গোলাপের কচি মুখ হসিত
জাগে সদা যশোদার আঁখিযুগ তৃষিত।

৬

ক্ষীর সেথা শ্রবি পড়ে শ্যামলীর বাঁটেতে,
বিনা দরে কেনা বেচা সোহাগের হাটেতে।
মরালেরা ঘোরে সেথা, বীণা সাধে ভারতী,
ভূলোক দ্যুলোক করে পুলকের আরতি।

পুরাণো চিঠির ফাইল

এটা বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি মুছে গেছে আঁখরগুলা যত,
রঙটি রাঙা তেমনি আছে লেগে অতীত বিয়ের পাক্ চূর্ণারি মত।

২

এ যে বড়ই গরম গোছের চিঠি চেয়েছে কার সাতাশ টাকা বাকি
কাট্ ঠোক্‌রা কোথায় গেছে উড়ি নীরস শাখায় ঠোকর কটা রাখি।

৩

এখান যে হায় আনন্দেরি লিপি পরীক্ষাতে প্রথম পাশের খবর
লাভের চেয়ে আনন্দটাই বেশী কাঁকুর চেয়ে বীজটা তাহার জবর।

৪

এ কি এ এক আদালতের শমন মুড়কি সাথে বোলতা কেন হেরি
সাপ গিয়েছে খোলসখানা রাখি ফুলে এ ছুঁচ মিশলো কেমন করি।

৫

এ চিঠিটা লিখছে বাড়ীর ছেলে ইষ্টাসিনে পাঠিয়ে দিতে গাড়ী
ছেলের এখন বহুত ছেলেপুলে ঠাকুরদাদা চিনতে তাঁরে পারি।

৬

এখানা এক ঔষধেরি লিপি আসতেছে এক ঔষধালয় হতে
কাল করেছে পাঁচটি টাকা ভি পি অনুরোধটা শীঘ্র সেটায় নিতে।

৭

এখানা এক আত্মীয়েরি চিঠি চেয়েছে হায় ত্রিশটি টাকা ধার
দেখছি তাহার শীর্ণ হাতের পাতা পাওয়ার কোনো খবর নাহি আর।

৮

কোনটি ছেঁড়া শোকের খবর এটি অতীত ভোলা সুদূর বুকের ব্যথা,
ছেলের গলায় সোণার হারের সাথে কেন রে এই বাঘের নখর গাঁথা ?

তৈজসের ইতিহাস

এই থালাখান দাদুর বিয়ের দানের সময় পাওয়া,
ওর উপরই কর্ত্তা-মায়ের বিশেষ ছিল দাওয়া,
পড়লে কারো হাত হ'তে ও, সইত নাকো তাঁর,
তোরঙ খুলে তুলতে যেতেন দিনে শতেকবার।

২

গয়াধামের গয়েশ্বরী, বৃন্দাবনের বাটি
পয়মন্ত জিনিষ বড়, যায়নি আজও ফাটি ;
লক্ষ্মীছাড়া গামলাখানা, ডাল ঢালা হয় যাতে,
এসেছিল ভাগ্যহীনা খুড়ী-মায়ের সাথে'

৩

বাঁটলোটিতে দাদুর মায়ের সাধের পায়স রাঁধা,
দুষ্টু রাখাল লুকিয়ে নিয়ে পরকে দিলে বাঁধা,
হয় যে বাবার অন্নপ্রাশন ধুম ধামেরি সাথ,
এই বগিথাল এতেই বাবা প্রথম খেলেন ভাত।

৪

বোগ্‌নোটি ওই—বেশ যে মনে পড়ছে আজি মোর-
চৌধুরীদের মধ্যমেরি বিয়ের বিলানোর।
তৈল ভরা বোগনো আহা মোণ্ডা—ভরা ঠোলা,
অনেকদিনের কথাই বটে, যায়না তবু ভোলা।

৫

তুবড়ে-যাওয়া দাগ-ধরা ঐ গঙ্গাজলী ঘড়া
মায়ের হাতে পড়লো কুয়োয় টানতে গিয়ে দড়া।
তখন তিনি দশ বছরের ন-বসতের কনে,
কেঁদেছিলেন কুয়োর ধারে মহাপ্রমাদ গনে।

৬

ছক্‌কাটা ওই পানের বাটা ফুলশয্যার দান,
বাবার বাবার ঠাকুরমা সে সাজতো ওতেই পান।
খাগড়ায়ে ও পানের ডিবে, ময়লা ধূলা ঢাকা,
দেখলে চোখে জল যে আসে কাকার স্মৃতি মাখা।

৭

প্রকাণ্ড ঐ পুষ্পপাত্র বার করিতে মানা
এই ভিটারই বাস্তুযাগের জন্যে প্রথম আনা।
মুখ-আঁটা যে কমণ্ডলু যত্নে দিলাম রেখে,
আনেন সেটি জেঠাইমা যে বদ্রী-নারাণ থেকে।

৮

ঘরের প্রতি তৈজসেতে, রাঙ ঝালেরই ওর
লেগেই আছে কতই শত উৎসবের-ই জোড়,
কাঁসারী চায় বদলে নিতে আসছে প্রতি মাস
গৃহস্থালীর তাম্রলিপি, স্নিগ্ধ ইতিহাস॥

গ্রীষ্মের ভেট

মর্ত্তমান রম্ভা এনো বঙ্কিমের উপন্যাস দেবে ভোগে দুই দিকে লাগে,
হিঙ্গুল কমলা এনো রবীন্দ্রের কাব্য সুধা অম্ল মিঠা যার যথা ভাগে।
এনো যেন পাণিফল গ্রীষ্মে বড় স্নিগ্ধকর অমৃতের নক্সা মনোহর,
আনিয়ো সরল ইক্ষু দ্বিজেন্দ্রের নাট্যগীতি মণ্ডা আর ডাণ্ডা একত্তর।
এনো ভাল খরমুজ গন্ধ তার বড় মিঠা শরতের উপন্যাস সম,
এনো কালো তরমুজ ভিতর গভীর লালদেবেন্দ্রের কাব্য অনুপম।
এনো কচি কচি আম বাউল খেপার গীতি পেতে প্রাণ আনচান করে,
এনো নেয়াপাতি ডাব রামপ্রসাদের গান বুক দেয় সুধারসে ভরে।
বাণীর কলসী করে এনো সুরধুনী নীর সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন,
পরাণ জুড়ানো আহা বৈষ্ণবের পদাবলী তুলসী দাসের রামায়ণ।

নিষ্ক্রমণ

নীড় বলিছে 'ওরে আমার পাখি
ওরে আমার গোপন বুকের ধন
আজকে ফিরিস সুনীল নভে ডাকি
বারেক এসে আমার কথা শোন।'
বিহগ বলে 'মাগো আমার মা
তোমার কোলে এখন যাব না।
তোমার গভীর স্নেহের মধুর দান
বিশ্ববাসী আজকে করুক পান
যতক্ষণ এ কণ্ঠে আছে শিস
মাগো আমার বিলাইতেই দিস্।'

২

ভূধর বলে 'নদী আমার নদী,
আমার কোলে আয়রে ফিরে আয়,
শ্রান্ত যে তুই, ছুটিস নিরবধি,
ক্লান্ত দেহ বিশ্রামই ত চায়।'
কয় তটিনী 'পিতা আমার পিতা'
নিভিয়ে যাই চোখের জলে চিতা

আনন্দকে পরিবেশন করি
তৃষ্ণাতুরের শ্রান্তিটুকু হরি।
পাষাণ পিতার বুকের সুধারাশি
পান করাতে বড়ই ভালবাসি।'

২

বলেন কবি 'ওরে আমার গীত
ওরে আমায় বিজন ঘরের সুখ
নিস্‌নে খবর, দেখছি যে তোর জিৎ
ছড়াস্‌ সুধা নিংড়ে নিয়ে দুখ।'
গীত বলিছে 'সাথী আমার সাথী
কষ্টে দুখে কাট্‌তো দোঁহার রাতি।
সত্য হলো ভাবতে যাহা ভুল,
আমি তোমার নয়ন জলের ফুল।
নিত্য আমি তোমার খবর নিই,
তোমার ব্যথা সবার করে দিই।'

নূপুর

শুভা

সরলা বালিকা শুভা নাম তার ভিখারিনী মার সনে,
কাশীর প্রান্তে পর্ণ কুটিরে যাপে দিন নিরজনে ;
প্রতিদিন প্রাতে ভিক্ষায় যায় নয় বছরের মেয়ে
লোকে দান করে গঙ্গার ঘাটে, দেখে বালা চেয়ে চেয়ে।
মনে হয় তারও করিবারে দান কি করিবে দান খেপী
ভাবিয়া না পায় ভাবে কত দিন প্রহর রজনী ব্যাপী।
বহু দিন পর এক শুভ দিনে দ্বিগুণ চাউল পেয়ে,
মুখ ভরা হাসি জননীর কাছে কুটিরে আসিল ধেয়ে।
জননী তাহার আছিল পীড়িত দারুণ বেদন শিরে।
নিজে আজ শুভা করি রন্ধন খাওয়াইল জননীরে।
না করি আহার অবোধ বালিকা সরা ভরা ভাত লয়ে
মাতারে লুকায়ে বাহিরিল পথে পুলকে অধীর হয়ে।
আজি কাশীধামে মহা উৎসব বরদার মহারাণী,
দিয়াছেন আসি অন্নসত্র, ছুটিছে অযুত প্রাণী।
অতিথি ভিখারী কত সারি সারি রাজপথে চলে যায়
শুভার আহা সে সরা ভরা ভাত কেহ নাহি ল'তে চায়।
ভ্রমি পথে পথে ভাতগুলি তার কেহ লইল না দেখি
মনো দুখে বালা ভাবিতে লাগিল ম্লান অবনত মুখী।
ভিখারিনী বলে আমার নিকটে কেহ পাতিল না হাত,
দিতে এসে কিগো ফিরে নিয়ে যাব মোর এক সরা ভাত।
ফিরিল বালিকা বিষাদিত মনে আসি কুটিরের কাছে
দেখিল দুয়ারে ভিখারী জনেক ম্রিয়মান বসে আছে।
বলিল ভিখারী—'আছি উপবাসী দাও দাও কৃপা ক'রে
মোর হাতে তুলি এই ভাতগুলি অন্নপূর্ণা মোরে।'
বালিকার আহা ধরে না পুলক হাসি হাসি কহে কথা
'হ্যাঁগা এত লোক গিয়াছে যেখানে তুমি যাও নাই সেথা ?

শুনিলাম পথে কত সন্দেশ পরমান্ন যে কত,
খেতেছে নিয়ত অন্নসত্রে আজি লোক শত শত।'
বুড়া বলে 'ওগো সব যেথা যায় আমি ভিড়ে নাহি যাই
সকলেই পায় তাহাদের কাছে আমি কিছু নাহি পাই।
হইয়াছি বুড়া না টানিলে কেহ যাইব কেমন করে,
পথ ভুলে এই পথে ব'সে আছি দাও ভাতগুলি মোরে।'
উল্লাসে বালা কম্পিত করে সরা আনি ধীরি ধীরি
নামাইয়া দিল বৃদ্ধের হাতে বুড়া বলে' হরি হরি।
এমন অন্ন পাইনি কখনো ঘুরিয়া হয়েছি সারা
আমারে কে আর দিবে গো অন্ন অন্নপূর্ণা ছাড়া।
চ'লে গেল বুড়া বালিকা দেখিল হইয়াছে দেরী পথে
বকিবে জননী এই ভয়ে ধীরে ফিরে গেল কুটিরেতে।
আট কড় কড়ে ভাতগুলি খেয়ে যে সুখ লভিল আসি.
ইন্দিরা কভু লভেনি সে সুখ ভুঞ্জিয়া সুধা রাশি।
দেব মন্দিরে পর দিন প্রাতে দেবতার অতি কাছে
পরিচারকেরা 'জুঠা' সরা এক দেখিল পড়িয়া আছে।
প্রধান পাণ্ডা প্রভাত স্বপনে দেখিছেন পাতি হাত
বিশ্বেশ্বর বালিকার কাছে লইছেন মাগি ভাত।
স্নান করি প্রাতে মন্দিরে আসি শুনি এই বিবরণ,
দরদর ধারে অশ্রু গড়ায় বিস্মিত হয়ে র'ন।
ফোঁটা ফোঁটা জল মুকুতার মত পড়ে দুগণ্ড বাহি,
বলে বম্ বম্ বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা মায়ি।
এসেছেন শুভা প্রণমিতে দেবে তারে নিজ কোলে টানি,
বলেন পাণ্ডা স্বপনে দেখেছি এই সেই মুখখানি।
হে ভিখারী শিব ভকত বাঞ্ছা মন্দিরে রাখি সরা
এতদিন পরে হাতে হাতে প্রভু আজিকে পড়িলে ধরা।

ব্রজদাস

কালাপাহাড়ের কাল অভিযানে আজি ব্রজপুর ধ্বস্ত,
দেবতা ফেলিয়া পাণ্ডার দল ছুটিয়া পলায় ত্রস্ত।

সারা ব্রজধামে দীন ব্রজদাস
মন্দিরে একা করিতেছে বাস,
দেবতা সমুখে বসিয়া রয়েছে কুসুমাঞ্জলি হস্ত।

২

দেব মন্দির সুরভিত আজি ভুরু ভুরু ধূপ গন্ধে।
প্রভাত আরতি করি ব্রজদাস প্রাণ ভরি পদ বন্দে।
ভক্ত আজিকে একিরে বিভল
টস্ টস্ করি পড়ে আঁখি জল,
তৃষিত ভ্রমর পান করে যেন শ্রীমুখের মকরন্দে।

৩

সাজায়ে সাজায়ে খেদ নাহি মিটে আবার সাজায় ভক্ত
শিশুকাল হ'তে রাধারমণের সে যে চির অনুরক্ত
হাতের বাঁশিটি করি দেয় বাঁকা
হেলাইয়া দেয় ময়ূরের পাখা,
বাঞ্ছিত চির চরণে বুলায় করবীপরাগালক্ত।

৪

অঙ্গনে ঐ ঢুকিল সৈন্য করেতে কঙ্কাল দণ্ড
উপাড়ি ফেলিছে তুলসীর মূল করিছে লণ্ড ভণ্ড।
পূজায় মগন ধীর ব্রজদাস
বুঝিনে বহে না বহে নিশ্বাস,
প্রেম আঁখিনীরে ভাসিয়া যেতেছে পাণ্ডু যুগল গণ্ড।

৫

মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়ে পাহাড় হাঁকিয়া বলিল তূর্ণ
বুকেতে তাহার ভীম বিদ্বেষ নয়ন রোষেতে পূর্ণ।
চাহিয়া বারেক ব্রজদাস পানে
বলিল মির্জ্জা রহ এইখানে
পূজাশেষে এই পাষাণ ছবিটা পদাঘাতে ক'রো চূর্ণ।

৬

প্রহরের পর প্রহর কাটিল হয় না যে পূজা ভঙ্গ,
সাধক আজিকে লভিয়াছে বুঝি চির আরাধ্য সঙ্গ

চাহিয়া চাহিয়া দেখি সেনাপতি
মনে মনে হায় করিল যে নতি,
পরাণে তাহার কি ব্যথা জাগিল পুলকিত হল অঙ্গ।

৭

ফিরিয়া আসিল সে কালাপাহাড় সাথে সেই সেনাবর্গ,
রোষ কষায়িত নয়ন সাগর করেতে তুলিছে খড়্গ।
দেখি পূজারিরে স্থির নিশ্চল
কঠোর নয়ন হল ছল ছল,
বুঝিল ভক্ত জীবন তাহার দেবেরে দিয়েছে অর্ঘ্য

৮

মির্জ্জার পানে চাহিয়া দেখিল সেও সে সংজ্ঞা শূন্য
কালাপাহাড়ের পাষাণ-হৃদয় বারেক হইল ক্ষুন্ন।
বলে বিচিত্র চিত্র যে হেতা
চিনিতে নারিনু কোনটি দেবতা
বুঝিতে পারিনে দেবতা নরের কাহার অধিক পুণ্য !

৯

আমি ত জানিনে দেবতা কোথাও রক্ষা ক'রেছে ভক্তে
ভক্ত দেবেরে অমর ক'রেছে আপন বক্ষ রক্তে।
এসেছে দেবতা আজি মন্দিরে
যেতেছি ফিরিয়া পদ বন্দি রে
সাধু মির্জ্জারে চল লয়ে চল শোয়াইয়া হেম তক্তে

অগ্রদানীর ছেলে

চুন-বালি-খসা কঙ্কালসার জঞ্জাল.ভরা বাড়ী,
ঘন জঙ্গলে ঘেরা চারিধার, দেখিলে চিনিতে পারি।
সর্বদা তার রুদ্ধ দুয়ার, কেহ নাই মনে হয়—
দেয় ধূম আর ক্ষীণ আলোটুকু বসতির পরিচয়,
বালক পুত্র লয়ে হোতা থাকে কৃপণ অগ্রদানী
পত্নী তাহার দু'বছর আগে ধরা ত্যজিয়াছে জানি।
এমনি পাষাণ যখন তখন চলে যায় কাজ পেলে,
বিজন কুটীরে দশ বছরের ছেলেকে একাকী ফেলে।

স্নিগ্ধকান্তি ছেলেটি তাহার স্নেহ-মমতায় মাখা—
যেন লৌহের স্তম্ভের গায় কনক-কুসুম আঁকা।
পুত্র এমনি পিতার বাধ্য যাবে না বাহিরে আর—
রহে জীবন্ত মণি-মরকত রুধি' ভাণ্ডার-দ্বার।

২

পিতা চলে গেলে একাকী বালক দেখে আনমনে বসি',
গাছে থলো থলো আমগুলি যেন পড়িবারে চায় খসি'।
দেখে গাছ ভরে ফলিয়া রয়েছে শ্যাম নারিকেল-কাঁদি,
স্নেহের সলিল তৃষিতের লাগি' রাখিয়াছে যেন বাঁধি,
অশ্বত্থ গাছে নব কিশলয়—অরুণাভ কচিপাতা,
কবে ছায়া দান করিতে পারিবে তারি লাগি' ব্যাকুলতা।
দেখিয়া দেখিয়া ভরে উঠে আহা ছোট বালকের বুক,
ভাবে মনে মনে অজ্ঞাতে যেন—দানের কতই সুখ।
সন্ধ্যায় পিতা ডাকে নাম ধরি, যেমন দুয়ারে আসি'—
ত্বরিতে বালক খুলি দেয় দ্বার মুখেতে ধরে না হাসি।
পরদিন গৃহে রাখি তনয়েরে পিতা চলে যায় প্রাতে,
বৎসর যেন সুখস্মৃতি রাখে পুরানো পাঁজির পাতে।

৩

বালক বিকালে চেয়ে চেয়ে দেখে সুনীল আকাশখান,
দেখে সে কেমন মুমূর্ষু রবি করে হিরণ্য দান।
সন্ধ্যায় দেখে ধনী সুধাকর রজতে ডুবায় ধরা,
দেখে নীরদের দানসাগরেতে কতই বিনয় ভরা।
দেখিয়া দেখিয়া কী এক ব্যথায়, ভরে উঠে তার বুক,
ভাবে মনে মনে লওয়া চেয়ে হায় দেওয়ায় বৃহৎ সুখ।
বহুদিন পর কৃপণ জনক মরণ আগত স্মরি,—
শিয়রের কাছে ডাকিয়া তনয়ে বলিল সোহাগ করি,
সত্যই বাছা দানে বহুসুখ—তব করে আজি তাই—
যুগ সঞ্চিত বিপুল অর্থ আজ আমি দিয়ে যাই।
এত কৃপণতা এত হে কষ্ট সকলি সফল লাগে—
তব চাঁদ মুখ হয় নাকো ম্লান যেন দারিদ্র্য-দাগে।

৪

পিতার বিয়োগে অমিত অর্থ আসিল যুবার করে,
নিরজনে তারে প্রকৃতি গড়েছে ঘন অনুরাগ ভরে।
সে বছর হল অন্ন-অভাব—এ সারা বাংলা জুড়ি'—
আহার অভাবে পলে পলে মরে ছেলে মেয়ে বুড়া বুড়ী।
অনশন-ক্ষীণ তনয়ের মুখ চাহিয়া মরিল মাতা,
বড় বড় হায় জমিদার-ঘরে দু'বেলা পড়ে না পাতা।
তখন দয়ালু, স্বভাব দুলাল—অগ্রদানীর ছেলে—
দুহাতে তাহার ভাণ্ডার দিল গরিবের তরে ঢেলে।
খুলি' দিল শত অন্নসত্র—প্রচুর পান্থশালা,
আপনি খাইল গরিবের সনে একসাথে পাতি থালা;
কষ্টার্জিত অর্থ পিতার দীন হীনে দিল বাঁটি'—
চতুর যাহারা বলিল, এ বেটা একেবারে হল মাটি।

৫

শুনি' সংবাদ নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়—
চাহিলেন ডাকি' উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিতে তায়।
নিষেধ করিল বিনয়ে যুবক জুড়িয়া যুগল পাণি—
পরের দানেতে আমরা পালিত পতিত অগ্রদানী।
আমরা নিলাম সমাজের দান, জানি তা সবার আগে
সার্থক হবে—আজি যদি তাহা ভুখারীর কাজে লাগে।
আসন হইতে নামিয়া তখন কোলাকুলি করি' রাজা,
বলেন, জীবন ধন্য আমার—সার্থক তুমি প্রজা।
চৌদ্দ পুরুষ আগে দান লয়ে পতিত যদিই হ'লে
ব্রাহ্মণ চেয়ে ব্রাহ্মণ তুমি আজি এ দানের ফলে।
আজ হতে তুমি দানীর অগ্র, নহ হে অগ্রদানী—
কপিলের শাপ ঘুচাইলে তুমি প্রেমের বন্যা আনি'।

শ্রীধর

সন্ন্যাসী সাজি শ্রীধর চলেছে বদ্রীনাথের পথে,—
আমাদের সেই সঙ্গী শ্রীধর চিনিবে না কোনো মতে।

পাঠশালে তার ছিল হাতটান, দৃষ্টিও ছিল খর,
'নষ্টচন্দ্রে' কত ফলমূল গোপনে করিত জড়ো।
একদা তাহার মরেছিল যবে পোষা এক শুকপাখী,
দুদিন শ্রীধর কেঁদে ফিরেছিল বনে বনে তারে ডাকি।
পালিত যতনে বিড়াল কুকুর পশুপাখী নানা জাতি,
জানিনে তো মোরা কবে হতে হল সাধু ফকিরের সাথী।

ছাড়ি যোশীমঠ চলেছে শ্রীধর শ্রীধামের অভিমুখে,
'পরশ পাথরে' গঠিত ঠাকুর বারবার জাগে বুকে।
সিনান করিয়া মন্দিরে যবে প্রবেশে দুষ্টমতি—
দৃষ্টি পড়িল দেবতা গলের মুক্তামালার প্রতি।
স্তিমিত আলোকে হেরিয়া সে হার কুভাব আসিল মনে,
দেখিয়া শ্রীমুখ কাঁদিল হৃদয়, কাঁপিল সরম কোণে।
দুদিনের পর বিদায়ের দিনে হস্তে ধরিয়া থালা—
রাওল ঠাকুর আসিলেন লয়ে সেই সে মুক্তামালা।
বলিলেন ধীরে জড়ায়ে আদরে শ্রীধরের দুটি পাণি,
বদরীনাথের পরমভক্ত আপনি তাহা কি জানি।
দেবের আদেশে দেবের এ মালা উপহার দিনু করে,
শুনিয়া শ্রীধর কাঁপিয়া উঠিল বিস্ময়ে লাজে ডরে।
কম্পিত করে মুকুতার মালা গ্রহণ করিল যবে—
পদধূলি নিতে করে কাড়াকাড়ি সাধু সন্ন্যাসী সবে।

ছল ছল চোখে চলেছে শ্রীধর প্রতি পদে পদ টুটে
যতনে তাহারে ধরে লয়ে যায় গাড়োয়ালী এক মুটে।
নিজের দীনতা ভাবিয়া শ্রীধর পারে না রোধিতে বারি,
লাগিতেছে আজ মুকুতার মালা পাষাণের চেয়ে ভারী।
এমনি হরির অহেতু করুণা প্রেমের এমনি জাদু
কয়লা হৃদয় গলি হীরা হয় তস্করও হয় সাধু!
শ্রীধর তখন মুছি আঁখিনীর বলিল, রে মন তবে—
এখন হইতে যাঁর মালা তাঁর সন্ধান নিতে হবে।
সংসার ছাড়ি এ মণির মালা কী করিবি তুই নিয়ে,
দেখা হলে পর তাহারে চাহিবি তার ধন ফিরে দিয়ে।

বরষের পর শ্রীধর চলেছে বন পথ দিয়া ধীরে
গঙ্গোত্রীর বারি চড়াইতে রামেশ্বরের শিরে।
দেখিল পথেতে সঙ্গী জনেক পতিত নকুলে তুলি,'
ক্ষত দেহে তার বুলাইছে হাত যতনে ঝাড়িছে ধূলি।
তৃষিত ওষ্ঠ ভিজায়ে দিতেছে কমণ্ডলুর নীরে,
তাপিত তনয়ে কাঁধে লয়ে যেন জনক চলেছে ধীরে।
কিছু দূরে গিয়া দেখে পড়ে আছে ডানা ভাঙা এক পাখী,
সন্ন্যাসী তারে কোলে তুলে নিল নকুলে ঝোলায় রাখি।
মুখে দেয় জল বুকে চেপে ধরে মুখ পানে চেয়ে কাঁদে
ভাঙা পাখা তার উত্তরী ছিঁড়ি সরু সূতা দিয়া বাঁধে।
পথের পাশেই সাধুর আবাস, শ্রীধরে ডাকিল সেথা,
বাজিতে লাগিল শ্রীধরের প্রাণে সুদূরের কোনো ব্যথা।
দেখিল সেখানে পদহারা গাভী ষণ্ড মহিষ জরা—
পিঁজরাপোল কি আশ্রম তাহা যায় না সহজে ধরা।

সজল নয়নে শ্রীধর বলিল, ওহে সন্ন্যাসী ভায়া!
সংসার দিয়ে পশুশালা নিলে এমনি দারুণ মায়া?
সন্ন্যাসী বলে কী করি ঠাকুর, বাঁধন নাহি যে টুটে,
নীরব বেদনা আমার পরাণে সাধনা হইয়া ফুটে।
জীবের মাঝারে দেবতা পেয়েছি বলিতে পারিনে ভয়ে,
আমার চোখে যে এক হয়ে গেছে জীবালয়ে দেবালয়ে।
শুনিয়া শ্রীধর তাহারে বলিল, হাসি, করুণার হাসি—
কাহার লাগিয়া কোথা পড়ে রবে, কাহার লাগিয়া আসি?
সন্ন্যাসী বলে, মায়াজালে আমি জড়ায়ে পড়েছি অতি
ভাল মনে হল, এক কাজ কর দয়া করে মোর প্রতি।
হৃষীকেশ যেতে কুড়ায়ে পেলাম একটি মুকুতা আমি,
জানি না কাহার মরি খুঁজে খুঁজে! জানে অন্তর্যামী।
শুনেছি সাধুর মালা হতে তাহা অজ্ঞাতে গেছে খসি,
রামেশ্বরেতে যাবে সেই সাধু তারি লাগি আছি বসি।
এত বলি' হাসি' মুকুতাটি দিল আনি' শ্রীধরের হাতে,
বলিল তাহারে, ফিরে দিও তুমি যদি দেখা হয় সাথে।

শ্রীধর আপন মুকুতার মালা যতনে বাহির করি'
দেখিল তাহার একটি মুকুতা কেমনে গিয়াছে পড়ি।
পুলকে সাধুর হাত দুটি ধরি কাঁদিয়া বলিল, ভাই,
কেমনে আমার করিয়াছ খোঁজ তব অসাধ্য নাই।
এ মুকুতা হারও পরের জিনিস, নাম তার আছে লেখা,
ধর মালা ধর, দিয়ো মালিকেরে, যদি পাও তার দেখা।
রাখি মালাগাছি, হরষে শ্রীধর চলে গেল নিজ কাজে,
সন্ধানী হাতে সঁপিয়াছে মালা তৃপ্তি যে হিয়া মাঝে।

জানিনে তো আমি কী করিল সাধু লয়ে সে মুকুতা-মালা,
হয়েছে সেখানে গ্রাম জুড়ি এক পশু-চিকিৎসা-শালা।
মূক প্রাণীদের যতন করিতে রোগে ঔষধ দিতে—
ব্রহ্মচারীরা মগ্ন সেথায় সদা আনন্দ চিতে।
দেববনে বলে আছে দুটি সাধু শুনেছি তাদের কথা,
পীড়িত পশুর গায়ে হাত দিলে জুড়াইয়া যায় ব্যথা।
সাঁঝে দুইজনে বসে যোগাসনে স্মরিয়া জীবের জ্বালা
মালিকের পদে ফিরে দেয় আঁখি-দ্রব-মুকুতার মালা।

নির্বাসিত

হয়েছিল আমাদের বাছুরের গোয়ালেতে গোটা দুই কুকুরের ছানা,
কেঁউ কেঁউ ভেক্ ডেকে দেক করে তুলেছিল ঝালাপালা সারা বাড়িখানা।
রাখাল নিমাই চাঁদ আল্সের শিরোমণি 'তাড়াইয়া দাও' বলা হলে—
তাড়ানো দূরের কথা, দু ছড়া ঘুঙুর আনি বেঁধে দিল তাহাদের গলে।
কুকুর বেড়াল দেখে তেড়ে যায় ছানা দুটা, পুলকের সীমা নাই তার,
নিমাই নিয়ত বলে, 'এ রকম তেজী ছানা দুনিয়াতে খুঁজে মেলা ভার।
একদিন ছানা দুটা গৃহ-দ্বার খোলা পেয়ে ঘরে ঢুকে খাইতেছে মুড়ি,
হতভাগা নিমায়েরে দেওয়া গেল ঘা কতক ফেলা গেল সব হাঁড়ি কুড়ি,
দিনু রেগে তাড়াইয়া, পরদিন ছানা দুটা বসে আছে উঠানেতে আসি
পৌষে তো নাই বাবু তাড়াইতে কোন জীব, নিমাই বলিল মৃদু হাসি।
আবার মাসেক পরে ঢুকিয়া হেঁসেল ঘরে, আজিকে দিয়েছে ছুঁয়ে হাঁড়ি।
এইরূপ উৎপাত অবিরত দিন দিন কেমনে সহিতে বল পারি?

ডাকিয়া অপরলোক বলিলাম ছানা দুটা দিয়ে এসো নদী পার করে—
ভিন গাঁয়ে চলে যাক দেখো যেন কদাচ না পুনরায় এ বাড়ীতে ফেরে।
তিন দিন বাদে দেখি একটা কুকুর ছানা, নদী পাড়ে দাঁড়াইয়া হায়
চাহিয়া আমার পানে ডাকিছে কাতর স্বরে লেজ নাড়ি ফ্যাল ফ্যাল চায়।
সে যেন বলিছে আহা—'করেছি অনেক দোষ মাফ কর দাও মোরে যেতে
দেখ মোর ভাইটিকে শিয়ালেতে লয়ে গেছে তিন দিন পাই নাই খেতে।'
তার সেই চাহনিতে কী যে কাতরতা মাখা, কী যে ভাব দীনতার মুখে
আপনার ব্যবহারে আপনি পাইনু লাজ বেদনা পেলাম বড় বুকে।
ওপারেতে গিয়া আমি বুলাইনু গায়ে হাত পুলকেতে লেজমুখ নাড়ে,
বাসনার ভাষা হায় কতটুকু বলে আর আধা তার প্রকাশিতে নারে।
সোহাগেতে কোলে করি এপারেতে আনিলাম, বাঁচিল সে ঘরে ফিরে আসি
ক'দিন ছিল না কাছে মনে বড় বাজিয়াছে তাই তারে বড় ভালবাসি।
নিমাই তাহারে দেখি বলিল ধমক দিয়া কোথা গিয়েছিলি বোকা ছেলে
কেন তার পরদিন ঘরে ফিরে এলি নাকো কাঁদে বাবু দেখ চোখ মেলে।
করিলাম বহু খোঁজ সে ছানাটি মিলিল না কী করেছি ক্ষণিকের ঝোঁকে,
নিমাই ভরসা দেয়, দেখুন তো নিয়ে আসি, তবু মোর জল আসে চোখে।

শেষ

পৌষ যে আমার যায় গো চলে 'বাঁউরি' এবং আগ দিয়ে,
ধানগুলিকে যাও গো রেখে বেষ্টনী ও দাগ দিয়ে।
ফিরছি আজি যাত্রা গেয়ে,
নূতন গানের বায়না নিয়ে,
'বিজয়া' ওই দাঁড়িয়ে আছে বোধন লাগি ভাগ নিয়ে।
বলতে গিয়ে হয় না বলা কি কথা কই বিস্মরি।
ইতির পরে নিতিই লিখি, নূতন করে 'শ্রীহরি'
সূর্য্য আবার যায় গো সরে,
আমার আশার সাজটি পরে
'নান্দী মুখের' মুখ দেখা যায় হোমের ধূমের ফাঁক দিয়ে।

অজয়

অজয়

গঙ্গা আমার পুণ্যতমা সরিৎরূপা দেবী
মৃত্তিকাতে অমৃত তাঁর, পুণ্য সলিল সেবি,'
স্তোত্র তাঁহার গাইতে আমার কুলায় নাক ভাষা,
ধন্যা হরি পাদোদ্ভবা অন্তিমেরি আশা।
তিনি গীতা, গায়ত্রী মোর, আরাধনার ধন,
সাত পুরুষের স্বর্গ আমার, নিতান্ত আপন।
কিন্তু মায়ায় কীট যে আমি বলতে পারি কি ?
উজানি ও অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

২

যমুনা নাম করতে আমার শিউরে উঠে গা,
নামে আনে বৃন্দাবনের পরাগ বহিয়া।
আরাধ্যেরি আরাধ্য মোর, প্রাণের আমার প্রাণ,
তরঙ্গিত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের গান।
আমার শ্যামের বংশীধ্বনি, গোরার আঁখি জল,
স্বপ্নে আমার কর্ণে পশে মধুর কলকল।
কিন্তু মায়ার কীট যে আমি বলতে পারি কি
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

৩

সরযূ যে অমৃতময় আমার রামায়ণ,
ব্রহ্মা না হক বাল্মীকিরই কমণ্ডলুর ধন।
সীতা রামের গাহন পূত, অপার্থিব নীর,
নামেতে হয় পুণ্য দেহ, ধূলায় লোটে শির।
ত্রেতার স্মৃতি, জেতার স্মৃতি, ত্রাতার স্মৃতি সে
বুকের মাঝে জপ করি পাই শক্তি নিমিষে।
কিন্তু মায়ার কীট যে আমি বলতে পারি কি
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

৪

বিশ্ব প্রেমিক নইক আমি, শক্তি নাহি হবার
দুর্ব্বলতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা মাগি সবার।
ক্ষুদ্র আমি বিরাটকে তাই ক্ষুদ্র ছবি করি,
আরাধনায় বুকের মাঝে নিত্য রাখি ধরি।
ক্রুদ্ধ কেহ হবেন না ক ক্ষম্য অভাজন
ক্ষুদ্র গ্রামের চৌসীমানায় রুদ্ধ আমার মন।
অভয় মাগি মনের কথা বলতে পারি কি
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

৫

অজয় আমার ভাঙবে গৃহ, হয়ত দুদিন বই
তবু তাহার প্রীতির বাঁধন টুটতে পারি কই?
সে ত কেবল নদ নহেক, নয়ক সে ত জল,
সে যে তরল গীত-গোবিন্দ চৈতন্য-মঙ্গল।
সে যে আমার চণ্ডী-দেবীর চরণ-অমৃত,
বনকে করে শ্যামল এবং মনকে সমৃদ্ধ।
দুঃখ এবং দৈন্য মাঝে বলতে পারি কি
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

বকুলতরু

এই বকুলতরুটি শ্রীপাট কোগ্রামে লোচনদাসের আখড়ার নিকট অজয় নদের তীরে প্রায় পাঁচ শত বৎসর অবস্থিতি করিতেছিল। কোন ভাগ্যবতী তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অজয়ের সর্বগ্রাসী ভাঙ্গন, তরুটীকে গ্রাস করিয়াছে। বকুল-তলাটী সমস্ত গ্রামবাসীর মিলন আনন্দও বিশ্রামের স্থান ছিল। শাস্ত্রকথা সংকীর্তন প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হইত।

পাঁচশো বছর হেতায় ছিলে প্রাচীন বকুলগাছ,
অজয় নদেয় ভাঙনেতে পড়লে ভেঙে আজ।
কালও ছিলে নিবিড় শ্যামল লোহার মত দৃঢ়
ফুলের রাঙ্গা প্রফুল্ল মুখ লাখো পাখীর গৃহ।

কাল ও ছিল সত্র তোমার জমাট মনোহর,
সারা দিবস অতিথ ভ্রমর গুঞ্জন মুখর।;
কাল ও ছিল তোমার তলে ছেলে মেয়ের ভিড়,
আজকে নত নদীর জলে অভ্রভেদী শির।
সিদ্ধ তুমি না হও মোদের বৃদ্ধ বকুল গাছ,
বক্ষ উঠে টন্ টনিয়ে চললে তুমি আজ।
তুমি মোদের অক্ষয় বট তুমি বোধিদ্রুম,
মাতামহের পিতামহ তোমায় নমো নমঃ।
শৈশবেরি গোকুল তুমি স্নেহের ব্রজধাম,
বার্দ্ধক্যেরি প্রভাস তুমি পুণ্য তব নাম।
অক্ষরণের কুরুক্ষেত্র দেখলে হত ভ্রম
রামায়ণের তুমিই মোদের বাল্মীকি আশ্রম।
পুরাণের নৈমিষারণ্য তুমিই ব্যাসাসন—
সংকীর্তনে তুমিই মোদের শ্রীবাস অঙ্গন।
তুমিই মোদের সুহৃদ সখা তুমি গুরুর গুরু।
হোলো তোমার চরণ তলেই ভক্তি জীবন সুরু।

(২)

লোচন দাসও তোমার তলে করেছিলেন খেলা
বাদল দিনে নালার জলে ভাসিয়েছিলেন ভেলা।
তোমার ফুলে মালা গেঁথে ছেলে খেলার ছলে
অলক্ষ্যেতে পরিয়েছেন বনমালীর গলে।
তোমার তলে পড়িয়াছে তাঁহার চোখের জল
তুমিই প্রথম শুনিয়াছ চৈতন্য মঙ্গল।
কাছেই তোমার শিবের দেউল তুমি মোদের কাশী
ঘরের কাছেই স্বর্গ মোদের তোমায় ভালবাসি।

(৩)

শুনিয়াছ যুগের যুগের ছেলেমেয়ের কথা,
উৎসবেরি আনন্দ ও ভাঙ্গা বুকের ব্যথা।
প্রাচীনতম বাসিন্দা যে তুমি গ্রামের বুড়া
একটি তোমার চুল পাকেনি চির শ্যামল চূড়া।

সুদূর থেকে তোমায় দেখে উঠতো ভরি বুক,
তুমিই সবার গৃহস্বামী আদর মাখা মুখ।
আজকে তোমার স্বর্গারোহণ ওগো বনস্পতি।
আজকে গোটা গ্রামের অশৌচ গোটা গ্রামের ক্ষতি
মনে পড়ে তোমার স্নেহ তোমার শীতল ছায়া
মনে পড়ে ফুলের সুবাস, স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া।
জমছে মনে হারিয়ে যাওয়া চেনা মুখের ভিড়
প্রিয় জনের বিচ্ছেদেরি যন্ত্রণা নিবিড়।

(৪)

তুমি গোটা গ্রামের দায়াদ অযুত নাতি,পুতি,
চোখের জলে স্বর্গগামী করি তোমার স্তুতি।
নন্দনেতে ঠাঁই হবে হে কল্পতরুর কাছে,
গ্রামের তরুণ বৃদ্ধ বালক স্বর্গ তোমার যাচে।
স্বর্গ থেকে বকুলতরু মর্তপানে চেয়ে,
আশীর্ব্বাদী তোমার ফুলে বুকটি দিয়ো ছেয়ে।
মিত্র ও দৌহিত্র তোমার ভুলতে তোমায় নারি,
আমায় করো তোমার প্রেমের উত্তরাধিকারী।

পল্লী-শ্রী

মূর্খ গরিব নামহীন মোর মা হয়েই তুই থাকলি মা।
সব দিকে আমি ছোট বলে তুই আগ্‌লিয়ে কোলে রাখলি মা।
পাঠাবি কোথায় নাহি সৌরভ তুলিবি কোথায় নাহি গৌবব
পরে নিলে নাতো ঘরে রেখে দিলি তাইত আমারে পাগ্‌লী মা

(২)

তোরি আঁচলের খুঁট ধরে যাই, ভরা অজয়ের ঘাট পানে;
তোরি পাদমূলে দাঁড়াইয়া চাই রামধনু আঁকা মাঠ পানে।
মন্দিরে তোর সাথে সাথে যাই, পীযুষ প্রসাদ হাত ভরে পাই,
ভগবতী যার সুমুখে তাহার বৃথা ভাগবত পাঠ কেনে?

(৩)

দিওনা আমারে দরবারে যেতেদুরু দুরু কাঁপে বক্ষ মা,
আছে শুধু দীন দুর্ব্বল দুখী অক্ষম সাথে সখ্য মা।
জ্ঞানাঞ্জনের শলাকার ভার জলভরা চোখ সবে না আমার,
কাজল-লতার কাজলে তোমার জুড়াও নয়ন, রক্ষ মা।

(৪)

তুই গড়ে দিস্ পাতার টোপর সোণার কিরীট সেই মা মোর,
তোর আঁচলের মধুর বাতাস আয়াস করে কি পায় চামর!
পারিনে পুঁথির ওলটাতে পাত,দিই শিষ, শ্যামা পাপিয়ার সাথ,
গুণ না থাকুক, গুণ গুণ করি বেড়িয়া ও পদ ওই ভ্রমর।

(৫)

যেন মা তোমার স্নেহের দীঘিতে কমলের সাথে নাইতে পাই।
যেন মা তোমার বিপিন ভবনেপাপিয়ার সাথে গাইতে পাই।
চন্দন সাথে যেন রোজ রোজ পরশি মা তোর চরণ সরোজ,
যেন মা তোমার চাতকের মত হরির করুণা চাইতে পাই।

এসো

এসো গোটা এ বাগান আলো করা ফুল অনিমেষ পথ চাওয়া,
এসো খর নিদাঘের হৃদয় জুড়ানো সজল মলয় হাওয়া।
তুমি সাগরের শেষ সীমা হে,
তুমি ধূ ধূ মাঠে শ্যামলিমা হে,
তুমি দুখের প্রবাসে বুকের সে গান বহুদিন ভুলে যাওয়া।

(২)

এসো ভাঙ্গা এ বুকের রাঙ্গা রাঙ্গা দাগে গোপন চরণ ফেলে,
এসো কমলদীঘিতে নব অরুণের অনুরাগ আঁখি মেলে।
এসো নব আষাঢ়ের ঘন ঘোর,
এসো চির মধুময় বঁধু মোর,
এসো মরুর পরেতে তরুর মমতা ফুলে ফুলে পথ ছাওয়া।

(৩)

এসো তমালের ডালে বহুদিন পরে,ঝুলুক ঝুলন ডুরি,
এসো শিষ দিয়ে ডাকা কপোতের ঝাঁকে ফাঁকে ফাঁকে দোঁহে ঘুরি
এসো এসো মুখভরা মধুনাম,
এসো এসো হে নয়ন অভিরাম,
এসো বুক ভরা ধন, সোনার স্বপন আপন করিয়া পাওয়া।

চঞ্চলের জয়যাত্রা

এই আছে এই নাই, চ'লে যায় কোন্ দূর,
দেয় পাড়ি, বাছে না সে, সমতল বন্ধুর।
ঢল ঢল নয়নের ওই মধু-দৃষ্টি,
উড়ো মেঘ করে যায় রামধনু স্বষ্টি।
নোলকের আবছায়ে পলকের হাস্য,
যুগ ধরি চলে তার স্থত্রের ভাষ্য।
হেমমৃগ ছুটে যায় চায় মনানন্দে,
সমীরণ ভরপূর মৃগনাভি-গন্ধে।
চমকিয়া চলে যায় কোথা পরী উচ্চে,
ভরে দেয় সারাবুক পারিজাত গুচ্ছে।
ফুলে ভরা কুল ছাড়া ও ময়ুর পক্ষী,
চ'লে যায় দাগ টেনে বুকে রেখা অঙ্কি।
চলে যায় মায়া জাল পড়ে তার লুটায়ে,
নয়নের মুকুতা সে সব লয় গুটায়ে।
পলাতক ওই যায়, ওই যায় চঞ্চল,
হুলু দেয় দিক বধূ, দেখা যায় অঞ্চল।
আঁখি দিয়ে গড়া পথ সেই পথে যাত্রা,
গতি তার যতিহীন নাই ছেদ মাত্রা।
জেগে রয় লেগে রয় পরাণে সে দীপ্তি,
নিমেষের আলাপেতে জীবনের তৃপ্তি।
ভেদ নাই ভেদ নাই না পাওয়া ও পাওয়াতে,
অধরের পরিচয় সোহাগের হাওয়াতে।

ক্ষণের সঙ্গী

ক্ষণিক যারা এক নিমিষের সাথী,
বণিক তারা অচিন পথের চেনা ;
যাদের সাথে কাট্‌লো প্রহর রাতি,
তাদের সাথে চোখের লেনা-দেনা ।

২

পথের পাশে বনের হরিণ যত
চকিত চেয়ে পালায় তারা ছুটে,
গবাক্ষেরি বদন কমল মতো
লাজুক যারা ফুটেই পড়ে টুটে ।

৩

মরুর পথে ফুলেল বনের হাওয়া,
ঘোমটা-ঢাকা মুখের মৃদু হাসি,
শিস্ দিয়ে ওই শ্যামার উড়ে যাওয়া,
উড়িয়ে দেওয়া কদম রেণু রাশি ।

৪

পলাতক ওই আগন্তুকের দল,
নিমেষ মাঝে আলাপ ক'রে যায়,
ঠাঁই ঠিকানা কিছুই নাহি বলে,
ভিড়েই তরী নিরুদ্দেশে ধায় ।

৫

কোথায় কালের অতিথশালে হায়,
ওরা সবাই রাত্রি করে বাস ;
ধর্মশালায় বাউলগীতি গায়,
দেখতে ফিরে হয় যে বড় আশ !

৬

বুঝতে নারি কোথায় তাদের ঠাঁই—
হিমালয়ের ভূর্জবনের ছায়,
সে কোন্ মহা কুম্ভমেলায় ভাই
আবার তাদের নাগাল পাওয়া যায় !

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড

চলিয়াছ তুমি সড়কের রাজা কলিকাতা হতে পেশবার
সুবিধা পেয়েছ কত নদ নদী নগরীর সাথে মেশবার
আঙুর পেস্তা কিসমিস
পেতে জিভ করে নিশপিস
ডাকে খাইবার গিরিপথ, ডাকে ডাকিনী এলায়ে কেশভার !

২

পাকুড় পাথরে চুণার আদরে কাঁকরে কাঁকরে ছয়লাপ,
কোথা কালো কোথা শুভ্র পাংশু কোথা লাল করে জয়লাভ।
পথে পথে ছায়া ছত্র
হরিণ হরিৎ পত্র।
সিন্ধু বরুণা গঙ্গা যমুনা দর্শনে হরি লয় পাপ।

৩

কোথাও গো গাড়ী আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজে চলছে,
টোঙ্গা একা পাল্‌কী লক্কা টলছে ।
ছুটেছে অশ্ব তুষ্ট,
উষ্ট্রের দল পুষ্ট,
কোথাও মোটর ভাপ্‌রা উগারি দাপটে দুনিয়া দলছে।

৪

সাঁওতাল কুলি কোথাও করিছে আয়োজন আল বাঁধবার,
খর্জ্জুর গাছে রজ্জুতে বাঁধা বংশী ও হাঁড়ি রাঁধবার।
কাবুলীরা লাঠি হস্তে
চলেছে চাহে না বসতে,
জননীর কোলে ছোট ছেলে ওই তোড়জোড় করে কাঁদবার।

৫

কোথাও নিকানো মাটির ছাদেতে বধুরা কাটিছে চরকা,
রাঙা পাথরের বুরুজের গায়ে মর্মরে গাঁথা ঝরকা।
রূপসী কৃষক কন্যা
ছুটায় রূপের বন্যা,
কোথাও ঢেকেছে রমণীর রূপ রমণীয় সব বোরখা।

৬

কোথাও চলেছে ওড়না উড়ায়ে পরি সার্ট সায়া সুকৃতন,
টোপ টুপি আর পাগড়ীর সাথে খোলা শির ভ্রমে ভুক্তন।
চলে পল্টন মার্চ্চে
পরমায়ু সব বাড়ছে
কোথাও নাঙ্গা সন্ন্যাসী চলে সবকেশী সব লুপ্তম।

৭

বহুভাষী তুমি কথা কও কভু উর্দ্দু ফারসী বাঙলায়,
হিন্দি পুস্ত সবে ওয়াকিফ্ বলো কে তোমারে সামলায়,
সুর যে তোমাকে হাতড়ায়,
ঠুংরি কাজরী দাদ্‌রায়
ঘটাও সখ্য খান্দানী সেখ, বাবু, শেঠ, লালা, লাঙলায়।

৮

ধর্ম তোমার বিশ্বজনীন পথে পথে তব মন্দির,
নগরে নগরে কত মসজিদ গির্জা ও প্রতিদ্বন্দ্বীর।
সমাধির সব গম্বুজ
কাল নীরে শ্বেত অম্বুজ
রয়েছে দাঁড়ায়ে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে ফন্দি করিছে সন্ধির।

৯

পথ দেখাইয়া পাণিপথ দিয়া, ভাঙ গড় কত দিল্লী,
কোথাও তোমার বাজিছে সারঙ, কোথাও ডাকিছে ঝিল্লী।
কোথাও মিনার উঠছে,
কোথা বীণা তার টুটছে,
কোথাও উগ্র ব্যাঘ্রের বাসা কোথাও আভীরপল্লী।

১০

তুমি নিয়ে যাও দুর্বার সেনা কামান অশ্ব হস্তী,
দেশের ফসল নষ্ট করিয়া ছড়ায়ে মৃতের অস্থি।
লয়ে যাও দিবারাত্রি--
ঝোলা ঝাণ্ডা ও যাত্রী,
সোহাগে কোথাও লোহাকে গলাও দরিয়ায় স্থাপো বস্তি।

১১

বাঙ্‌লা হইতে সঙ্গে নিয়েছ গোবর সর্ষে বাবলায়,
সটান চলেছ দৌড়ে কোথায় ধরিয়া কে তায় সামলায়
রক্ষা সাধু ও শ্রেষ্ঠের
ওটা যে নিয়ম কৃষ্ণের
হরি রাখে যারে মারিবে কি তায় বাঘে, সাপে নাহি খাবলায়।

১২

স্বর্গ না হোক ভু-স্বরগ যেতে সড়ক বানালে শের শা,
সিধা আগাগোড়া, নয় বাঁকাচোরা, কোনোখানে নয় তেরচা।
ভারতের দুই প্রান্ত
এক করি তবে ক্ষান্ত
গঙ্গার তুমি সঙ্গীই বট, দেখে মনে হয় ঈর্ষা।

১৩

তুমিই মিশালে আমে আখরোটে, আলুবোখারায় চালতায়,
এক পর্দ্দায় ফুটি সর্দ্দায় পুনকো পালং পলতায়।
বাঙালী এবং তুর্কে
দুর্গাবাড়ী ও দুর্গে,
জর্দ্দার সাথে সাঁচিপান আর সুর্মার সাথে আলতায়।

১৪

তুমিই মিশালে শালে মসলিনে হুকা কাছে এল ফরশী।
মিহিদানা কাছে বেদানা বসিল বর্শার কাছে বঁড়শী।
হিঙ্‌ কলায়ের পার্শ্বে,
চিনে লওয়া আর ভার সে,
ভুট্টা বালাম বাসমতি সব একদম পাড়াপড়শী।

১৫

বিলকুল ভাই তকলিফ নাই হরঘড়ি সব ছুটছে,
কোথা থাকে থাক ময়ূরের ঝাঁক, টিয়া টাকসোণা উড়ছে,
হরিণ ঊষর ক্ষেত্রে
চাহিছে আকুল নেত্রে,
বাঙালীর ছেলে বাংলার লাগি তবু আঁখি মন ঝুরছে।

অমৃত পিয়াসা

পথের ধারে ওই যে অশথ গাছে
এখনো তার নামটি লেখা আছে।
পথিক বালক দাঁড়িয়ে শীতল ছায়ে
রাখলে এঁকে নামটি গাছের গায়ে।
পথের লোকে স্মরবে লেখা দেখে
তাই সে আশা নামটি গেছে রেখে।

২

এ নয় খেলা, আমোদ করে লেখা,
যেথায় সেথায় পাই যে ইহার দেখা
কেউ পিরামিড কেউ বা মিনার গাঁথে,
কেউ বা লেখে তাম্রফলক পাতে।
এক পিপাসা একই আবেগ ভরে
কেউ বা পুতুল কেউ বা মহল গড়ে।

৩

কেউ লেখনী কেউ তুলিকা ধরি
নামটি চাহে রাখতে অমর করি।
তপ করে কেউ এ বর শুধু মাগি,
মথন করে সিন্ধু ইহার লাগি,
ইহার লাগিই যুদ্ধ দেবাসুরে,
ইহার তৃষাই জাগছে ভুবন জুড়ে।

৪

মানব কেন ছাড়বে আমি ভাবি
অমৃতে তার জন্ম হতে দাবী।
সুধার ক্ষুধাই জাগছে যে ওই দাগে,
মন্থনেরি ঢেউটি বুকে লাগে।
আদিম তৃষা মিটবে নরের কিসে
দাবীর কথা রক্তে আছে মিশে॥

অশ্রু নিবাস

ওই যে খোকার কাজল-চোখের জল,
বল দেখি সে কোথায় থাকে বল ?
রয় সে যেথা নীলোৎপলের ফাঁকে
অমল ধবল মরাল-শাবক ডাকে ;
মুক্তাগলা বৃষ্টিধারা যেথা,
পিছলে পড়ে কাঁপায় কমলপাতা ;
যেথায় পরীর ফুৎকারেতে ওই
হেমগিরিতে ছড়ায় যুঁয়ের খই।
কান্না যেথায় আর্দ্র হাসির ঘামে,
ওই যে সরিৎ সেথায় থেকেই নামে।

২

ওই তরুণীর নয়ন কোণায় জল
বল্ দেখি সে কোথায় থাকে বল্ ?
রয় সে যেথা সদাই কদম ফোটে,
কথায় কথায় ইন্দ্রধনু ওঠে।
রৌদ্র মেঘের ঝগড়া মাটির ঘরে,
খঞ্জন এবং চাতক যেথায় চরে ;
নন্দন এবং পঞ্চবটীর হাওয়া
করছে যেথা নিতুই আসা-যাওয়া।
নর্ম্মদা রয় ফুলের কুটীর ঘেঁসে,
ও জল জোটে সে দেশ থেকেই এসে।

৩

ওই যে বুড়ার তপ্ত নয়নধার,
বল্ দেখি রে কোথায় আবাস তার ?
সে রয় যেথা কালাগুরুর গাছে
কৃষ্ণ ভুজগ অসঙ্কোচে নাচে,
তীব্র যাহার দৃষ্টিবিষের শরে
উড়ন্ত ওই কপোত পুড়ে মরে।

বজ্র যেথায় জনম লভে হায়,
কপিল যেথা রোষ নয়নে চায়,
যেথায় ঋষি দুর্বাসারি বাস,
সেথায় থাকে ও ক্ষীণ জলোচ্ছ্বাস।

৪

ওই যে সাধুর পুণ্য নয়নধার,
বল্ দেখি রে কোথায় আবাস তার ?
মন্দাকিনীর মন্দানিলের ভরে
কল্পতরুর ফল যেখানে ঝরে,
অস্তরবির ঊর্দ্ধকিরণ লুটে
যেথায় পূজার স্বর্ণকমল ফুটে।
স্বাতীর সলিল জলদ যেথা আনে,
দেবের চরণ ঘামে ধরার টানে,
আঁধার ভেদি কেন্দ্র ঊষা হাসে
ও নীরটুকু সে দেশ থেকে আসে॥

ভক্তির যুক্তি

শুভ ফাল্গুনে দেখা হ'ল মোর এক কৃষকের সাথে
পুলকে দেখিছে ক্ষেতের ফসল হুঁকাটি লইয়া হাতে।
দেখিয়া আমারে নোয়াইয়া মাথা কহিল ঠাকুর শোনো—
তুমি পণ্ডিত, আমি তো মুর্খ, জ্ঞান নাই মোর কোনো।
পাড়ায় আজিকে তর্ক হয়েছে একটা বিষয় নিয়ে,—
এই দুনিয়ার মালিক যে-জন, পুরুষ বটে কি মেয়ে ?
ধর্মরাজের দেয়াসী মহেশ বলিয়াছে জটা নাড়ি
ধরার কর্ত্তা জগদীশ্বর হইতে পারে কি নারী ?
আমি তো অবাক! প্রসব করেছে এইযে দুনিয়াখানা
শ্যামা মা আমার, একথা জানেনা, সবারি তো আছে জানা।
জগৎ-জননী মা না হত যদি দোপাটী পেত কি ফোঁটা,
গোলাপ পেত কী রাঙা চেলি তার, কদলী গরদ গোটা ?

ময়ূর পেত কি ময়ূরকণ্ঠি, রেশমী পোষাক টিয়া,
ঝুঁটি কোথা পেত ছোট বুলবুলি বাঁধা লাল ফিতা দিয়া ?
ছেলে মেয়েদের খেতে দিতে পারে, পারে সে সোহাগ দিতে
টিপ্ কাজলেতে সাজাইতে পারে, দেখিনি তো হেন পিতে।
সুমুখেতে দেখ তুষ্টু বোলতা সোনালী ঘুন্সী পরা,
বকের কামিজে কিবা ইস্তিরি যায়না ময়লা করা।
ডোবার যে পানা তাহারও পোষাক তাহাতেও ফুল-কাটা,
ওর ও গায়ে দেখ সবুজ দোলাই ওই যে খেজুর কাঁটা।
ভূতলে গগনে গিরি নদী বনে দেখুক চাহিয়া কেহ
চারিদিক দিয়া গড়ায়ে পড়িছে মায়ের গভীর স্নেহ।
তুমিই, ঠাকুর, কর মীমাংসা, বলিল সে হাসি মুখে,
আমি তার সেই কর্কশ কর টানিয়া নিলাম বুকে ॥
বলিলাম জেনো ধর্ম ক্ষেত্র এই সে তোমার মাঠ,
নীরবে হেথায় তুমিই করেছ বুকের চণ্ডীপাঠ।
তুমি ভক্তির গরদ পরেছ, তোমারে প্রণাম কোটি,
পাতা খেয়ে খেয়ে ভোঁতা মুখ মোর এখনো বাঁধছি গুটী!

দাবী

টার্কী কি টাসখাণ্ড টোকিয়ো কি মস্কো
কেনেডা কি কেন্‌টাকী যেথা হ'ক বাস গো।
হ'ক বেশ হ'ক দেশ আহারাদি ভিন্ন,
একেবারে মুছে যা'ক স্বজাতির চিহ্ন,
যে ভাষায় কথা কয়, যেথানেই রয় সে
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে।

২

অমৃতের অধিকার জন্মের সঙ্গে
সূর্য্যের রশ্মি সে বিম্বিত রঙ্গে,
চরণে কি শিরে র'ক হক সে বিবর্ণ
সনাতন ছাপ মারা সে যে সেই স্বর্ণ।
জন্মের অধিকার জোরে পুনঃ লয় সে
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে।

৩

প্রলোভনে ভয়ে যদি ত্যজে নিজ ধর্ম
অনুতাপে পরে যদি বিঁধে তার মর্ম ।
অনাচার করি যদি পরে হয় ক্ষুন্ন,
পুনঃ ফিরে আসা যদি ভাবে মনে পুণ্য,
করি হরি নাম করে সব পাপ ক্ষয় সে
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে

৪

যে ডোবায় ডুব দিক সে যে রাজহংস
শুভ্রতা কোন মতে হবে নাক ধ্বংস ।
যেই দিকে ছুটে যায় বর্ষার জল গো
গঙ্গার বুকে এলে পূত নির্মল গো ।
অভয়ের বাণী স্মরি সব ব্যথা সয় সে
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে ।

৫

যে বনেই থাক আর যে নামেই ডাকবে,
চন্দন চিরদিন চন্দন থাকবে ।
কুর্ত্তা কামিজ কোটে খেদ নাহি বিন্দু
যে বাসেই ঢাকা থাক বুক তার হিন্দু ।
ডাক নামে ডাকিলেই শুনি তন্ময় সে
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে ।

৬

শ্মশানেতে শ্যামা তার গৃহে তার লক্ষ্মী
আপদে বিপদে তার নারায়ণ রক্ষী ।
বাণী তার জিহ্বায় বুকে তার স্বর্গ
প্রাণ কাঁদে ইহাদিকে করিতে যে পর গো
শিরে তার সুরধুনী মৃত্যুঞ্জয় সে,
হিন্দু সে হিন্দু আর কিছু নয় সে ।

শেষ দান

নয়নে পড়েছে মৃত্যু কালিমা দেরী নাই বেশী আর
মোর পানে প্রিয়া তুলিল বারেক করুণ নয়ন তার।
বিদ্যুৎ হানা বিশাল নয়ন কালো টানা সেই ভুরু
নমিয়া পড়েছে চির নিদ্রায় তন্দ্রা হয়েছে সুরু।
অঞ্চলে বাঁধা চাবি রিং তার দিল মোর পদতলে
শুভ দৃষ্টির দুই যোড়া আঁখি ভরিয়া উঠিল জলে।
সে চাবি তাহার বড় আদরের ক্যাস বাক্সের চাবি
কোনোক্রমে মোর চলিত না শুধু তাহার উপরে দাবী।
এ চক পুরীর চাবি মোর প্রিয়া যতনে রাখিত কাছে
চাহিলে কখনো পাই নাই আমি ভাবিতাম কি যে আছে।
আজ দিয়ে গেল শেষ সন্দেশ সকলের শেষ দান
দানের ভঙ্গি দাতার মিনতি ব্যাকুল করিছে প্রাণ।
চলে গেছে প্রিয়া বরষ কেটেছে চোখের বরষা লয়ে,
শূন্য সায়রে ভ্রমর গুমরে পদ্ম পরাগ বয়ে।
বিজন দুপুরে উদাসী পরাণ হাতে নাই কোনো কাজ
বাক্সটি তার কাছেতে আনিয়া খুলিয়া দেখিনু আজ।
রহিয়াছে সেই আশীর্ব্বাদীর ইয়ারিং এক জোড়া
ঠাকমার দেওয়া প্রাচীন ঝুমকা লাল কৌটায় ভরা।
হার একছড়া গুরু বক্ষের গুমর মাখানো যাতে
বিয়ের নলক রূপের ঝলক জড়ানো রয়েছে তাতে।
শাঁখার সোনার পাত একটুকু কটী কাঁচ পোকা টিপ।
লাবণীর নভে সাঁজের তারকা সুষমায় হেমদীপ
তারি সাথে আছে চিঠি একতাড়া অনেক দিনের লেখা,
নব অনুরাগ রঞ্জিত লিপি আজ পড়িতেছি একা।
পড়ি আর কাঁদি কত শরতের গত উৎসব স্মরি
ঝরা সেফালির আলিঙ্গনের আমেজ রয়েছে মরি।
ছোট ছোট কথা ছোট দুখ সুখ গাঁথা আছে তার মাঝে
ফুল শয্যার শুষ্ক কুসুমে অতীত সুরভি রাজে।
যৌবন হেথা বাঁধা পড়িয়াছে দেখে মনে হয় ভুল,
কুড়ানো উপলে পাই যে আবার ঝরণারি কুলকুল।

ক্ষুদ্র ঝিনুক প্রেম-সাগরের খবর দিতেছে ভাই,
চরণ-সিঁদূরে দেবী প্রতিমার কৃপার আভাস পাই
হায় আঙ্গুরের বাক্সে আমার রাখিল কে হীরাচূর
লক্ষ্মীর ঝাঁপি করিল কে মোর বেদনায় ভরপুর।
পূজারিণী যবে খুলে দিয়ে গেল আজি মন্দির দ্বার
আছে ধূপ দীপ, বিল্বপত্র দেবী যে নাহিক আর।

চিত্রকরের ভুল

তুলিকাতে হাতটী তাহার পাকা রাজার প্রধান চিত্রকরই সেই,
ব্যবসা তাহার প্রতিচ্ছবি আঁকা অন্যদিকে খেয়াল তাহার নেই।
মর্ম্মরেরি ছবির মত দেহ, মিশেছে তায় রঙের কোমলতা
কেউ বা কবি, পাগল বলে কেহ কেউ বা বলে প্রতিভা তার কোথা ?
সমুদ্রেতে চন্দ্রোদয়ের ছবি আঁকতে রাজা দিলেন উপদেশ,
আঁকলে ছবি এমনি আজগুবি নাইক তাতে সুনীল রঙের লেশ।
অপূর্ব এক মূর্ত্তি কিশোরীর হঠাৎ যেন পেয়ে কাহার দেখা
আঁচলখানি নিচ্ছে টেনে গায়ে অধরেতে জাগ্‌ছে হাসির রেখা।
চিত্র দেখে উঠলো সভায় হাসি শিল্পীরও হায় অশ্রু এলো ছেয়ে
সবাই হাসে বিদ্রূপেরি হাসি, তারিফ শুধু দিলেন রাজার মেয়ে।
আঁকতে হবে দুর্ভিক্ষেরি ছবি, আজকে রাজার আদেশ হল তাই,
পাগল সে যে নূতন তাহার সবই চিত্রেতে কই জন মানব নাই।
বালুর বেলায় কণ্টকেরি গাছে মলিন কোরক কাঁদছে শিশির মাগি,
পুড়ছে দেহ খর রবির আঁচে কাছেই সাগর গর্জ্জে কিসের লাগি।
সভার মাঝে উঠলো হাসির রোল শিল্পী চোখে অশ্রু এলো ছেয়ে,
সবাই হাসে সবাই করে গোল, তারিফ শুধু দিলেন রাজার মেয়ে।
আঁকতে হবে নির্গুণেরি ছবি এবার নূতন উপহাসের পালা,
শিল্পী সে যে প্রেমিক এবং কবি বক্ষে তাহার জাগছে দারুণ জ্বালা।
মাঠের মাঝে একটি পলাশ গাছে ফুল ফুটেছে কাকগুলা দেয় গালি,
বাসন্তী হায় আসি তাহার কাছে সিঁথায় পরেন সাজান বরণডালি।
রাজার সভায় উঠলো হাসির ঘটা শিল্পী এবার রইল শুধু চেয়ে,
আজকে হানি চক্ষে নূতন ছটা, তারিফ দিলেন আবার রাজার মেয়ে

শিল্পী বলেন হায়রে আমি ভাবি বুঝলেনাক কেউ ত' আমার কথা,
উপহাস আর নিন্দা কেবল লভি'একটা বুকও বুঝলে না এর ব্যাথা॥
আজকে আবার নূতন হুকুম হল,দয়ার চিত্র আঁকতে হবে তাকে,
চিত্রকর যে পড়লো বিষম গোলে এবার বড় ভাবতে হ'ল তাকে।
অনেক ভেবে অনেক দিবস পরে যত্ন করে আঁকলে সে হায় কত
শিল্পী আছে চেয়ে চরণ পরে মূর্ত্তি দয়ার রাজকুমারীর মত।
সাবাস দিলে সভাসদের দলে, রাজকুমারী কিন্তু এবার বাম,
নিজের হাতে লিখে দিলেন তলে দয়া নহে প্রেম যে ইহার নাম।

গোপীযন্ত্র

এসরাজ আমি নই তা জানি, নইকো আমি সারঙ গো।
তবু আমি বাজবো খানিক করো না কেউ বারণ গো।
অসম্ভব আর আজগুবি যা,,
বুঝেও যা যায় না বোঝা,
আমি তারি কারবারী যে, জানিনাক-কারণ গো।

২

আমি ভবের পাগ্‌লা পথিক, দমকা হাওয়া বসন্তর,
উড়িয়ে যাই ফাগের পরাগ, পথ যে আমার স্বতন্তর।
চাই অচেনায় চিনিয়ে দিতে,
আনন্দকে ছিনিয়ে নিতে,
রসিককে হায় রসের মাঝে করতে যে চাই বরণগো।

৩

ধনী মানীর আদর পেতে করি নাকো প্রাণান্ত,
সহজিয়া সহজ খুঁজি সহজে পাই আনন্দ।
দু'দণ্ডেরি আলাপ ত' খুব,
বাজিয়ে যাবো গাব্‌গুবাগুব,
অকূলের কোন্ কেন্দুবিল্বে করবো গিয়ে পারণ গো।

সেই আঁখি

ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে ক্রমে সেই আঁখি তোর সেই আঁখি,
পলক পলক টান্‌তো পুলক আজকে সে হায় দেয় ফাঁকি।
শৈশবে সেই কাজল মাখা
মায়ের স্নেহের চুমায় আঁকা,
চাঁদকে দেখা, চাঁদকে ডাকা, আর কি মনে নাই না কি ?

২

এরাই কি সেই চপল আঁখি, সেই বিজলি জলভরা,
প্রেমের দেশের পান্থ পাদপ শিখ্‌লে কোথায় ছল করা
সেই যে শুভ দৃষ্টি করে
আন্‌লে পীযুষ বুকটী ভরে,
কান্না হাসির ইন্দ্রধনু আঁধার মেঘে যায় ঢাকি।

৩

এরাই কি সেই টানতো মধু, ফোটার আগে ফুল থেকে,
দূর সাগরের কণক তরী দেখ্‌তে পেত কূল থেকে।
বিনা তারের খপর দিয়ে
নি'ত চাদের পীযুষ পিয়ে
ছায়া ছবির নাচের গৃহ আঁধার হতে নাই বাকি।

৪

এ নয় ত সে তমাল ছায়া, এ নয় ত সে মেঘকরা,
কালিন্দীর এই কালোর লহর ভাসিয়ে নেওয়ার বেগভরা।
ওই ছায়া হায় মায়ার ছলে,
কমলকে হায় মুদতে বলে
সামনে ঝিঞার ফুল ফুটেছে যায় ডুবে যায় ওই চাকী।

বাঁধানো দাঁত

কোথায় গেল সবল ধবল সেই দশন,
কে আজ দখল করলে তাহার সিংহাসন।
রূপটি শুধু রাখলে কে হায় শান্ দিয়ে,
শক্তি নাহি সজীব করে প্রাণ দিয়ে।

বিধির গড়া রক্ত মাসের মন্দিরে
রাঙঝালে কি জুড়তে এলো সন্ধিরে ?
রস না পেয়ে রাঙেই কি আর বাঁধবে জোর
গড়া কোকিল বসন্ত কি আনবে তোর ?

কণক-কুসুম আটকে দিলে পরগাছে,
আসবে অলি আসবে কি আর তার কাছে ?
কোথায় পাবে সেই পরিমল সেই পরাগ
পদ্ম গড়া যায় না দিয়ে পদ্মরাগ ।

রামেশ্বরের সেতুর পাথর পড়লো যা
মুক্তা দেহের ঝালর থেকে ঝরলো যা ।
কোন সোহাগার রসান দিয়ে জুড়বি রে
উলট পালট বৃথায় করিস উর্ব্বী রে ।

আসছে বাদল মানস মরাল জানছে ভাই,
শ্বেতাম্বরার শোভার থাকা ভাঙছে তাই ।
ভাঙা বাগান যোগান দিবি কার বলে
মুখোশ লয়ে ঘর করা কি আর চলে ?

শিল্পী না হয় গড়তে পারে মর্মরে,
প্রাণ দেওয়া কি কারিগরের কর্মরে ?
কণক সীতার মূর্তি অবিকল দেখি
নির্বাসিতা সীতায় শ্রীরাম ভুলবে কি ?

একটি দ্রাক্ষালতার প্রতি

কে বসালে উষর মাঠে এমন আঙুর লতা
দিন দুপুরে জুড়ে দিলে আরব নিশির কথা ।
মশানে কে বসিয়ে দিলে নবৎ সুমধুর
মেঘনাদ বধ কাব্যে দিলে কীর্তনেরি সুর ।

মুক্তাপ্রসূ শুক্তি এনে ছাড়লে ডোবার জলে
হেমন্তেরি নীহার কেন নিদাঘ চাঁপার গলে ।

চমরী গাই গোয়াল ঘরে রইবে কেমন ক'রে
বল্‌গা হরিণ উটের গাড়ীর চাপেই যাবে ম'রে।

জাফ্রান ফুল ফুটিয়ে দেবে শেয়াফুলের গাছে,
আন্‌লে বারি গঙ্গোত্রীর জ্বালামুখীর কাছে।
আতপ চাল আর অর্ক কুসুম দূর্বা ফেলে হায়—
সূর্য্য অর্ঘ্য রচলে তুমি রজনীগন্ধায়।

যে টেনে লয় প্রেম মদিরা তুহিন কণা চুমি
আনলে তারে আতপ-তাপে কেমন ক'রে তুমি।
চিনতে নারি বিস্ময়ে তাই দেখছি শুধু চেয়ে—
রাজপুতনায় কে আনিল ল্যাপল্যাণ্ডের মেয়ে॥

আত্মশক্তি

পাহাড়ের বুকে শিকড় গাড়িয়া সগর্বে শির তুলি,
পাষাণ নিঙারি রস টেনে লই আকাশের গায়ে ঝুলি'।
সহি দাবানল, বজ্রপীড়ন,
লুফে লই আমি সূর্য্য কিরণ,
শক্ত যে আমি, নই নই কভু নবনীর পুত্তলি।

ঠেকানো মাচায় উঠায়নি মোরে রচেনি গণ্ডী কেহ,
আমি যে আঁকড়ি পান করিয়াছি ধূসর শিলার স্নেহ।
পাকদণ্ডীর আমি রে পথিক
ঝাঁপানে যে যায় তারে দিই ধিক্,
আমি যে সবল সরল বিটপী নই পরগাছা হেয়।

ভাগ্য তরণী নিজ বলে আমি লয়ে যাই গুণ টানি,
পাড়ি দিই আমি নভোনীলে একা ধ্রুব তারা নাহি জানি।
আমি কুম্ভকে নিজেরে উঠাই,
আমি রাজযোগ নিজেরে ফুটাই,
গরুড়ের মত উধাও উড়ি যে কোনো বাধা নাহি মানি।

নির্ভীক করি নিত্য লড়াই ঝঞ্ঝা ঝালাস্ সনে,
মোর সাহসের মূল ঠেকিয়াছে অমৃত প্রস্রবণে।
সুদূর উচ্চ শাখায় আমার
বন্য মধুপ চাকা রচে তার,
পরুষ যে আমি নীরস ধরায় সরস করিয়া গাড়ি

আমি যে চক্র বিষ্ণুর করে দশ দিক উজ্জ্বলি,
আমি যে সিংহ মায়ের বাহন মহাবীর মহাবলী।
আমি দুর্বল শক্তিবিহীন,
মহাশক্তিতে হয়ে আছি লীন;
অন্ধ বিল্বমঙ্গল আমি তাঁরি হাত ধরে চলি।

প্রাচীন অশ্বত্থ

গাছটি বহু প্রাচীন, অজয়ের ঠিক ধারেই ছিল, ক্রমশঃ অজয় সরিয়া আসে। গাছটি প্রতিষ্ঠা করা, সেইজন্য লোকের ভক্তির ও ভালবাসার পাত্র ছিল। অল্প দিন হইল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গুল্ম তৃণের রাজ্যে একাকী উচ্চে তুলিয়া শির,
প্রথম নমিলে প্রভাত সূর্য্য সপ্ত শতাব্দীর।
ধূসর ভূমিতে এলো শ্যামলিমা এলো ছায়া সুশীতল
এলো ভ্রমরের মধু গুঞ্জন বিহগের কলকল,
প্রথম তোমারে দেখিয়া কেহই পায়নি তখনো টের
তুমিই বহাবে মরুর মাঝারে জোয়ার বসন্তের।
শাখে শাখে হল পাখীদের বাসা তলে বিশ্রাম বেদী
দেশের চক্ষু দেখে বিস্ময়ে আকৃতি অভ্রভেদী।
বরষের পর বরষ করিলে আলো ছায়া লয়ে খেলা
পাপিয়া পিকের কাকলী শুনিলে সন্ধ্যা সকাল বেলা।
দুপুরে বাজিত রাখালের বেণু জুটিত পথিক কত
কৃষক শিশুর সোহাগ চলিত নৃত্য অসংযত।
মন্বন্তর কতই সহেছ ভীম ঝঞ্ঝার কোপ
ক্ষুধিত বিদেশী পঙ্গপালের দারুণ উপদ্রব।

নবাবের হাতী ভাঙ্গিয়াছে ডাল তলায় জেপেছে রাত,
হীন কাঠুরিয়া গোপনে করেছে অঙ্গে কুঠারাঘাত।
সাধু সন্ন্যাসী তব পাদমূলে জ্বালায়েছে কত ধূনী
বিশাল ছায়ায় পেলে আশ্রয় ফণির সঙ্গে খুনী।
তব মমতার মুক্তসত্রে অবারিত ছিল দ্বার
বাছিত না হায় শত্রু মিত্র হৃদয় মহাত্মার।
গ্রামের বৃদ্ধ পিতামহদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ
তোমার তলায় শিবিকা নামালো বরণের বধূসহ।
টোডরমলের জরিপী আমিন নিশান গেড়েছে তলে,
নিম্ন শাখায় ঘোড়া বাঁধিয়াছে নিঠুর বর্গি দলে।
অদূর মেছুর কেঁদুলীর হাওয়া বুকে লেগেছিল ঠিক,
শ্রীচৈতন্য বাবা নানকের তুমি সমসাময়িক।
চলে গেছ তুমি ধূ ধূ প্রান্তর ধূ ধূ করে অনিবার
চারিদিকে ক্ষীণ কাশের শীর্ষ দীনতা বাড়ায় তার।
আছে ঝটিকায় প্রবল স্বনন রোদের তীব্র জ্বালা,
নাহি আর নাহি ধূসর বেলায় তোমার ধর্ম্মশালা।
যাও তরু তুমি তোমার লাগিয়া ঝরে পড়ে আঁখি নীর,
যাও মঙ্গল চামর ছত্র কানন রাজশ্রীর।
যাও তাপিতের দয়াল বন্ধু, সবল সরল প্রাণ,
যাও অতীতের স্তম্ভ অরুণ প্রকৃতির মহাদান।
যাও সুন্দর সাক্ষী সুহৃদ, চির বরেণ্য ধন,
যাও মহাযোগী, যাও আশুতোষ, হে চিত্তরঞ্জন।
তরুর মধ্যে অশ্বত্থ যিনি, বড় যাঁর কেহ নাই,
তাঁরি সাথে তুমি মিশে যাও পুন, তাঁরি বুকে হ'ক ঠাঁই।

বাউল

বিচিত্র তার আঙরাখাটা দেখে—পথের লোকে অবজ্ঞাতে হাসে,
মাথায় চূড়া লম্বা দাড়ি রেখে, নূপুর পায়ে ভিক্ মাগিতে আসে।
ঘুঙুর গাঁথা একতারাটি নিয়ে, ঘুর পাকে সে ভঙ্গী ক'রে নাচে,
সুরটি তাহার নিজের মত খেপা—আপন ভাবে ভোর হ'য়ে সে আছে।

খেয়াল নাহি অন্য কথা ভাবার, রস ভিয়ানে এতই মাতোয়ারা,
রাগের পথে তাহার আনাগোনা সংসারী সে সকল বাঁধন হারা।
সমাজের যে ধার ধারে না কিছু, কলঙ্ক হার গলায় পরে কিনি,
শুভক্ষণে নষ্টচন্দ্র দেখে সে হয়েছে গৌর কলঙ্কিনী।
রসের নেশায় বুঁদ হ'য়ে সে ফেরে হয় সে পাগল রাই কানুরই নামে,
সঙ্ দেখায়ে পাথেয় তার করে, কুঞ্জ কেনে প্রেমের ব্রজধামে।
বনের কপোত চরতে আসে গাঁয়ে, নীড় বেঁধেছে শ্যাম তমালে ও যে,
উধাও চকোর সুধার ক্ষুধায় বিভোর জলায় থাকে চাঁদকে নভের খোঁজে।
নয় সে কমল মূর্ত পবিত্রতা,নয়কো জবা রাঙ্গা পায়ের আলোক,
কদম্ব সে রসের কেলি কদম, জঙ্গলের সে জমাট বাঁধা পুলক।
তোমরা তারে ক'রবে কর ঘৃণা, সে যে সকল নিন্দা ঘৃণার অতীত,
সন্ধানী সে পতিত-পাবনেরি তোমরা তারে ক'রবে কর পতিত।

দরিদ্রতা

জানি তুমি সব গুণরাশিনাশী সকল শক্তি হরা,
করঙ্গ তব দুখীর রক্ত আঁখির সলিলে ভরা।
অসীম ক্ষমতা মমতা বিহীন হীরা গলে যায় তাপে,
ভীম তাল তরু মাটিতে হেলায় ক্ষীণ অঙ্গুলি চাপে।
হিমের নিলামে কমল ফেরার সলিল প্রাসাদ ছাড়ে,
গঙ্গা চলেন বহি অঙ্গার রত্নাকরের দ্বারে।
গুণী বট তুমি একথাও জানি একথাও যায় শোনা,
দুখের আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে উজ্জ্বল কর সোনা।
তুমি শ্রীহরির বাহন গরুড় অমৃতের অধিকারী,
মহনীয় তুমি, সহনীয় তুমি সুহৃদ ও সরল ভারী।
বাঘের মতন তুলে নিয়ে যাও না কেঁদে রহিতে পারি,
টানিবে নোংরা কাঁটাবন দিয়ে সেইটে সহিতে নারি।
সবল মরালে শর বিঁধে মারো সহিতে পারিবে সেটা,
বিমল পালক ময়লা করো না লাগায়ে কাঠির আঠা।
যুথিকারে তুমি খাতক করো না হীন সেয়াকুল কাছে,
পাপিয়ারে তুমি চাতক করো না কবি এ করুণা যাচে।

ছোটর দাবী

ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবী ছাপিয়ে চলে,
রেখা টেনে ছোটর গমন বড় ধরা কাঁপিয়ে চলে।
অতি বড়র তুচ্ছ যাহা
ভালবাসি আমরা তাহা,
বড় বহে দাপিয়ে আকাশ ছোট যে বুক ব্যাপিয়ে চলে।

২

তরুরে তার হয় না স্মরণ কুসুমটিকে ভুলতে নারি,
ভুলতে পারি হোলির রাতি ফাগের স্মৃতি তুলতে নারি।
ভুলি সাগর, মুক্তাটি তার
করে রাখি গলার যে হার
ছোটর অনুরাগের রাখী আয়াস করে খুলতে নারি।

৩

রামায়ণের অনেক ভুলি রাবণ রাজার চিতার সাথে,
ভুলতে নারি রামের মিলন গুহক গৃহে মিতার সাথে
ভুলি ঘটা অযোধ্যারি,
অশোক কানন ভুলতে নারি,
সরমার সে সদয় প্রীতি অভাগিনী সীতার সাথে।

৪

ভুলি শ্যামের ব্রজের লীলা কংস বধের গৌরব হে,
ভুলায় কুরু ক্ষেত্র গোটা বিদুর খুদের সৌরভ হে।
বাঁশরী আর শিখীর পাখা,
সুদর্শনে দেয় যে ঢাকা,
সুদামারি সৌখ্যেতে ম্লান পাণ্ডব এবং কৌরব হে।

৫

ভুলতে পারি সারনাথ এবং নালান্দারি ধ্বংসটিকে
মনে পড়ে বুদ্ধদেবের বুকে তাপিত হংসটিকে
লক্ষ কোটি মূর্ত্তি তাঁহার
ইহার কাছে মানছে যে হার,
পূর্ণতা দেয় বিরাট করে ক্ষুদ্র তাহার অংশটিকে।

৬

মহামায়ায় কেমন মানায় সিংহ এবং সিংহাসনে
রামপ্রসাদের বেড়ার ধারে দেখেই যে হয় হিংসা মনে।
বাদ্য ঘটা লক্ষ বলি
অলক্ষেতে আমরা ভুলি,
বক্ষে জাগে দৃষ্টি মায়ের মিষ্ট হাসি বিম্বাননে।

৭

আদর করি শিখীর চেয়ে চূড়ার শোভা শিখীর পাখা,
গোটা রসাল কানন চেয়ে ঘটের ছোট আমের শাখা।
খনি রেখে মণিই তুলি,
মধু পেয়ে ভ্রমর ভুলি,
মায়ের কৃপার অপরাজিতায় কৃপাণ যে হয় তিমির মাখা

হয়তো

হয়তো আমার এ পথে আর হবে নাকো আসা,
দুধারে যাই রোপণ করে বুকের ভালবাসা।
ধূলার এ পথ যাই ভিজায়ে,
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে,
অমর করে যাই রেখে যাই ক্ষণিক কাঁদাহাসা।

২

সরায়ে দিই পথের কাঁটা, ছড়ায়ে যাই ফুল,
নিকায়ে যাই স্নেহের বেদী ছায়া তরুর মূল।
মমতা মোর পথের কীটও
পায় যেন হায় পায় যেন গো,
বন বিহগের কণ্ঠে আমার অমর হউক ভাষা।

৩

ভক্তিবিহীন সম্বলহীন দুঃখী অপকট,
শক্তি নাহি গড়তে দেউল সান্ত্বনারি মঠ।
দরদী এই দীনের হিয়া,
নিঝরে যাক প্রণয় দিয়া
হয়তো কোনো তৃষিতেরি মিটতে পারে তৃষা।

৪

জানি না এ মানব জনম আবার পাব কি না।
নিরুদ্দেশের যাত্রী রাখি প্রণয় রাখীর চিনা।
অনুভূতির ছিন্ন সূত্র
যাই রেখে যাই যত্র তত্র,
পারবে না যা করতে পরশ কালের কর্ম্মনাশা।

৫

হয়তো কারও হরবে ক্ষুধা আমার তরুর ফল,
স্নিগ্ধ কারও করবে দেহ অশ্রু দীঘির জল।
ঝরা ফুলের গন্ধে ওরে
হয়তো কেহ স্মরবে মোরে,
ভাবুক পথিক বলবে হেসে লোকটা ছিল খাসা॥

পথের দাবী

দেখিব বলিয়া কথা দিয়া কোথা, না দেখে এসেছি চলে,
দিতে পারি নাই ভুলিয়া গিয়াছি কাহারে কী দিব বলে ;
আজ দুর্য্যোগে ব্যথা পাই প্রাণে,
তা'রা যেন আসি হাত ধ'রে টানে,
বুঝিতে পারিনে এবার তাদের ফিরাব কিসের ছলে।

২

পথে দেখেছিনু হা'ঘরে বালক কাঁপিছে দারুণ শীতে,
বলেছিনু তারে বাসায় যাইতে ছিন্ন বসন নিতে।
সে গেল ফিরিয়া না পেয়ে আমায়,
আজি তদবধি খুঁজে মরি তায়,
আজি এ বাদলে ম্লান মুখ তার উঁকি ঝুঁকি দেয় চিতে।

৩

ধুনি জ্বালিবার কড়ি দিব বলি' গিয়াছিনু আমি ভুলি',
রাত্রে সাধুর ক্লেশ হ'ল কত মন করে বলাবলি
আকাশেতে আজ শুনি ডাক তার,
সরমেতে মরি মরম মাঝার,
চোখে আসে জল, ক্ষমা মাগি আমি করিয়া কৃতাঞ্জলি।

৪

রেলে যেতে ক'বে লয়েছিনু ফল, দিলাম পয়সা ছুঁড়ি
কোথায় পড়িল ভিড়ের মাঝারে খুঁজিতে লাগিল বুড়ী,
গাড়ী চ'লে এলো, জানিনে তো আহা
গরিব মালিক পেলে কি না তাহা,
আজ মনে হয় সে রয়েছে চাহি নামায়ে ফলের ঝুড়ি।

৫

দিতে ভুলে গেনু দূর যাত্রীর চেয়ে লওয়া পাখা খানি,
কোথায় পাঠাবো জানিনা ঠিকানা রেলে জমা দিনু আনি।
আজি সে আসিয়া পাখা চায় যেন
বলে ফিরে তুমি দাও নাই কেন,
বুঝিতে পারিনে সামলাব কিসে এত বড় রাহাজানি।

৬

মন্দির দ্বারে মালা দিতে এলে লই নাই তাহা গলে,
ভিখারী বালকে ফিরায়ে দিয়াছি কোথায় কু-কথা বলে',
কোথা ব্যথা দেখি ঝরে নাই আঁখি,
কোথা কী অর্ঘ্য আসি নাই রাখি',
পূজ্যে কোথায় পূজিতে ভুলেছি ভকতির শতদলে।

৭

দীর্ঘ পথেতে পরিচয় হ'ল যে সব সুহৃদ্ সনে,
লওয়া হয় নাই খবর তাদের বেদনা জমিছে মনে।
আজ জেগে ওঠে তাহাদের স্মৃতি,
অযাচিত কৃপা, অযাচিত প্রীতি,
হায়, এ বেতার বুকের সেতারে বাজিছে ক্ষণে ক্ষণে।

৮

স্মৃতি সৌরভ বুকেতে ধরিয়া সভয়ে আমি যে ভাবি—
পথ ফুরাইল মিটিল না কই এখনো পথের দাবী।
এদে'রি লাগিয়া হয়তো আবার
পেতে হবে ক্লেশ আসা ও যাবার।
কিরাতের দাবী না মিটায়ে ঘরে আনিলাম মৃগনাভি॥

ফুলের চিঠি

আজকে আমার মেঘের মত ঘুরতেছিল মন,
মাঠের মাঝে হঠাৎ পেলাম এ কার নিমন্ত্রণ।
ফুল ভরা এই করবীতে
পড়লো আঁখি আচম্বিতে,
একেবারে পথিক বধূর আঁখির আলাপন।

২

পান্থ আমি কোথায় যাব, কোথায় আমার ধাম,
না সুধায়ে হস্তে দিল মোড়া রঙ্গিন খাম।
কেবল চাওয়া, কেবল হাসা
বুঝবে না সে আমার ভাষা
কেমন করে নিই সুধায়ে তাহার প্রিয়ের নাম।

৩

কুসুম বধূর প্রীতির লিপি বহে বুকের মাঝ
পার হয়ে হায় ভূধর নদী ঘুরছি আমি আজ।
মেঘ পারে না পথ দেখাতে
কি আছে যে তার লেখাতে
বুঝতে নারি পরের চিঠি খুলতে লাগে লাজ।

৪

আল্তা রাঙা পাতলা খামের বুকটি হতে হায়,
স্বর্ণ আঁখর সজীব হয়ে বলতে কি যে চায়।
বন দুলালীর হেম মরালে
কোন মানসের তীর স্মরালে
পদ্ম বুকে বদ্ধ ভ্রমর গুঞ্জনে মাতায়।

কবির দুঃখ

ভালবাস তারে সে ভালবাসিবে ঘৃণা কর নাহি রাগ গো,
দীন ভেবে দয়া দেখাতে এসোনা তাতে পায় বড় দাগ গো।
অনশনে রয় তাতে দুখী নয় ধনীর দুয়ারে যায় না,
দয়া করে মান কি করিবে দান কবি সে করুণা চায় না।

দুখ সাগরের সে যে গো ডুবারী লোভ তার শুধু মুক্তায়,
শঙ্খ শামুক লইতে বিমুখ দংশিলে নাহি দুখ তায়।
সে যে জগতের পাগল হরিণ মানে নাক কোনো তর্ক,
সুদূর বাঁশীতে প্রাণ আনচান বুক পেতে লয় শর গো।
টুকরা ফিতার করে না যে লোভ চায় না রাজার পাঞ্জা,
রাজার রাজার কৃপার ভিখারী তাঁরি দাস হতে বাঞ্ছা।
কোথায় কে তার নিন্দা করিছে করিছে কে তায় তুচ্ছ,
ক্ষেপা খেয়ালীর খেয়াল নাহিক দৃষ্টি যে তার উচ্চ।
ঘর নাই বলে ঘৃণা কর পিকে রূপ নাই কর দুঃখ,
আম মুকুলের গন্ধে পাগল গান গাওয়া তার সুখ গো।
কখন মাধব কোন দিকে আসে সেই সন্ধানে ফিরছে,
তোমরা কজন ভাবিয়া আকুল রচিল না কই নীড় যে।
পেচক তাহারে নির্ব্বোধ বলে দরিদ্র বলে গৃধ্র,
বিজ্ঞ বাদুড় চক্ষু মুদিয়া খুঁজিছে তাহার ছিদ্র।
সে তখন বসি মাধবী কুঞ্জে কণ্ঠের সুধা ঢালছে,
চিত্রার উষা জাগিছে সে ডাকে সরমে কপোল লাল্‌চে।
সুখী তার সম কে আছে ধরায় কাহাঁর এমন ভাগ্য।
বিদুরের খুদ হরি তার সনে নিজে করে লয় ভাগ গো।
মানের কাঙালী যশের ভিখারী নামের ব্যাপারী নয় সে,
ভগবান ছাড়া দুনিয়ার মাঝে করে না কারেও ভয় সে।
দৈত্য দানার ভ্রূকুটি কুটিল বৈরীর ষড়যন্ত্র,
গ্রাহ্য করে না বুকে যে পেয়েছে বাণীর অভয় মন্ত্র।
দীন সেই জন যে জন তাহারে দীন বলে মনে ভাব্‌বে,
কোন জন হায় পুন্‌কে কাঠায় তাহার পুলক মাপ্‌বে।

কবি লেখে কেমন ?

কবি তার কাব্য লেখে বিটপী ফুল ফুটায় যেমন,
ডুবারী সাগর জলে মুক্তা তোলে মুঠায় যেমন।
জ্যোতির্ব্বিদ যেমন ধারা
হেরে হায় নূতন তারা,
ধীবরে মাছের টানে পুলকে জাল গুটায় যেমন।

২

বরষা যেমন করে জমায় তাহার মেঘের মেলা,
দীঘি তার কমল হেরে যেমন ধারা হয় উতলা।
পোষা তার পায়রা ঝাঁকে,
বিলাসী যেমন ডাকে,
তৃষিত চকোর ডেকে চাঁদকে তাহার উঠায় যেমন।

৩

মৃতেরে জিয়ায় যেমন উপকথার সোনার কাঠি,
লোহারে পরশ পাথর কণক করে যেমন খাঁটি।
রেশমের কীটগুলি হায়
যেমন ওই তুঁত পাতা খায়,
আপনার পরাণ দিয়ে সোণার স্থতা জুটায় যেমন।

৪

ফাল্গুনী বাঁধলে যেমন শরের জালে ওই পারাবার,
বাঁধে সে স্থরের সেতু কাল সাগরের এপার ওপার।
শবে শিব উঠেন ধীরে
ভস্ম হয় বিভূতিরে,
সাধক তার আরাধ্যেরি চরণ তলে লুটায় যেমন।

তূণীর

বিচারকের বিচার

(সত্য ঘটনা, প্রসিদ্ধ উকীল মৌলভি ইয়াসিন সাহেবের নিকট গল্পটি শুনিয়াছি।)

জবর হাকিম করেন বিচার বিচার আসনে বসি',
আইনের তিনি বেসাতি করেন প্রতি গ্রামে গ্রামে পশি।
রেলেতে চড়িয়া দেন না মাশুল লোকে নানা কথা কয়
দ্রব্য বেচিয়া মূল্য চাহিলে দেখান জেলের ভয়।
শিষ্ট দমন দুষ্ট পালন করিতে নিপুণ ভারী,
তোষামোদে তিনি পুরা ওস্তাদ মুখে আছে ভূয়া জারি।
অবহেলে কারও ট্যাক্স বাড়ান কাহারো মারেন রুটি
সাধু চোর হয় বিচারে তাঁহার করে মাথা কুটাকুটি।

এস্তাজ মিঞা গ্রামের মোড়ল সাধু সজ্জন অতি,
কি কারণে হায় হাকিম চটিল সহসা তাঁহার প্রতি।
হুঙ্কারে তাঁর করেনিকো ভয় করেছিল প্রতিবাদ,
যেমনে হউক হাকিম এবার মিটাবে তাহার সাধ।
মামলায় এক আসামী হয়েছে এস্তাজ মিঞা বুঝি,
এত দিন পর ব্যাঘ্র তাহার শীকার পেয়েছে খুঁজি।
হাত কড়ি দিয়া মনের সাধেতে ঘুরাইল সারা গ্রাম,
লাঞ্ছনা তার বহুৎ করিল বিধি যেন তারে বাম।

হইল ফাটক তিন মাস তার হাকিমের বাহু বলে,
আপীলে হেলায় খালাস পাইল নিজের পুণ্য ফলে।
এস্তাজ থাকে মরমে মরিয়া বিনা দোষে জেল খাটি,
আল্লার পরে এত নির্ভর একেবারে হ'ল মাটি।
এক মন হয়ে পড়ে সে কোরাণ জলে উঠে চোখ ভিজে,
বিচারের কথা বুঝিতে পারে না ভাবে এক মনে কি যে।

দুর্ব্বল হিয়া আশা না পাইলে কেমন করিয়া বাঁচে ?
কাঁদে আর বলে, আল্লা আছেন এখনো আল্লা আছে।
গেছে দু বরষ হাকিম এখন বদলী হয়েছে কবে,
ভিতরের তার রোগের বীজাণু কত দিন চাপা রবে।
তাহার ঘুসের গোপন কাহিনী পশেছে সবার কানে,
ধর্ম্মের ঢাক আপনিই বাজে চির দিন লোকে জানে।
দীর্ঘ বিচারে হল হাকিমের পুরা দু বছর জেল
পাপীর বুকেতে এত দিন পর পড়িল শক্তিশেল।
আজিকে আপীল দাঁড়ায়ে আসামী ভয়ে ঠেকে পায় পায়,
পূর্ব হুকুম বাহাল রহিল প্রকাশ হইল রায়।
বসিয়া পড়িল অসাধু হাকিম সংজ্ঞা লভিয়া শেষে,
পুতুলের মত পুলিশের সাথে চলিয়াছে দীন বেশে।
সুমুখে তাহার দাঁড়ায়ে কে ওই সেলাম করিল ধীরে
'এস্তাজ সেখ' বলিয়া কয়েদী দাঁড়াল চমকি ফিরে।
আভূমি আনত সেলাম করিয়া কহে এস্তাজ মিঞা
হুজুর আজিকে হ'ল সাক্ষাৎ যেতে এই পথ দিয়া।
দেখালেন দিয়া চক্ষে আঙুল ভুলে যাই মোরা পাছে,
আল্লা এখনো আছেন হুজুর এখনো আল্লা আছে।

সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত

কীট বলে, 'আমি যেথা সেথা যাই, গুটি পাকাইয়া মরি,
মানুষের লাগি' রেশম তসর গোটা প্রাণ দিয়া গড়ি।
কপাল মন্দ নাহিকো সন্দ কার্য কেবলি বেঁধা,—
পাতা খাই বটে, যেই পাতে খাই সে পাত করিনে ছেঁদা'

পশু বলে, 'আমি বহি নর-নারী খাটি তাহাদের লাগি,
গায়ের পশম দান করে দিই প্রতিদান নাহি মাগি।
আবার কখনো বাগে পেলে তারে ঘাড় মটকায়ে মারি,
প্রাণ নিই বটে, ধন মান তার লইনে কখনো কাড়ি।'

পাখি বলে, 'আমি গান গেয়ে ফিরি, পিঁজরায় রাখে ধরি,
নির্বোধ নই, যত্ন করিলে পড়াইলে আমি পড়ি।
সুরটা কিন্তু পালটাতে নারি দিক্ না যতই টাকা—
এ সব স্বত্ব সংরক্ষিত মানুষের তরে একা।'

উকিলের মমি

Mr. Sampson Brass এর প্রতি। ইনি Dickens এর Old Curiosity Shop এর একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইনি উকিল ছিলেন। তাঁহার বংশ এখনো লোপ পায় নাই।

পাঁকাটির ঠ্যাঙে ইঁদুরের মাথা
চেহারাটি কিসে ডিগমিগে
Brobdignag Dicken-এর দেশে
দেখতে পেলাম এ পিগ্‌মি (Pigmy) কে
আইনি ব্যাভার গুরু শঠতার
রঙ ঢঙে বল কম কিহে ?
খাসা কড়কায় চাষা ভড়কায়
গড় খাই বসে জমকিয়ে !
কাঞ্চন লোভে বঞ্চনা করে
অর্থই ভাবে সার মনে,
কণ্ঠের বাঁকা 'হারমণি' গুণে
হাঁড়িচাঁচা যায় হার মেনে।
পিণ্ডি উদোর ঘাড়েতে বুধোর
চাপানো ভাবে না নিন্দারি,
এক সাথে এযে সর্প শূকর
বর্গী ঠগী ও পিণ্ডারী।

সোলার সাপ

সুমুখে ওটা কি চমকিয়ে দেখি কামড়াবে নাকি ফোঁস ক'রে,
কি ভীষণ ইস্ এ যে আশীবিষ মুখে পা দিতাম হুস্ করে।
কাছে গিয়ে দেখি আরে ছি ছি একি ফণা গড়া এর অভ্যরে,
সোলা দিয়ে গড়া দেহ রঙ করা ঘাবড়ায় যত বর্ব্বরে।

বাসুকী এ নয় করিয়ো না ভয় ধরে না ধরণী মস্তকে,
রয় না এ হরি বেষ্টন করি নীলকণ্ঠের হস্তকে।
নারায়ণ লাগি রচে না শয্যা লাগে না সাগর মন্থনে,
হউক ভয়াল নাহিক ক্ষমতা গলে নাগপাশ বন্ধনে।
লখিন্দরের লোহার বাসরে নাহিক যাবার শক্তি রে,
'মনসা-ভাসানে' এর গান কেহ গাহিবে না করি ভক্তি রে।
জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞে ইহারে কেহই ডাকবে না,
গরুড় কখনো এ গড়া সাপের ঘরেরও খপর রাখবে না।
নকুল ইহারে করবে না তাড়া শিখী কাছে এর ভিড়বে না,
সাপুড়েও হায় ভেঁপু বাজাইয়া এরে কাঁধে করে ফিরবে না।
ডমরুর রবে নাচে না এ অহি হলাহল নাহি দন্তে রে,
ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়িতে হয় না বিষ রোজাদের মন্তরে।
যত পারে আহা ছো মারুক ওটা খেলাক্ উহারে উচ্ কিয়ে,
ও-ফণা ভাঙ্গিতে চাহিনে মন্ত্র আপনিই যাবে মচকিয়ে।

কোষ্ঠীর রাজা

কেন্দ্রেতে রবি তার, শনি-গ্রহ মিত্র
কোষ্ঠীতে দেখ ভাবী ভাগ্যের চিত্র।
তলোয়ার হবে তার সাত হাত লম্বা
নর্ত্তকী হবে এসে উর্ব্বশী রম্ভা।
হাতি ঘোড়া হবে তার, হবে তার কিস্তি
আসিবেন জলাধিপ কাঁধে লয়ে ভিস্তি।
এক সাথে দিলে রায় গণকের গোষ্ঠী
রাজা তারে করে দেবে কাগজের কোষ্ঠী।
হবু রাজা দাবা বড়ে টিপিতেই ব্যস্ত
হেমতরী কাগজের বন্দরে ন্যস্ত।
ভাষা দিয়ে আশা দিয়ে কে করিল ভঙ্গ
রাজাসন উঠে গেল করে এ কি রঙ্গ।
রে গণক জুয়াচোর! মধু হ'ল নিম্ব
অশ্ব যে পলাইল রেখে তার ডিম্ব।

চোর-কাঁটা

কি ল্যাটা তুই চাস লাগাতে চোর-কাঁটা মোর বল্‌রে,
প্রকাশ করে বল আমারে আর ছেড়ে দে ছলরে।
ছুটছি আমি কাঁটার বনে,
তোর ফোটাটাই জাগছে মনে,
রোপণ করা হাতের ফসল নাই গোপনে ফলবে।

২

প্রথম দেখে ভেবেছিলাম কতই পাব সৌরভ
কনকচুরের বোয়ালি তুই হ'বি মাঠের গৌরব।
নয়ত হ'বি দাদ খানিরে,
'দুধ-কলমার' আধ খানিরে,
ন'স্ শ্যামা ঘাস তোর মূলেতে, বৃথায় সেচা জলরে।

৩

অন্ততঃ তুই দূর্ব্বা হলে পেতাম আশীষ কর্ত্তে,
'মুতা' হলে পে'ত না হয় গোধনগুলা চরতে।
এ দুঃখ আর কারে না কই,
শেষে হ'লি চোর-কাঁটা তুই,
ভাবতেও হায় আজকে আমার নয়ন ছল ছলরে।

পশু পঞ্চবিংশতি

মুগ্ধ হয়ে বলছে ভেড়া ডাকটি শুনে গাধার
ওস্তাদী ওই কালোয়াতী কণ্ঠ শোনো দাদার।
ছাগল বলে সিংহে পেলে চাঁটিই মারি আমি
কোথায় দাড়ি? মেয়ের মতো চুল রাখা বাঁদরামি
কইছে বিড়াল কুরঙ্গের পাছে পিছন ফিরি
ওতেই গরব আ-মরি ও চোখের কিবা ছিরি।
হাড়গিলা কয় টিয়ার দেহ বেয়ারা যে বড়
কিবা গলা একেবারে ঘাড়ে মুড়ে জড়।
ভালুক বলে নৃত্য করে হয় না সুখী মন
অরসিকের মধ্যে এযে রসের নিবেদন।

উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বলছে কাকের পাল
চুপ কর ভাই চুপ কর ভাই আজকে হরতাল।
পঙ্গপাল কয় বসে খেতে দিচ্ছে না তো কেহ
কাজেই এখন আমাদিগের ধর্মঘটই শ্রেয়।
পাউষেরি মীন শুনিয়া মেঘের গুরু গুরু
বলছে হউক আড়ার সাথে সত্যাগ্রহ সুরু।
গৃধ্র এক শকুনি চিল ভাগাড় হয়ে পার
খসড়া রচে অহিংসা ও শান্তি স্থাপনার।
মেড়ায় মেড়ায় লাগলো লড়াই নেকড়ে হেসে ক'ন
আয় তোদিকে শিখিয়ে দিই স্বায়ত্ব-শাসন।
বোলতা বলে ভীমরুলেরে চলছো কোথায় মিতে
মিতে বলেন Anti-venom ইঞ্জেকসন দিতে।
শকুনি কয় ইচ্ছা ছিলো চন্দ্রলোকে যাবার
ফেলে গেলাম দূরবীণটা তাই নামতে হলো আবার।
ঝিঁঝিঁ শুধায় শশক কেন কানটি খাড়া করে
শশক কহে 'রেডিও' গান হচ্ছে আমার ঘরে।
বৃদ্ধ চিতা ব্যাঘ্র দেখে মেষের শিশু তাজা
বলে স্নেহে বুক ভরিলি আয়রে কাছে বাছা।
ভেক বলিছে সাপ মরিলে করি' জীবন বীমা
করতে যাবো এবার আমি ব্রজ-পরিক্রমা।
ভোঁদর বলেন মৎস্য ্যাও সৃষ্টি করেন ধাতা
আকাশ হতে ছোঁ মারে চিল একি নৃশংসতা।
নড়তে নারে ধলা কুকুর বলছে হাতী দেখে
ঘাস খেকো জীব প্রাণটা নিয়ে পালা এখান থেকে।
জলহস্তীটা রাজহস্তীকে ডেকেই ধীরে কন
তোমায় দিলাম ভারত, রেখে এ হ্রদ দ্বৈপায়ন।
কাছিম বলে মনে পড়ে কূর্ম পুরাণ লেখা
দুঃখে নিজের আড়ালে রই, দিই না বড়ো দেখা।
বরাহ কয় ধরেছিলেন এরূপ ভগবান
কি ঘোর কলি, আমারও আর নাইক সে সম্মান।

পানকৌড়ি কয় শিখি বেড়ায় লেজের গুমর করি
ইচ্ছা করে লজ্জাতে এই জলেই ডুবে মরি।
মাছরাঙা কয় চতুর্দ্দিকে পবিত্রতার অভাব
ধর্মে কর্মে ঘন ঘন স্নানটা আমার স্বভাব।
মৎস ধরে আনন্দেতে শুশুক ডেকে বলে
ঢালছি দেহ মরণটা হয় যেন গঙ্গার জলে।
হংস কহে গরুড় পাখি কিসের কর গুমর
আমার পাখার আঁচড়েতে নরকে করি অমর।
কোকিল বলে বাবুই তুমি শিল্পী চমৎকার
বাবুই বলে প্রাণের কবি লও হে নমস্কার।

কবি ও নায়েব

(একজন বড় ষ্টেটের নায়েব অহঙ্কার ভরে একজন কবিকে চাকুরি ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। কবি এখন ধনে মানে দেশ-বিখ্যাত, নায়েব নগণ্য।)

কবি যখন কাব্য লেখেন নায়েব লেখেন খোকা
নায়েব ভাবেন অলস তারে, কবি ভাবেন বোকা।
কষ্টে কবি কাব্য ছাপেন রিক্ত ঝুলি ঝাড়ি
নায়েব তখন গয়না গড়ান দমে বেজায় ভারী।
কবি দেখেন ফুলের স্বপন, নায়েব ভাবেন টাকা
মাইনে চেয়ে পাওনা বেশি, কাব্য সুধা-মাখা।
কবি করেন পুষ্ট হৃদয় নয়ন-জলে প্রেমে
নায়েব বিবেক তুষ্ট করেন তোষামোদে হেমে।
প্রবলেরই মেষ তিনি যে, দীনের ফণি-ফণা,
উৎপীড়িতের বন্ধু কবি, হয় না বনি-বনা।
কবি তাঁরে সদয় হ'তে নরম হ'তে বলে
মোষের পিঠ যে হয় না নরম যতই ঘৃত দলে।
ঘুটিং থেকে রস নিঙাড়ে কোথায় এমন কল ?
কবির কাতর সব মিনতি যায় যে রসাতল।
নায়েব শেষে কবির সাথে জুড়লে আড়াআড়ি
ফিঙের সাথে স্ব-ইচ্ছাতে কোকিল গেল হারি।

কচ্ছপেরা ঘাড় নাড়িল, ভেক লাগাল গীত
ব্রজবেণু হার মানিল পাঁচনটার জিৎ।

জেনো নরের আকার ধরে দৈত্য দানা আছে,
নানান রূপে দুঃখ দিবেই তারা,
মিথ্যা গড়ার যন্ত্র ওরা, হিংসা পিয়েই বাঁচে,
মন যে তাদের সর্ব-বিবেক-হারা।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি,
স্তব্ধ থাক' দেখলে লোহিত আঁখি,
দেবতা দানব যা খুশী তাই পারবে তুমি হতে,
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

ভদ্রবেশী ভণ্ড ডাকাত আগ্‌লে অনেক ঘাঁটি
মিথ্যা প্রচার করবে গলার জোরে,
কাগজ কালীর কালীর পা'কের লম্ফ পরিপাটি
হয়তো নিতুই চলবে তোমার দোরে।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি,
পালাও যদি অন্যে ফেলে রাখি,
দেবতা দানব যা খুশী তাই পারবে তুমি হতে,
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

দৈত্য তাহার দীর্ঘ দশন দম্ভে বাহির করে,
ইচ্ছা তোমায় কড়মড়িয়ে খাবে,
পিশাচ আছে বন্ধুবেশে গোপন ছুরি ধরে,
ভাবছে তোমায় কখন বাগে পাবে।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি,
পাপের সহিত সন্ধি কর ডাকি,
দেবতা দানব যা খুশী তাই পারবে তুমি হতে,
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

আসবে বিপদ বাঘের মতন, হরির করুণাতে
মেষের মতো হতেই হবে তাকে,

দুঃখ আছে কষ্ট আছে, দুঃখ কিবা তাতে,
বাইতে গেলেই পড়বে তরী পাকে।
কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি,
আপনারে আপনি দেবে ফাঁকি,
দেবতা দানব যা খুশী তাই পারবে তুমি হতে,
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।

যদি

যদি বশে তুমি রেখে দিতে পার চঞ্চল তব চিত্তকে
ন্যাস বলে যদি ভেবে নিতে পার তুমি তব সব বিত্তকে,
সন্তোষে যদি বহে যেতে পার হয়েছে যে ভার অর্পিত,
সম্পদে যদি বহিরন্তরে নাহি হও তুমি গর্বিত,
প্রেমে আপনার করে নিতে পার যদি এ নীরস পৃথ্বীকে,
বিফলতা মাঝে বয়ে নিতে পার যদি চিরাগত সিদ্ধিকে,

সমভাবে যদি সহে যেতে পার তুমি সম্মান লাঞ্ছনা,
বঞ্চিত হয়ে যদি তুমি কভু, অপরে না কর বঞ্চনা,
ভোগে উন্মুখ, ত্যাগে উদগ্রীব সত্যেতে চিরবিশ্বাসী
ধরণীর রস মধুপের মত যদি নিতে পার নিঃশেষি,
অভাবেও তুমি ভাবের অলকা গড়ে নিতে পার বক্ষেতে,
সুখের মাঝারে হরির লাগিয়া যদি ধারা বহে চক্ষেতে,

না হয়ে ঘৃণিত ঘৃণা সহ যদি নিন্দা না কর নিন্দুকে,
বড় করে যদি নিজ চোখে দেখ নিজ ক্ষীণ দোষবিন্দুকে,
ছোট করে যদি দেখ তুমি শুধু আপন সুনাম সুখ্যাতি,
আপনার যদি করে নিতে পার অপরের ক্লেশ দুঃখাদি,
মুক্ত গৃহেতে ঘুমাইতে পার যদি বিদ্রোহ-বিগ্রহে,
বিবেকের বুকে জুড়াইতে পার যদি অপমান নিগ্রহে,

অত্যাচারীকে বাধা দিতে পার, পাহাড়ের মত নির্ভয়ে,
আতুরের তুমি পান্থপাদপ যদি করুণার ক্ষীর বহে,
এক সুরে যদি বেঁধে নিতে পার ভাব ভাষা আর কর্মকে,
ধরা হতে যদি বড় ক'রে তুমি দেখ মনে প্রাণে ধর্মকে ;
বুঝিবে তখন মানুষ হয়েছ ঝরিছে করুণা মস্তকে—
পরশমাণিক এসেছে সুমুখে পেতে দিয়ো দুটী হস্তকে।

স্বর্ণসন্ধ্যা

স্বর্ণসন্ধ্যা

সন্ধ্যা—জীবন-সন্ধ্যা আমার—স্বর্ণ-সন্ধ্যা হোক
রবির কিরণ মিলাবার আগে উঠুক চন্দ্রালোক।
গগনে ভূতলে কনকের রাগ—
পুঞ্জিত প্রীতি, আদর সোহাগ
কুঞ্জে ফুটুক বেলা যুথী জাতি চম্পা আর অশোক।

প্রখর রৌদ্র বহেছি মাথায়, সহেছি ঝঞ্ঝা ঝড়,
কঠিন যাত্রা, কর মা আমার পরিণাম-সুন্দর।
জুড়াইয়া দাও পথিকের দুখ,
কনকাঞ্চলে মুছাও এ মুখ
সবল করুক দুর্বল বুক তব মঙ্গল কর।

দেউলে দেউলে দেউটি জ্বলুক বাজুক সন্ধ্যারতি,
উজল করিয়া, উজ্বল পথে হউক আমার গতি।
ধরণী যতই দূরে সরে যায়,
স্নেহ কোল তব যেন মা আগায়,
দেখা দেয় যেন স্বর্ণসন্ধ্যা হইয়া হৈমবতী।

দুখ-সাগরের অবগাহনেতে হয়েছি সুনির্মল,
রেখো এ মিনতি—প্রাণের কামনা করনাক নিষ্ফল
কাঁদিয়া ডাকিনু—সার্থক ডাক,
কে যেন বলিল 'নির্ভয়ে থাক'
ললাটে আমার টিকা পরাইল রাঙায়ে নভঃস্থল।

সেই হতে শত ব্যথা অনটন দেয়নাক পীড়া আর,
এ জীবন সুধাসিক্ত করিছে মায়ের স্তন্য ধার।
কেশরী কনক কেশর বুলায়,
মরণের ভয় যাতনা ভুলায়।
ধরার দুয়ার রুদ্ধ না হতে, খুলিছে স্বর্গদ্বার।

মাতৃস্তোত্র

মাগো আমার পুণ্যময়ি তুমিই আমার জগন্মাতা,
জনন জনম পেলাম কৃপা, ধন্য দয়াল মোর বিধাতা।
গুল্ম হয়ে বসুন্ধরে স্তন্য তোমার টেনেছি গো,
পূর্ণিমা তোর, সুধার আদর চকোর হয়ে জেনেছি গো।
পক্ষিনী মা বুঝ্‌তে পারি এই বুকেতে তা দিয়েছ,
এক ঠাঁয়ে আজ সব পেয়েছি জনম জনম যা দিয়েছ।
বৎস হয়ে শ্যামলী তোর সাথে সাথে ছুটেছিলাম,
হরিণশিশু তোমার সাথে কোথায় তৃণ খুঁটেছিলাম।
তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী তুমি আমার ডাকিনী মা,
উষ্ণতা এই রক্তে দিলে দুগ্ধ তোমার বাঘিনী মা।
দোল্‌নাতে মা জনম জনম তুমিই আমায় দোল দিয়েছ!
আমি যখন কুসুম-কোরক, লতা হয়ে কোল দিয়েছ।
শবরী মা, আঁচল দিয়ে বুকে আমায় বেঁধেছ গো,
দুখিনী মা, আমায় নিয়ে ভিক্ষ মাগিয়া কেঁদেছ গো।
আমার লাগি প্রাসাদ রচি আপনি থাকো শ্মশানে মা,
চণ্ডী হয়ে আমার লাগি তুমিই ছোটো মশানে মা।
তোমার ডাকে চাঁদ আমারে টিপ্‌ দিয়ে যায় বরণ করি,
সাঁজের প্রদীপ লয় মা আমার আলাই-বালাই হরণ করি।
পান্না ঝরে কান্নাতে মোর, মাণিক ঝরে হাস্যেতে গো।
লুকোচুরি খেলেন গোপাল কোমল কচি আস্যেতে গো।
জনম জনম মা হয়েছ—জনম জনম হবে ও মা,
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার তোমার কাজল, তোমার চুমা

যদি

এ পথেতে আবার যদি আস্‌তে আমায় হয়,
যে গৃহেতে ছিলাম, দিয়ো সেই গৃহে আশ্রয়।
যেথায় জেনেছিলাম আমি,
তুমিই কর্ত্তা গৃহস্বামী,
তোমা ভিন্ন করতে হয় না অন্য কারো ভয়।

সেই সে পুণ্যময়ী মাতার পুত্র যেন হই,
জগন্মাতা হেসে, যাঁহার সঙ্গে পাতান 'সই'।
পূর্ণ ভবন পরিজনে,
পবিত্র সব দেহে মনে
কড়ির কথা কমই—যেথা হরির কথা কয়।

বিশুদ্ধ যে অন্তঃপুরের রূপ কি গৃহশ্রীর!
নিত্য যেথা আনাগোনা সীতা সাবিত্রীর!
অন্ন সে নয়—মহাপ্রসাদ,
পেতাম তাতে কি সুধাস্বাদ,
স্তন্য সাথে পুণ্যে হ'ত পূর্ণ এ হৃদয়।

যেথা অভাব অনটনের বেদন ছিল কম,
হরিণশিশুর 'টুঁয়ের' মত লাগ্‌তো মনোরম।
'ভক্তমালে'র ভক্ত গণে,
দেখতে পেতাম যে অঙ্গনে,
দৈন্য মাঝে রইতো ঢাকা বিপুল অভ্যুদয়।

সেই খানেতে ছড়িয়ে গেছি অনুরাগের ফাগ—
হয় ত আজও তরুলতায় মিলায়নি কো দাগ।
মেঠো গানে হয় ত মিঠে—
পাবো চেনা রঙের ছিটে,
স্নিগ্ধজনে জন্মান্তরের মিল্‌বে পরিচয়।

অভিষিক্ত আশীর্বাদে ভবন সে মধুর,
স্বর্গ থেকে সে গৃহদ্বার নয় কো বেশী দূর।
দুঃখ সেথায় তপস্যা তো,
সুখ যেথানে কি সংযত,
আকাঙ্খিত জীবন মরণ দুই অমৃতময়।

পল্লী

তোমারে যে আমি ভালবাসিয়াছি কাব্য পড়িয়া নহে,
নহেক শ্যামল স্নেহের লাগিয়া অন্যে যে কথা কহে।

হয়েছি তোমার সুখ দুখ ভাগী
নহেক নেহাৎ অভাবের লাগি,
আমার ভক্তি—এ অনুরক্তি বুকের রক্তে বহে।

তোমার আদরে মানুষ হয়েছে মোর পিতা পিতামহ,
তব অণু কণা সে পুণ্যকথা কহে মোরে অহরহ।
তুমি মোর গয়া তুমি মোর কাশী,
সকল তীর্থ মিলিয়াছে আসি।
একদিকে তুমি 'ভ্রমরা' আমার একদিকে 'কালিদহ'।

মোর চোখে তুমি অর্দ্ধেক কায়া অর্দ্ধেক ছায়াময়ী,
স্বরগের সাথে মিতালি পাতাই তোমার নিকটে রহি।
চৌদিক হতে স্নেহের কি ডাক ?
ডুবায় অপর শব্দ বেবাক,
অক্ষয় কি যে গড়িয়া তুলিছ লয়ে এই দেহ ক্ষয়ী।

প্রতিভাদীপ্ত মহতে বৃহতে হেরি দূরে পুরোভাগে
ক্ষুদ্র যে আমি উল্লাসে ভাসি হিংসা ত নাহি জাগে।
সাগরের তলে শুক্তির মত—
মুক্তারই কথা ভাবি অবিরত
মহাসাগরের বিশালতা স্মরি ভরে বুক অনুরাগে।

জয়যাত্রা ও শোভাযাত্রার দিই আমি বলিহারি,
শুধু তৃপ্তির স্নানযাত্রার হতে চাই অধিকারী।
নই উজ্জ্বল বিদ্যুৎ দীপ,
আমি কুটীরের মাটির প্রদীপ,
ক্ষণিকের তরে তুলসীতলায় ক্ষীণ আলো দিতে পারি

ভালবাসি হেথা ভক্তিতে জ্বলা, শান্তিতে ধীরে নেভা।
ভালবাসি শত অভাবের মাঝে দিন-অতিথির সেবা।
আছি আমি লয়ে হেথা কোন্ দূরে—
দীনতা এবং দীনবন্ধুরে,
খ্যাতি যশ মান জয় যুদ্ধের সংবাদ রাখে কেবা ?

আমি নর্মদা মর্মর তটে বাঁধিতে চাহিনা ঘর,
উচ্চপ্রসাদ অলিন্দ হেরি ভীত মোর মধুকর।
লেবুর কুঞ্জ—মাধবীর শাখে,
ছোট মৌচাক বাঁধিয়া সে থাকে,
কাশ্মীর 'ডাল' কমলকানন নয় তার প্রিয়তর।

মোর কাছে তব পথের এ ধূলি রজের গরিমা পায়,
আমি ভালবাসি গড়াগড়ি দিতে এ প্রেমের নদীয়ায়।
তিমির সদয় বন্ধুর মত—
সবাইয়া দেয় বাজে ভিড় যত।
মুদিত চরণপঙ্কজে মন গুঞ্জন ভুলে যায়।

অজয়ের চর

আমি বসে দেখি অজয় নদীর চর,
নব নব রূপ ধরে সে নিরন্তর।
দূরে বহে স্রোত রজত রেখার মত
শত জলচর কলরব করে কত।
কাশবনে তা'র যত চাতকের ঘর।

সোনালী ঊষায় আগে তারে দিনমণি
করে 'কোলার'-এর যেন স্বর্ণের খনি।
ক্ষণেক পরেই শুভ্র রবির তেজে—
'গোলকুণ্ডার' হীরক আকর সে যে,
জগৎ শেঠের বাদশাহী বন্দর।

বৈকালে তার বুক দিয়া সারি সারি
কুম্ভ লইয়া আসে যায় কত নারী।
তখন ও বেলা অপূর্ব্ব মনোলোভা,
ধরে এক নব কুম্ভমেলার শোভা,
ছায়া ও আলোর হরিহর-ছত্তর।

ভূর্জ্জপত্র সম ওরে কভু দেখি
অচেনা আঁখরে কে গেছে কাব্য লেখি।

হেরি কৌতুকে উল্লাসে বারবার
হ'ক এলোমেলো তবুও চমৎকার।
খেয়ালী কবির ছড়ানো এ দপ্তর।

অপরূপ হয় সে যে মাঘী পূর্ণিমায়
ধূলায় গঠিত দেহ তার ঝরে যায়।
ভালে শশী তার, পুণ্য শুভ্র দেহ
ভুল করিবে না যদি শিব ভাবে কেহ—
মুক্ত আত্মা অনিন্দ্য সুন্দর।

অজয়ের চর ভুলায় আমার মন—
দর্শনীয়ের পাই সেথা দরশন।
তীর্থের ফল সেই দেয় মোরে আনি,
আমি ত তারেই কন্যাকুমারী জানি
সেই মোর সেতুবন্ধ রামেশ্বর।

একটি গ্রাম

রূপটী তাহার ত্রিশটী বরষ তিয়াশা মিটেনি দেখে,
শান্ত সজল শ্যামল সুষমা চক্ষে রয়েছে লেগে।
অমার মুক্ত নিবিড় আঁধার
কালো এলোকেশ যেন শ্যামা মার,
আসিত লক্ষ্মী সমা পূর্ণিমা পারিজাত রেণু মেখে।

অশথের নব পত্রোদ্‌গম মনে পড়ে ফাল্গুনে,
গৃহকপোতের মঞ্জু কূজন শ্রান্তি হ'তনা শুনে।
ঝিঁঝিঁরো শব্দ লাগিত মধুর,
ইঙ্গিতে যেন ডাকিত সুদূর,
জোনাকী ফিরিত অথই আঁধারে আলোকের জাল বুনে

মুগ্ধ করিত বরষার শোভা জলের কলধ্বনি,
রুদ্ধ দুয়ারে ডাকিত আসিয়া সমীরণ সন্‌সনি।
নিম্নে ছুটিত ছলছল জল
ঊর্দ্ধে সজল জলদ চপল
মেঘলা দিবস এনে দিত বুকে হারানো মুক্তা মণি।

ভালবাসিতাম উদার আকাশ উদার মাঠের হাওয়া
বনবিহগের সাথে তান রেখে রাখালের গান গাওয়া।
ভালবাসিতাম চেনা তরুতল,
ডাক দিত যেন ছায়া সুশীতল
নিতি অকারণ আনন্দে সেই অজানার পথ চাওয়া।

সে কি লাবণ্যে ভরিয়া ভুবন আষাঢ়ে উঠিত মেঘ,
আমার হিয়ার আনন্দে তার নিতি হ'ত অভিষেক।
পথের দুধারে তরুলতা গায়ে—
স্নেহ যেন মোর দিতাম বিছায়ে।
ভ্রমর অনিলে টেনে রেখে যেত ফুলপরাগের রেখ।

ক্ষুদ্র বৃহৎ কাজের মাঝারে আমি যাপিতাম দিন,
কর্ণে আমার দুঃখ পাসরা কে যেন বাজাতো বীণ।
মধুর করিত বেদনা আমার,
উৎসবময় নিতি চারিধার
কার স্নেহহাসি করিত আমারে সদা সন্দেহহীন।

কার বরাভয় বলে দিত কানে আমি মৃত্যুঞ্জয়,
প্রেমামৃতের অধিকারী আমি নাই নাই মোর ভয়।
অতি সাধারণ অতি যা সুলভ,
কার পরশনে হ'ত দুর্লভ,
শান্তির জল হ'ত আঁখিজল পরাজয়ে হ'ত জয়।

আমিই সৌধ, আমি প্রাঙ্গন, আমি তার শশী রবি
আমি আলো ছায়া গীত ও গন্ধ মাঠ দিগন্তশোভী।
আমি তার বায়ু, আমি তার জল
আমিই কুমুদ, আমিই কমল,
আমি তার রূপ, আমি তার প্রাণ, আমি তার দীন কবি।

বন্যা

আমি ভালবাসি দিগন্তব্যাপী বন্যার অভিযান,
গুরু তার কলকল্লোলে পাই অকুলের আহ্বান।

চৌদিকে ওই ছলছল-করা গৈরিক-গলা জল,
উন্মাদনার একি উৎসব ! প্রাণ করে চঞ্চল।
ভাবের বন্যা, প্রেমের বন্যা—উদ্দাম আলোড়ন,
এলো ভাসন্ত, ভরা বসন্ত—দুরন্ত যৌবন।
দুকূল ভাসানো অকূল পাথার উচ্ছাস বহে যায়
যেন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগে প্রতি জল-কণিকায়।

ফণা প্রসারিয়া চলে অনন্ত, ভীম তরঙ্গ নাচে,
গ্রীক সেনা লয়ে দর্পে আলেকজাণ্ডার ছুটিয়াছে।
এসেছে পাহাড়ী বন্যা, এসেছে বন্যা ভুবন জোড়া,
চলে তৈমুর লঙের বাহিনী ছুটাইয়া লাল ঘোড়া।
শত গৈরিক পতাকা উড়ায়ে ঝঞ্ঝার মত আসে,
শিবাজীর চতুরঙ্গ বাহিনী ভৈরব উল্লাসে।
ভেসে যায় কত, ডুবে যায় কত, গলে যায় কত কি যে
জলরাজ্যের 'ওয়াটারলু' ও 'জেনা' 'অস্টার লিজে'।

বহিতেছে স্রোত, যুগের যুগের কর্মধারার মত,
তার সৃষ্টির, তার কৃষ্টির ভঙ্গিমা হেরি কত ?
কি প্রচণ্ডতা ! মিলেছে কতই শক্তি অলৌকিক—
কতই আর্য্য, কত অনার্য্য, গথিক, টিউটনিক।
কত পিরামিড, কতই স্ফিনিক্স, ভাঙে গড়ে বারবার
ক্ষণে উত্থান ক্ষণেই পতন—লক্ষ হারাপ্পার।
হয় ত এতেই 'নোয়ার' আর্কের পেতে পারি সন্ধান
বটপত্রেতে ইহারি কোথাও ভেসেছেন ভগবান।

এমনি বন্যা এসেছে লক্ষ ভিক্ষু শ্রমণ সাথে,
কপিলাবস্তু, তক্ষশীলা ও নালন্দা সারনাথে।
এমনি প্লাবন আনিল আবার শঙ্কর জটাজাল
চৌদিকে রচি দুর্জ্জয় মঠ, মন্দির সুবিশাল।
নূতন বন্যা আবার ডুবালো নদীয়া শান্তিপুর,
রাঙাইয়া মন, রাঙাইয়া বন, বহে গেল দূর দূর।
ভালবাসি জল দেখিয়া আমার উল্লাসে নাচে হিয়া
জগন্নাথের রথের অগ্রে গেরুয়া কীর্ত্তনীয়া।

বন্যা যে আনে মুক্তির স্বাদ—সুদূরের সংবাদ,
নিরঞ্জনের পুণ্যাভিষেক দেখিতে আমার সাধ।
এই ত তরল কুরুক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র মাঝে—
কপিধ্বজের ঘর্ঘর শুনি—পাঞ্চজন্য বাজে।
তন্ময় হয়ে দেখি আর শুনি মনে আমি ঠিক জানি
গোপনে ওখানে কানাকানি হয় গীত ও গীতার বাণী।
ভীম ও কান্ত ও রূপ নেহারি প্রীত, কম্পিত, ভীত
হয় কালিন্দী কুঞ্জের লাগি চিত উৎকণ্ঠিত।

কালিদাস

উজ্জয়িনীর রঙ্গমঞ্চে - নবরত্নের সভাতে,
রাজা বিক্রম বিষণ্ণ মন বসিয়া আছেন প্রভাতে।
হয়ে গেছে কাল, শকুন্তলার সর্ব প্রথম অভিনয়,
নট-নটী দল বিদায় মাগিছে—প্রণতি জানায়ে সবিনয়।
কি সুধার পরিবেশন করেছে—সে কি আদর্শ চারুতার,
দিকে দিকে ছোটে যশসৌরভ সেই অপূর্ব্ব বারতার।
তন্ময় আজ গোটা রাজধানী—একই কথা সব ভবনে,
'মৃদু মৃগ দেহে মেরোনাক শর'—এখনো পশিছে শ্রবণে।

শকুন্তলার বিরহে যেমন অবসাদলীন তপোবন,
বিশাল নগরী তেমনি হয়েছে—শিথিল সবার দেহ মন।
বলিলেন রাজা—হে কবি তোমার প্রতিভা দিয়েছে যে আভাষ
সেই যে যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, সেই ত মোদের ইতিহাস।
যা কিছু রম্য—যাহা সুমধুর—তুমি রেখে গেলে কুড়ায়ে
কালভাণ্ডারে তব অবদান—দানেতে যাবে না ফুরায়ে।
শত সহস্র বরষ পরেও ওই সুধারস গড়াবে,
জন্মান্তর সৌহার্দ্য কি ক্ষণেকের তরে স্মরাবে?
বনজ্যোৎস্নার কুসুমোদ্গম, মৃদুগুঞ্জন ভ্রমরের,
'হংসপদী'র ও গীতলহরী ভোগ্য করিলে অমরের।
তরু-আলবালে জল দেয় বালা—মৃগ করে কার পথরোধ
তাদেরও চিত্র মধুর করেছে নিবিড় তোমার রসবোধ।

মোদক-খণ্ড-লোভী মাধব্য—মোর কঞ্চুকী, সারথি,
অনন্ত প্রাণ লভিয়া আজিকে হেরিছে তোমার আরতি।
পরভৃতা তব শুনিয়াছে শ্লেষ—আতপত্র ও হাসিছে
মূক ও মৌন তোমার পরশে মুখর হইয়া আসিছে।

সে দিনের সেই উৎসব প্রাতে দেখিনু দাঁড়ায়ে দুজনায়
একদিকে উঠে রাঙা হয়ে রবি—আন দিকে শশী ডুবে যায়
লোক ভাগ্যের ব্যসন উদয়ে কি ছবি ফুটালে তুলিতে
অতুলন তব প্রকাশভঙ্গী কিছু যে দেবে না ভুলিতে।
সিপ্রা অনিলে কি মন্ত্র দিলে? মূর্ত্তি রচিলে কি রসের
মোদের ক্ষণিক দুখ সুখ হল—আনন্দ চিরদিবসের।
অতিসন্ধানী, কঠিন বড়ই তোমার নিকট করা বাস
মরমের ব্যথা, সরমের কথা, কিছুই রাখনি অপ্রকাশ।

আকাশঘেরা ও ইন্দ্রজালেতে সকলি ধরেছ যাদুকর
তত্ত্ব খুঁজিয়া মোরা হত হই—কৃতী ত তুমিই মধুকর।
আজিকার আমি প্রবল মালিক কেহ নই আমি কালিকার
জীর্ণতুচ্ছ লোহতন্তু নবরত্নের-মালিকার।
হে মহামানব চিনেও চিনেনি হয় ত করেছি কুভাষণ—
কাল-কালিমার অনেক ঊর্দ্ধে উজ্জ্বল তব সুখাসন।
অনন্ত পথে উঠ জয়রথে কত করিয়াছি পরিহাস,
তুমি যে আমার—এই গৌরব—আমরা তোমার, কালিদাস।

হে কবি এ যুগ ধন্য করিলে—সজীব করিলে আঁকিয়া,
মহাকালভালে অমৃতক্ষরা শশিকলা গেলে রাখিয়া।
রাজ্য ও রাজা মিলাইয়া যাবে—কালসাগরেতে পাবে লয়
তুমি আমাদেয় শরণ সুহৃদ, তুমি আমাদের পরিচয়।
বিনীত বেশেতে যেতে হবে কবি পরাইয়া দাও তব চীর
অকূলের কূলে দেখাইয়া দাও কোথা আশ্রম মরীচির।
বন্ধুর দেওয়া বিজয় তিলক মুছ না হে কবি মুছ না
আসে অনাগত গুরু গৌরব—আমি করি তার সূচনা।

ভগ্নমনোরথ

ক্লান্ত শ্রান্ত যে বিরাট হৃদি অন্যায় সাথে যুঝি
সব দর্পীর বিরুদ্ধে যার রণ,
হ'ল বিচূর্ণ বিধ্বস্ত যা, শুধু স্বাধীনতা খুঁজি'
কোথায় কে তার শেষ অবলম্বন ?
দীর্ঘ উগ্র তপস্যা যার ব্যর্থ হইয়া গেল
শবসাধনায় সিদ্ধি এলো না যার,
ধ্রুব সাফল্য শুধু দেখা দিয়া দ্রুত যার লুকাইল
কোথা আশ্রয় ? কোথা সান্ত্বনা তার ?
তাহার বুকের কুরুক্ষেত্রে মৃত চিন্তার রাশি,
শত ভীষ্মের শরশয্যার ব্যথা,
তার প্রভাসের সাগরের নীরে ক্ষণে উঠে উদ্ভাসি
শত দ্বারাবতী মগ্নের ব্যাকুলতা !
ভগ্নমনের ইন্দ্রপ্রস্থ—ভাঙা রাঙা কালো নুড়ি—
চূর্ণীকৃত বাসনার অনুকণা,
সংকল্পের বিশাল বিন্ধ্য ভূমে দেয় হামাগুড়ি
তার বাসুকীর নত সহস্র ফণা।
তার শক্তির অক্ষয় তূণ হয়ে গেছে ছারখার
ধূলায় লুটায়ে পরিকল্পনা কাঁদে,
বিদ্যুৎগতি বিজয় রথের কই সাড়া নাই আর
ভগ্নচক্রে কোন্ তার দিয়া বাঁধে ?
দেখে ভাস্কর, ভাঙা মর্মর মূর্তির শিলা ঢিপি
তার প্রতিভার চিতাশয্যার ছবি,
অর্দ্ধ-লিখিত মহাকাব্যের দগ্ধ পাণ্ডুলিপি
উলটি দেখিছে—অখ্যাত মহাকবি !
প্রবল ঝঞ্ঝা ভাঙিয়া দিয়াছে চিত্ত-চিত্রশালা
রঙিন টুকরা বাতাসে উড়িয়া যায়।
মহামণীষার গবেষণাগারে বড় লালবাতি জ্বালা
মহিমা মরিছে গুমরি উপেক্ষায়।

বিরাট মনের বিপুল ধ্বংস পড়ে না নরের চোখে
দেবতারা কাঁদে—কেঁদে সারা দশদিক,
বৃহত্তর সে প্রোথিত 'পম্পী' দেখেও দেখে না লোকে
দারুণ দৃশ্য—অতি মর্ম্মস্পৃক !
পতিত পিনাক,, নেত্রজন্মা বহ্নি নির্বাপিত,
ব্যর্থ হইল অমৃতের অভিযান,
তবু রুদ্রের মহৈশ্বর্য্য হয়নি অন্তর্হিত
মহাকাল বসি করিছেন বিষ পান।

সর্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায়

তোমাতে নাহিক কিছুই অসম্ভব
হে সর্ব্বময়, হে সর্ব্বসম্ভব।
তুমি সব, তুমি সকল সম্ভাবনা,
ভাবি আর হই বিস্ময়ে তন্মনা।
তোমার বিরাট রূপ জাগে যবে প্রাণে।
অভিভূত করে—চক্ষেতে জল আনে
সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে মম
পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দায় নমঃ।

যা কিছু হইবে তাহাও তুমিই হরি
সব অনাগতে রেখেছ বক্ষে ধরি।
কতই সৌর জগৎ অন্তঃহীন
কত রবি শশী তোমাতে রয়েছে লীন,
কত মহাজাতি, সাম্রাজ্যই কত,
তোমাতে রয়েছে ক্ষুদ্র ভ্রূণের মত
কত রূপরস লভিয়াছে আশ্রয়
হে বিশ্বরূপ জয় জয় তব জয়।

বন্দর যাহা—বহু বহিত্রে ঘেরা
হইবে ক্ষুদ্র খেয়ার তরীর ডেরা।
রঙমহলের মহার্ঘ মর্মর,
ভেঙ্গে লয়ে গিয়া ভীলেরা রচিবে ঘর।

রাষ্ট্রের জনগণ মুখরিত গৃহ
হয়ত বাদুড় পেচকের হবে প্রিয়।
ধরাবিপ্লবী সন্ধিপত্র রাশি
মুদীর দোকানে ঠোঙাঠুঙি হবে আসি।

যে ক্ষুদ্র জীব চোখেতে পড়ে না ধরা
হয়ত তারাই শাসিবে বসুন্ধরা।
মূক জড় যারা তারাই পাইবে ভাষা,
পাষাণে জাগিবে নব জীবনের আশা।
ঘৃণা করে যারা—ঘৃণিত হইবে তারা,
শক্তি শৌর্য্য সম্মান হয়ে হারা।
ভালবাসা যারা জীবনে পায়নি কভু
হয়ত তারাই তব প্রিয় হবে প্রভু।

মাটির পৃথিবী এখনো খেতেছে পাক
মুক্ত হয়নি কুম্ভকারের চাক।
সুন্দর শুচি আরও হবে উন্নত,
রয়েছে ইহার সম্ভাবনাই কত।
ধূলিতে তাহার দেবতার যাওয়া আসা,
তরুতে তাহার গরুড় পাখীর বাসা।
কে জানে এ ধরা স্বরগ হইবে কিনা?
শুষ্ক অলাবু—ঋষির হাতের বীণা।

এই যে মানুষ ধিক্কৃত যারে ভাবি
দেবতা হ'বার রয়েছে তাহার দাবী।
গ্রহতারা হতে ক্ষীণ অঙ্গার কণা
সবাকার আছে বিরাট সম্ভাবনা।
ক্ষুদ্র বেতসী হবে বিদ্যুৎলতা
গণ্ডীর মাঝে বন্দী কি বিশালতা।
হয়ত এ আঁখি দিব্যদৃষ্টি পাবে
ধ্যানের মুরতি সম্মুখে দেখে যাবে।

অবসর আর নাহিক সন্দেহের,
আমরা অংশ সর্ব্বসম্ভবের।

মোরা যুবরাজ রয়েছি কিরাত হয়ে,
মুক্তার তরী বেড়াই বালুকা বয়ে।
ক্ষুদ্র শিশির তৃণেতে শয্যা পাতি,
সুধাম্বুধির তবুও আমরা জ্ঞাতি।
অসাড় পরাণ উল্লাসে তোরা জাগ
ছিলি কঙ্কর—হবি রে পদ্মরাগ।

অঘোরপন্থী

অর্দ্ধদগ্ধ গলিত কন্থাভার,
সদ্য চিতার অস্থি ও অঙ্গার,
করাল করোটি, ঠুম্‌রা ঝুলিছে গলে,
আসবআবেশে ভোর হয়ে যেন চলে,
কর্ণে তাহার সুবৃহৎ কুণ্ডল,
উদ্যত জটা যেন ভুজঙ্গ দল
মূর্ত্তি তাহার রহস্যময় কি যে
অঘোরপন্থী তুম্‌দ্র বলে সে নিজে।

সে সূচিভেদ্য গহন আঁধার যাচে
মেঘ ও বজ্র বিদ্যুতে বুক নাচে।
চুম্বক সম তাহার আকর্ষণ
টানে ধরণীর গ্লানি ও আবর্জ্জন।
সে থাকিতে চায় শুধু তাহাদিকে নিয়া,
রুদ্রদেবের ক্ষুদ্র সে সাপুড়িয়া।
শকুনির ঝাঁক নিশীথে যখন ডাকে
ফুৎকার দেয় তুম্‌দ্র তাহার শাঁখে।

প্রভু যে তাহার অঘোরেশ্বর শিব,
তিনি জীবন্ত আর সব নির্জীব,
তার নামে যাহা গ্রহণ করে তা শুচি
সম কুৎসিত অকুৎসিতে যে রুচি।
পান করে বিষ—খ্যাতি আর অখ্যাতি
সে জানে নিজেকে নীলকণ্ঠের জ্ঞাতি।

সব রসই মিঠা, কি ফল প্রভেদ গণি
উঠে বংশীর সব রন্ধ্রেই ধ্বনি।

তুমভদ্র বলে ও কালির আঁখর গুলি
জ্ঞানের বিশাল কি রাজ্য দেয় খুলি,
যে বীজমন্ত্র তোমারে দিলেন গুরু
সেইখানে শেষ যেখানে তাহার সুরু।
রহিল সে বীজ কঠিন মোড়কে মোড়া
পিঁজরাপোলেতে অশ্বমেধের ঘোড়া।
মোরা সে মন্ত্র সাধি সহস্রদলে
অচিন্তনীয় আদান প্রদান চলে।

ঘৃণার কি আছে? করি যাহা ব্যবহার
এ নর-কপাল নহে ত অবজ্ঞার।
কত ভাব কত চিন্তার এযে রাজা,
শিরায় শিরায় রঙিন গোলাপ তাজা,
কত অনুভূতি—কতই গভীর স্নেহ
বসতি করেছে—ভুলিতে পারে কি কেহ?
ইহাতে আমাতে প্রভেদ কদিন লাগি
তাই ভালবাসি—এত তার অনুরাগী।

অতি অদ্ভুত তুমভদ্রর বিশ্বাস
কুৎসিত মাঝে সুন্দর করে বাস।
হীরক যেমন অঙ্গার হতে জাগে
শিব হতে হলে—শব হতে হবে আগে।
মুক্তি পাইতে ঠিক মুক্তার মত
সহিতে হইবে সাগরের দেওয়া ক্ষত।
ঘৃণা আবরণ সব আবরণ সেরা
সেই ত মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া।

সঙ্গ তাহার খোঁজে কুতূহলী দলে
নিগূঢ় তাহার সাধনার কথা বলে,

স্পর্শে তাহার—এ কথা মিথ্যা নয়
দ্রব্যগুণের পরিবর্ত্তন হয়।
পঙ্ক শয্যা যত পারো ঘৃণা কর
ফোটায়ে কমল সে তাহা তুলিতে দড়।
ব্যাসকাশী হতে কাশী কতটুকু দূর।
তুমভ্র কি হবে জানেন চন্দ্রচূড়।

লোচনের খোল

যে খোল বাজায়ে গাহিল লোচন 'এসো এসো বঁধু' গান
প্রেম আঁখি নীরে অভিষেক হল যার সারা দেহ প্রাণ,
যে খোলের সাথে মিশায়ে রয়েছে 'মনোহর সাহী' স্বর,
শুনি অনুখণ মধুবাণী যার তিয়াসা হ'ল না দূর,
হরিনাম-রস বাদরেতে যাহে উঠেছিল মধু বোল,
'লোচনে'র পাটে টাঙ্গানো থাকিত 'লোচনে'র সেই খোল।
পাঠ হত হবে চরিতামৃত হ'ত কীর্ত্তন গান,
মাটির সে খোল আপনি বাজিত লভিত যেন সে প্রাণ।
'নরোত্তমের' প্রার্থনা শুনি' অজ্ঞাতে দিত তাল,
এমনি করিয়া কাটিয়া গিয়াছে এইখানে বহু কাল।
উঠিল এ কথা বর্দ্ধমানের প্রতাপচাঁদের কানে,
আনাও সে খোল, শুনিব বাদ্য, ছুটে লোক গ্রাম পানে।
একি দুর্দ্দিন ঘরে ঘরে শুধু হায় হায় করে লোক,
গ্রাম ছাড়ি যায় সাধকের খোল গ্রাম জোড়া তাই শোক।
ওগো মৃদঙ্গ! যেওনা যেওনা হয় যে ব্যাকুল মন,
চিন্তামণির দেওয়া মণি তুমি সাতটা রাজার ধন।
নৃপতি আদেশে মোহান্ত সহ হাজির হইল খোল,
ভাঙিয়া এসেছে সহরের লোক উঠে ঘন কল্লোল।
শুন মহারাজ কহে মোহান্ত ভীতিবিহ্বল স্বরে,
বড় নিদারুণ এ খোলের সাড়া থাকিতে দেয় না ঘরে।
শুনে কাজ নাই, বাজাতেও মানা শুনিয়াও নাহি ফল,
জ্বালাময় করে ঘরসংসার, শুনিলে অমঙ্গল।

তবুও আবার রাজঅনুরোধ এড়াতে না পারি আর,
নয়নের জলে চুম্বিয়া খোলে প্রণমে বারম্বার।
কাঁপিছে হস্ত, নয়ন তাহার ভয়েতে মুদিয়া আসে,
রাজঅনুচর ধরণ দেখিয়া বদন টিপিয়া হাসে।
প্রভু নাম স্মরি ঘা দিলেন খোলে বাজে মৃদঙ্গ জোরে,
নাচে মহান্ত তা থেই তা থেই রাজঅঙ্গনে ঘোরে।
বাজে মৃদঙ্গ থামেনাক আর টলমল করে বাড়ী,
ভাঙি পড়ে চূড়া ঝাড় হয় গুঁড়া শঙ্কিত নরনারী
'মীণনাথ' পুরী সম বুঝি আজ হয় সব চুরমার।
রাজপরিজন ভীত চঞ্চল বচন সরে না আর।
তমাল তরুর তল উঠে ভিজি কদম পুলকে ফাটে,
প্রলয় বাদনে কি ঘূর্ণী এলো বিলাসের রাজপাটে ?
বহুক্ষণ পর থামিল বাদ্য ঘাটে বাটে কথা রটে
সকলেই বলে ধন্য ধন্য সিদ্ধ এ খোল বটে।
গ্রামে মোহান্ত আসিলেন ফিরে সেই সে খোলের সাথ,
মুখে নাই কথা সজল নয়ন হস্তে পক্ষাঘাত।
হোথা পর দিন প্রতাপচাঁদের পেলে না কেহই খোঁজ
তোরণে শাস্ত্রী দাঁড়াইয়া থাকে আশা পথ চেয়ে রোজ।
ঘোড়াশালে তার প্রিয় ঘোড়া কাঁদে হাতীশালে কাঁদে হাতী
রাজঅঙ্গনা কাঁদেন কাতরে ভূমিতে আঁচল পাতি।
বহুদিন পর ফিরিলেন রাজা চিনিল না কেহ তাঁরে,
গৃহের মালিক অতিথির মত ফিরে গেল এসে দ্বারে।

ভৃত্য

প্রভু হইবার নাহিক আমার শক্তি সামর্থ্য,
যুগ যুগ ধরি পরিচারক, আর আমিই যে ভৃত্য।
'মনু'রে আমিই মানুষ করেছি, সহিয়াছি আবদার,
কোলে করে আমি কান্না ভুলানু সেদিন মান্ধাতার।
'রামভদ্রে'র হামাগুড়ি দেখে হাসিয়া হয়েছি খুন,
'দাদা বলে মোর গরব বাড়ালে বালক ভীমার্জ্জুন।

আমি যাই, আসি, শুধু সেবা করি, সদা প্রফুল্ল মন,
আমার সুখের নিকট তুচ্ছ রাজার সিংহাসন।
উমার বিয়ের টোপর এনেছি—আনিয়াছি চিঁড়া ক্ষীর,
অক্ষয় শাঁখা গড়ায়ে এনেছি বিবাহে সাবিত্রীর।
দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বহিয়াছি শত ভার,
দ্বিরাগমনেতে সঙ্গে গিয়াছি শ্রীবৎস চিন্তার।
পাতিয়া দিয়াছি বেদব্যাসের আমিই অজিনাসন,
জনমান্তর ভাগ্য স্মরিয়া উড়ু উড়ু করে মন।
মনিব ছিলেন কালিদাস মোর, ছিনু তার অনুরাগী,
তুলট কাগজ কিনিয়া এনেছি, 'শকুন্তলা'র লাগি।
কৃষ্ণদাসের পাদুকা বহেছি ধোয়ায়েছি পদ আমি,
মোর হাত হতে হরিতকী লন সনাতন গোস্বামী।
চণ্ডীদাসের লেখা পদাবলী আমি রাখিতাম তুলি,
স্বহস্তে আমি সেলাই করেছি নরোত্তমের ঝুলি।
রামপ্রসাদের বেড়ার বাখারি আমিই এনেছি বহি,
মহামায়া এলো কন্যা সাজিয়া দেখিয়াছি দূরে রহি।
ধনী মহাজন রাজা মহারাজ, হিংসা করিনে কারু,
গর্ব্ব আমার বিদ্যাপতির বয়েছি গামছা গাড়ু।
আনন্দে সহি' শত লাঞ্ছনা, হয়েও হইনে দেক্,
জীবনে হয়েছে শত মহতের পদরজ অভিষেক।
অকিঞ্চনের কি মহাভাগ্য! বিশ্ব তাহার গেহ
পরশমণির পরশে আমার কাঞ্চন হ'ল দেহ।
গরুড়ের আমি জ্ঞাতি ও দায়াদ, এযে আনন্দ ভারী
ভৃত্য হয়েই হয়েছি নিত্য অমৃতের অধিকারী।
আমি আসি যাই, শুধু সেবা করি, সদা প্রফুল্ল মন
আমার সুখের নিকট তুচ্ছ রাজার সিংহাসন।

মজিদ

লেখাপড়া জান্‌তো অতি কম, বিষয় আশয় ছিলই নাক মোটে,
নাইক' কিছুই, কিন্তু মনোরম; এমন কুসুম পথের ধারেই ফোটে।

মিথ্যা কথা কইত সে যে ঢের—লেগেই ছিল অভাব অনটন,
সাধু সে নয় নিত্য পেতাম টের, তবু তার কি ছিল আকর্ষণ !
না এলে সে লাগত ফাঁকা ফাঁকা, পুকুর ধারে শঙ্খ চিলের মত,
না ডাকলেও ইচ্ছা হ'ত ডাকা—গুণ দেখিনি—দোষ দেখেছি কত !
যেমন চতুর তেমনি সে সরল ভাল আমায় বাস্‌ত নিষ্কপটে,
অজয়ের সে যেন বানের জল ময়লা ঘোলা তবু মধুর বটে।
ভৃত্য এবং বন্ধু ছিল দুই-ই, ব্যথার ব্যথী—না বল্‌লে হয় ভুল,
সত্য বটে নয় সে টগর যুঁই, 'কেয়া' সে তার কাঁটাই যেন ফুল।
তার কত দর ? কতই যে দরকার ? বুঝত নাক হিসাবী সমাজ,
ধারতো না সে ফুল কি ফলের ধার আনন্দের সে পাতাবাহার গাছ।

ইতিহাসের স্মৃতি

ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়েছিনু কবে,
সব কথা প্রায় আমি ভুলে গেছি তার,
কিন্তু বুকে আঁকা আছে চিরদিন তরে,
গোপনে নিহত দুটি সে রাজকুমার।
কোন যে সুদূর দেশে কোনো দূর যুগে,
নির্ম্মম যে হত্যাকাণ্ড হল অনুষ্ঠিত !
শুধু দুটি কচি মুখ জাগে যে রে বুকে
বিশাল ইংলণ্ড হয় কোথা অন্তর্হিত।
ভারতের ইতিহাস ও ভুলিয়াছি হায়,
ধ্বংস হ'ল কত রাজ্য—এল কত জাত।
অশ্রুসাগরের নীরে সবই ডুবে যায়
জাগে শুধু একমাত্র তীর্থ সোমনাথ।
মন্দির ভাঙার কথা নূতন ত নয়,
চিতোরের ধ্বংস নয় কম শোকাবহ।
কেন তারই লাগি মোর বুকে শুধু রয়
চিরদিন সমভাবে ব্যথা দুর্ব্বিসহ।
আরবের কারবালা কি মহাশ্মশান,
মন মোর ঘুরে ফেরে 'ফোরাতের' তীরে,

চারিদিকে শুনি স্বর 'হোসেন' 'হাসান',
সব নীর হারা হয় মোর আঁখি নীরে।
বুঝিতে পারিনে আমি কোনটা যে বড়।
তিনটিই সমভাবে টানে মোর মন।
প্রেম নয় তবু দেখি এ কেমনতর ?
অনুভূতি করে দেয় জগৎ আপন।

মানুষী আকাঙ্ক্ষা

মানুষই ত বটি দেবতা আমরা নই
জন্মিয়া যেন আবার মানুষ হই।
ঘূর্ণায়মান সপ্তরঙ্গে ভরা,
বিচিত্র এই মোদের বসুন্ধরা,
দেখি আর ভাবি তুলনা ইহার কই ?

বিরাম বিহীন চল চঞ্চল সব,
নিতি নব ব্যথা, নিতি নব উৎসব,
যত কঠোরতা তত এর মধুরিমা,
সুখ ও প্রচুর দুখের নাহিক সীমা,
যত অপমান তত এর গৌরব।

স্বর্গ সেখানে সব সুন্দর সৎ,
সমান অতীত সমান ভবিষ্যৎ
কিছুতেই নাই রৌদ্রজলের পোঁচ,
সেখানে কালের কুহেলি জমে না রোজ
দূর হতে তারে প্রণমি দণ্ডবৎ।

নিখুঁত খোদিত জীবন্ত মর্ম্মর,
দেবতারা অনবদ্য ও সুন্দর,
রূপ ও শক্তি ঐশ্বর্য্য উৎসব,
চরম রেখায় পঁহুছিয়া গেছে সব,
সে দেবতা হতে চাহে না এ অন্তর।

ক্ষীণ পুণ্যেতে পুনরায় ফিরে আসা,
স্বর্গেতে থাকা সে ত ভাড়া করে বাসা।

তার চেয়ে ভাল আমাদের এ ভুবন,
সাধনার ঠাঁই—এই গৃহ তপোবন,
কতই সিদ্ধি—সম্ভাবনার আশা।

এ ধরা মাটির—নয় মণি রতনের,
অতি অস্থায়ী এই তনু যতনের।
ভালবাসি মোরা এই বৃদ্ধি ও ক্ষয়
অস্ত উদয় উপচয় অপচয়,
এই নিতি ভীতি উত্থান পতনের।

সদা উদ্বেগ, শান্তি ইহার কোথা ?
সবে অতৃপ্তি—সবেই অপূর্ণতা।
সব ক্ষয়ী সব পরিবর্ত্তনশীল,
একের সহিত অপরের নাহি মিল,
তবু এর লাগি কেন এত ব্যাকুলতা ?

মিল যে মোদের অপূর্ণতার সাথ,
তাই আধগড়া মোদের জগন্নাথ।
অপূর্ণ তাই সুন্দর এই ধরা,
মোরা অপূর্ণ তাই আশা বুকভরা
নাগাল না পাই তবুও বাড়াই হাত।

পরিপূর্ণতা লইয়া করিব কি ?
কিছু খালি থাক, এ কনক কলসী
পানিয়া ভরণ হয়নাক যেন শেষ
মুক্তি দিওনা তুমি মোরে পরমেশ
তব স্বাদ চাই হে মোর সুধাব্ধি।

স্পর্শ

রূপ রস আর গন্ধ জাগায় সাধ
তুমিই স্পর্শ অমৃত আস্বাদ।
ধরা চঞ্চল তোমার আকাঙ্ক্ষায়,
বুভুক্ষু মন তোমারে লভিতে চায়,

শ্রবণ নয়ন কতটুকু দিতে পারে
তৃষিত ভুবন আঘাতিছে তব দ্বারে।
তোমারে ডাকিছে স্ফুটনোন্মুখ ফুল
তোমারি লাগিয়া সমীরণ বেয়াকুল,
সহস্র কর প্রসারি সূর্য্য রয়,
চন্দ্র সোহাগে হয়ে উঠে সুধাময়।
রক্ত অধর করিছে তোমার আশ
সাগর সলিলে তোমারি যে উচ্ছ্বাস।
তোমার লাগিয়া ধরার ঝুলন দোল,
উৎসঙ্গের উৎসুক হিন্দোল।
প্রতি অঙ্গেতে তোমারি যে উৎসব
মনের বনেতে জাগে তব বেণু রব।
পাতি অনন্তশয্যা কমলাসনা
লক্ষ্মী করিছে তোমারি যে আরাধনা।

যূঁই

এক রত্তি যূঁই,
গন্ধেতে তোর দেখ্‌ছি—আমি
করলি আকুল তুই।
ক্ষুদ্র বলে কেহই বুঝি করেনি লক্ষ্য,
বক্ষেতে তোর পরিমলের স্বয়ম্বর যজ্ঞ।
গন্ধ একি! মন মাতানো একান্ত অদ্ভুত,
বাষ্পকরা কাদম্বরী অথবা মেঘদূত।
কোন সাধনায় পঞ্চভূতে করলি রে তুই বশ?
গন্ধে যে পাই শব্দ এবং স্পর্শ রূপ ও রস।
তোর সুরভি আঁধার আলোয় চেনা চেনা মুখ,
আকাঙ্ক্ষিত চোখের চাওয়া ব্যাকুল করে বুক।
অচেনা অক্ষরে লেখা পড়তে নারে মন,
যুগান্তরের প্রণয় লিপি প্রাণ করে কেমন।
হরির কাছে আগিয়ে যে যাই তোরে যখন ছুঁই
অনুরাগের পথের সাথী আমার রামী তুই।

অনামা কবি

সরযূ ও গঙ্গা, রেবা, সুবর্ণরেখা,
সিপ্রা, সিন্ধু, কৃষ্ণা আদি নামের তালিকা
হেরি যখন, ভাবি মনে এ নাম দেওয়া কার ?
দেশের আদিম কবির পদে জানাই নমস্কার।
ব্রহ্মপুত্র, রূপ-নারায়ণ, অজয়, দামোদর
রূপের ছবি আঁক্‌লে নামে এ কোন কারিকর ?
ইচ্ছা করে আলিঙ্গিয়া প্রণতি দিতে
এমন মধুর নামকরণের সেই পুরোহিতে।
অতসী, অপরাজিতা, রজনীগন্ধা
চম্পা, পারুল, যুথী, জাঁতি অমৃত ছন্দা,
বঙ্গভাষার সূতিকাগার করলে যা আলো
দেখে শুনে আমার নয়ন শ্রবণ জুড়ালো।
বইছে দেশের নদ নদীতে আনন্দ ধারা,
ফুলে ফলে শোভে তাদের প্রীতির পসারা।
নগর ভূধর অরণ্যানী কেউ পড়েনি বাদ
লুট্‌লে তাঁদের স্নেহের পরমান্ন পরসাদ।
কাব্য তখন পায়নিক পথ খুঁজিছে ছন্দ
গঙ্গা যেন শিবের জটিল জটাতে বন্ধ।
আদি কবির অনুষ্টুভের আগের এ সব নাম,
দিলেন যাঁরা, করছি তাঁদের শ্রীপদে প্রণাম।
ভাষার উষার সাধক কবির যাই বলিহারী,
নামে এমন রুচি যাঁদের নিত্য নেহারি।
নাম দিয়েছে, নয়কো নিজে নামের পিয়াসী,
কেমন করে বলবো তাঁদের কি ভালবাসি !
তাঁরা জনগণের কবি—দেশের কবি যে,
তাঁদের দেওরা নামেই মোদের দেশ যে শোভিছে।
তাঁদের স্নেহেই মোদের ভাষা পুষ্ট গরবী,
প্রণাম আজি পাঠায় তাঁদের আনামা কবি।

বৰ্দ্ধমান ষ্টেশন

হয়ত তোমরা মোর কথা শুনি হাসিবে উচ্চ হাসি,
বৰ্দ্ধমানের ষ্টেশনটি বড্ডই ভালবাসি।
ভালবাসি এর ফুলগাছ গুলি,—ভালবাসি এর টল,
ভালবাসি এর সুদূর লাইন—ডিস্‌টাণ্ট সিগনল।
চেয়ে থাকি আমি, অপলক আঁখি চোখে বহে যায় নীর
এই পথ দিয়ে চলে যায় গাড়ী জম্মু ও কাশ্মীর।
সুখের দিনের সুমধুর স্মৃতি বুকে উঠে উদ্ভাসি
বৰ্দ্ধ মানের ষ্টেশনটি বড্ডই ভালবাসি।
সেদিন এমনি শরৎ প্রভাত, স্মরণ হতেছে বেশ,
প্লাটফৰ্ম্মেতে আসিয়া দাঁড়ালো দেরাদুন একস্‌প্রেস।
নামিলেন মোর জনক জননী বহু বর্ষের পর,
দেবতা আসিয়া উজল করিল শূন্য আমার ঘর।
উল্লাসে সব পোঁটলা পুঁটলী নামাইতে যাই ভুলি
শুধু বারবার আমি তাঁহাদের লই চরণের ধূলি।
এনেছেন আহা কতই দ্রব্য—অতরল স্নেহরাশি,
বৰ্দ্ধমানের ষ্টেশনটি বড্ডই ভালবাসি।
একটি বেলা যে কাটায়েছি ওই ওভারব্রিজের ছায়,
পঞ্চবটীর বনেই পেয়েছি আমার অযোধ্যায়।
কৈলাস মোর নামিয়া এসেছে রেলের এ প্রাঙ্গণে,
আমার কমলে কামিনী উদয় হেথায় শুভক্ষণে।
ক্ষণিকের এই পূজামণ্ডপ—আজ মনে পড়ে সব,
অনন্ত সেই আনন্দমেলা—বোধনের উৎসব।
এই ঠাঁই মোর মাতৃতীর্থ—এই ঠাঁই মোর কাশী
বৰ্দ্ধমানের ষ্টেশনটি—বড্ডই ভালবাসি।
আজিকে আমি যে আশ্রয়হীন মাতৃপিতৃ হারা
কাতর কণ্ঠে মা বলিয়া ডাকি—আর ত পাইনা সাড়া।
আসে যায় ট্রেণ ব্যাকুল নয়নে তেমনি তাকায়ে থাকি,
হয় ত হেরিব সে পুণ্য ছবি—স্নেহ ছল ছল আঁখি।
জ্ঞান ত এখন অনেক বেড়েছে—বেড়েছে বয়ঃক্রম
এখানে এলেই ছেলে হয়ে যাই—করি যে তেমনি ভ্রম।
দেখিয়া হাসেন মাতা পিতা মোর আজিকে স্বর্গবাসী
বৰ্দ্ধমানের ষ্টেশনটি—বড্ডই ভালবাসি।

কাকের বাসায়

ষ্টেশনের সন্নিকটে একটী ছোট বাড়ী—
একটী রাতি কাটায়েছি বক্ষে আমি তারই।
গাড়ীর সাড়া, ঘণ্টা বাঁশী, আরোহীদের গোল,
দ্বিপ্রহরের পরেই নীরব অগাধ উতরোল।
সামনে গৃহের দেবদারু দল তাহার শাখে হায়
বৃহৎ প্রজাতন্ত্র কাকের—আভাষ পাওয়া যায়।
বৃক্ষ গেছে কৃষ্ণ হয়ে—দৃষ্টি যতদূর—
কি জানি কি আনন্দে মোর বক্ষ পরিপূর!
গভীর রাতে উঠলো হঠাৎ লক্ষ কাকের ডাক
যোগাদ্যা মন্দিরে যেন নিশীথ রাতের ঢাক।
ডাক যে কাকের মিষ্ট এমন, এমন চমৎকার
পরিচয় ত জীবন ধরে পাইনি কভু তার।
ভূতনাথের এ সন্ন্যাসীদের যেন কলস্বর
ধর্ম্মরাজের পূজার যেন চড়বড়ে দগড়।
একেবারে মোটেই এতে কর্কশতা নাই,
কোন দেবতার আরতির এ কাঁসর বাজে ভাই?
ডাকের সাথে পেলাম একি প্রাণ মাতানো সুর
সংকীর্ত্তনের রামশিঙার এ রব কি সুমধুর?
আজ পেরেছি বুঝতে আমি সন্দেহ নাই আর,
কোকিল কেন এদের বাসায় কণ্ঠ সাধে তার?
কোকিল নহি তবু আমার আকুল করে বুক,
কাকের বাসায় একটী ছোট রাত্রি জাগার সুখ।

মুদীর দোকানে

সাজানো রয়েছে চাল ডাল নুন ময়দা চিনি ও সুজি
খাঁটি সরিষার তৈল, রয়েছে পাই নাই যাহা খুঁজি।
যাহা চায় লোক—যাহা দরকারী সকল দ্রব্য হেরি,
ক্রেতাও প্রচুর দোকানখানাকে রাখিয়াছে সবে ঘেরি।

কড়া ক্রান্তির কঠিন ক্ষেত্রে—হইয়াছি হায়রাণ
সহসা পেলাম অনাস্বাদিত ধূপের স্নিগ্ধ ঘ্রাণ।
আর দেখিলাম দূরে একপাশে বসিয়া ভক্তিভরে
বৃদ্ধ জনেক সজল নয়নে 'রামায়ণ' পাঠ করে।
এমন নীরস রাজপুতানার চুঙ্গীর দপ্তরে,
জগন্নাথের পখাল প্রসাদ আসিল কেমন করে?
নর্ম্মদার এ মর্ম্মর ঘাটে গোপীচন্দন আনি
কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্মের ফাগ কে করিল আমদানী?
ব্যবসার এই তাম্রলিপ্তে—লাভের সপ্তগ্রামে
কোন সে ভক্ত সকল ভুলিয়া পূজিতেছে সীতা রামে?
ঠোঙার এদেশে হাতে দিল এসে এ যেন রে গুয়া পান
তুলাদণ্ডের খণ্ডরাজ্যে কাব্যের অভিযান।
বুঝিনু দয়াল যে ভাবে থাকুক মানুষ তোমায় চায়,
তোমায় চরণসরোজের বাস সাত তাল ভেদি ধায়।
যতই হউক কঠিন কঠোর, হউক স্বার্থপর,
তোমারে না লয়ে পারে না চাহে না মানুষ করিতে ঘর।
ব্যস্ত কেহ বা লয়ে ধান চাল, কেহ লয়ে রূপা সোনা
সবাকার মাঝে নীরবে চলিছে তোমারি যে উপাসনা।
তুমি মূলধন, তুমি আশ্রয় তোমাকে ছাড়া কি বাঁচে?
সুখে সম্পদে বিপদে আপদে তোমারে চাহে সে কাছে।

মায়ের দোষে

খেপা মায়ের রাজ্য এটা নাইকো তাতে সন্দেহ,
পাগলামি এর হাওয়ায় জলে রূপ রসে আর গন্ধেও।
সাগর আছে সদাই মেতে—
হয় না দেরী প্রমাণ পেতে,
বৃষ্টি মেঘে বিদ্যুতেতে রৌদ্র মেঘমন্দ্রেও।

ঘূর্ণিপাকে ঝঞ্ঝা আসে বুঝতে পারি ভাবটা কি?
চূর্ণ করে ডুবিয়ে ভেঙ্গে বিশেষ উহার লাভটা কি?

আগুন ছড়ায় ঐ যে গিরি
বেশ ত ছিল শান্ত ধীরই,
খে্প্লো কেন ? থাকত না তো কারুই ভাল মন্দেও।

যতই দেখি ততই ভাবি যাই মরে যাই লজ্জাতে,
পাগলী মায়ের দোষ যে সবার অস্থি এবং মজ্জাতে।
সাধক ভাবুক প্রেমিক কবি,
কেউ সোজা নয় পাগল সবই,
ঘোর ক্ষেপামীর ভূত চাপে যে দিগ্বিজয়ীর স্কন্ধেও।

ঘোর লেগেছে গ্রহ তারায় ধূমকেতু ওই দৌড়িছে,
ডুবছে জলে কেবল কেন সুধাও না পানকৌড়িকে।
গাছপালা সব কি হিল্লোলে
বিরামবিহীন সবাই দোলে ?
উন্মাদনা ছাপিয়ে পড়ে বাঁশের বাঁশীর রন্ধ্রেও।

শিখীর হঠাৎ নৃত্য কেন ? কিসের আমোদ টুনটুনির ?
চোখ বুঁজে রয় পেচক কেন সহি বেদন গুমটুনির ?
একঘেয়ে হায় নিত্য শুনি,
এই যে বুকের ধুকধুকানি,
পাগলামিরই পাই পরিচয় উহার গতি ছন্দেও।

জোয়ার ভাঁটায় ও ঝোঁক কিসের অমায় এবং পুর্ণিমায়,
মেঘমালা সব ছুটছে কেন চক্রবালের দূর সীমায় ?
'কল্যাণ' এবং 'দেশের' মাঝে,
হঠাৎ কেন দীপক বাজে ?
বীণার তারে অঙ্গুলি তাঁর দেখতে যে পায় অন্ধেও।

দণ্ড

সুখ্যাতি দাও সম্মান দাও যারা উপকার করে,
নিন্দা এবং অপমান রাখ তুমি অপকারী তরে।
উপকার যেই করিবারে গিয়া দৈব দুর্বিপাকে,
অপকার হায় করে ফেলে প্রভু বল কিবা দাও তাকে ?

ব্যথা নিবারিতে ব্যথা দিয়ে ফেলে হিতে বিপরীত হয়,
নিতি প্রতিকূল দৈব তাহার জয়ে হয় পরাজয়।
তেল দিতে গিয়া নিভায় প্রদীপ ভরিতে ভাঙে সে ঘট,
ধূলা ও ময়লা ঘুচাইতে গিয়া ছিঁড়ে ফেলে হায় পট।
প্রাণপণ যার পুণ্য চেষ্টা ধরায় পায় না দামই,
তুমি তারে আহা কি বলে বুঝাও কহ অন্তর্যামী?
চরণ সেবিতে নখাঘাত হয় ডুবায় আনিতে কূলে,
পিছল পথেতে আছাড়িয়া ফেলে কোলে লতে গিয়া তুলে,
উপশম হায় করিবারে গিয়া বাড়াইয়া ফেলে রোগ
ভাগ্যে যাহার এমনি নিত্য 'নষ্ট চন্দ্র' যোগ;
ভাল করিতে যে মন্দ ঘটায় চির-কল্যাণকামী
তুমি তারে আহা কি বলে বুঝাও? বল অন্তর্যামী।
হে প্রভু কাজের দর্পণে কেন হৃদয় উঠে না ফুটি?
তাহলে ত হায় থাকিত না হেথা এত মাথা কুটাকুটি।
সারসকে আহা শ্যেন সাজাইয়া একি পরিহাস করা?
অকলঙ্কীকে কলঙ্ক দিয়া কি আমোদ পায় ধরা?
মনে হয় প্রভু এদেরি দুঃখে উঠেছিলে তুমি ঘামি
সত্য মিথ্যা আমি কি বুঝিব জানো অন্তর্যামী!

ফুলঝুমকা

আমার বৃদ্ধ প্রমাতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহ
কটকে ছিলেন নিমক-দেওয়ান চাকুরী কষ্টসহ।
অর্থ প্রচুর, সম্মান বহু কাজেই প্রিয়ার তরে,
মুকুতা দোলানো ঝুমকা গড়ান স্বর্ণকারের ঘরে।
প্রতি মুক্তাটি সুন্দর খাঁটি নিটোল চমৎকার,
দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন নিশ্চয় প্রিয়া তাঁর।
তারপর গেছে সুদীর্ঘ কাল, প্রীতির বারতা বহি,
সে ফুলঝুমকা পেলেন ক্রমেতে শেষে মোর মাতামহী।
বহু ঝঞ্ঝাট অভাব গিয়াছে তাহার উপর দিয়া,
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছয়টা মেয়ের বিয়া,

ঝুম্‌কা তবুও অটুট রয়েছে বন্ধক হতে ফিরি,
স্বর্গবাসিনী আত্মীয়াদের প্রেম আছে তারে ঘিরি।
যুগের যুগের নবীন বধূর রাঙা ঘোমটার ঘামে,
প্রেমের জ্যোৎস্না, প্রীতির সরিৎ, বক্ষে তাহার নামে।
প্রণয় ব্যবসা করিতে করিতে সে পেয়েছে বুঝি প্রাণ,
অতীত প্রেমের নির্ম্মাল্য সে কুলদেবতার দান।
ঝুম্‌কা জোড়াটি যৌতুক পেলে পরিশেষে মোর প্রিয়া
শতবাসন্তী ফুলের পরশ আদর সোহাগ নিয়া।
এখন হয়েছে আবার রঙিন কৌটাতে তার ঠাঁই,
স্বর্গবাসীর স্বর্ণ-মরাল তুলনা তাহার নাই।
ফুল ঝুম্‌কায় মোদের প্রণয়ও যাইতেছি যক দিয়া
অংশ লভিয়া হাসিবে মোদের নাতির নাতির প্রিয়া।

কুন্নুর

আমি চলে যাবো হে বন্ধু মোর—দীর্ঘ তোমার স্থিতি।
বরষ বরষ আনিবে বন্যা উদ্দাম কলগীতি।
এমনি করিয়া ডুবে যাবে কাশবন
ঘাট মাঠ বাট দীন গৃহ অঙ্গন,
খর উচ্ছল ঘন রাঙা জল জাগাবে দারুণ ভীতি।

তোমার দুকুল হইবে শ্যামল পুনঃ হেমন্ত শীতে।
সজ্জিত হবে বেগুনী হরিৎ লাল নীল শ্বেত পীতে।
স্বচ্ছ সলিল দ্রব হীরকের ধার
হয়ত দেখিতে পাবোনাকো আমি আর
পারের ঘাটেতে যাত্রীর ভিড় যেন উৎসব তিথি।

যুগ যুগ পরে কোনো স্থলগনে হয়ত হইবে দেখা।
পথিকের মত পরিচিত তটে আসিয়া দাঁড়াবো একা।
জন্মান্তর সৌহার্দ্দ্যের বাণী—
হয়ত হইবে সমীরণে কানাকানি,
শুধু চেনা চেনা লাগিবে তোমার আধভোলা সুখস্মৃতি।
দিনে শতবার এই যে মিলন এই নেত্রোৎসব,
তোমার জলকে প্রেমাশ্রুর কি দেবেনাকো গৌরব ?

নাগেশ্বরের পরাগের ঝাঁক সম,
ভরা এ বুকের ঝরা অনুরাগ মম,
তোমার জলে কি রেখে যাবেনাকো কিছু ক্ষীণ পরিচিতি !

রহিল তোমার বুকে ভালবাসা ফুলে ফুলে উল্লাস।
আমার আদর রাখিবে ধরিয়া এই বনফুল বাস।
হেরিবে তোমার পাণ্ডু ও সৈকতে
তব খেয়া ঘাটে নির্জন বনপথে,
মোর কবিতায় অটুট পাণ্ডুলিপি পর্য্যুৎসুক হৃদি।

অভাবের আনন্দ

দালান বাড়ী নয়কো মোদের আছে সবার জানা তো,
কিন্তু মাটির আঙ্গিনাতে 'এলুন' বড়ই মানাতো।
ছিলনাক হার ত সোনার কোথায় পাব আমরা তা ?
তারকে দিত হার মানিয়ে মোদের গলার শ্যামলতা।
অভাব ছিল, অভাব ছিল বলছে তারে কে মন্দ ?
কিন্তু তাহার সঙ্গে ছিল স্বভাবজাত আনন্দ।
কারু ছিল ময়না টিয়া পায়রা ঝাঁকে ঝাঁকেতে,
মোদের কোকিল মাৎ করিত কিন্তু সবায় ডাকেতে।
মোদের বাড়ীর ফলন্ত জাম ভোমরা সম কালো সে,
মিষ্ট যেমন, পুষ্ট তেমন, পীচের চেয়ে ভাল সে।
অভাব ছিল, অভাব ছিল বলছে তারে কে মন্দ ?
কিন্তু তাহার সঙ্গে ছিল স্বভাবজাত আনন্দ।
পিপীলিকার মতন অভাব করতো বটে বিব্রত,
দংশন তার ছিল নাক মোটেই এমন তীব্র তো ?
অভাব সাথে থাকতো তখন উৎসাহ আর স্ফূর্তি যে।
ভাঙা বুকের আট্‌চালাতে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি যে।
গরুড় তখন উঠতো উধাও ভাণ্ড সুধার স্পর্শিতে
রুই মাছ এসে ঠোকর দিত পুঁটী মাছের বড়শীতে।
অভাবকে হায় বিশ্রী এমন কুশ্রী এমন করলে কে ?
কার্ত্তিকের সে ময়ূর ভেঙে এ কাল-পেঁচা গড়লে কে ?

রোগশয্যায়

রাঙ্গা রবির উদয় দেখে আনন্দে মোর মন মাতে,
ইচ্ছা করে নূতন দেশে নূতন হয়ে জন্মাতে।
পৌষের নিশির শিশির চাপে—
মুমূর্ষু এই কমল কাঁপে
আবার সে হায় হাসতে যে চায় রবির কিরণ সম্পাতে।

পীড়ায় যখন অবশ তনু ফুরায় যখন আনন্দ,
মৃত্যু যে অমৃত বিলায় নয়কো মোটেই তা মন্দ।
রুগ্ন শরীর নয়ন নীরে—
শাবক হতে চায় রে ফিরে
মায়ের আনন সে চায় শুধু চায়না গোটা কানন তো।

ঝঞ্ঝাহত ভগ্নতরু চায় যে যেতে জাফরীতে,
শিথিল ফুলের কোরক হবার আকাঙ্ক্ষা সব পাঁপড়ীতে।
মুক্তা যে আর বারে বারে
তারের বাঁধন সইতে নারে,
সে চায় যেতে শুক্তি কোলে সাগর-তলে ঝাঁপ দিতে।

ভিড়ের মাঝে হারায় যে মুখ পাই খুঁজে আর কই তারে?
মন-মাঝি আর বইতে নারে বলে নে এই বৈঠারে।
তুফানের এই ভাসান ভেলা
সাঙ্গ করে আলোর মেলা—
অন্ধকারে ফিরছে খুঁজে বাঁধা ঘাটের পৈঠা রে।

হেথায় থাকুক ফুলের বাগান সাজানো এই ঘর বাড়ী,
চলুক ফুলের মরশুম এবং নবীনতার দরবারই।
তুই যে প্রাচীন—তুই যে একা
তোর কি হেথায় মানায় থাকা?
নূতন খেলা পাতবী রে চল নূতন মায়ার কারবারী।

পূরবীতে ললিত মিশে বাজে যখন ভুল বীণা
বিশ্ব যখন নিঃস্ব লাগে সেথায় থাকা চলবে না।

সাহস হারা দুর্ব্বল ভাই
কোথায় আবার মিলবে রে ঠাঁই ?
নূতন দেশে—নূতন ঘরে মায়ের স্নেহের কোল বিনা ?

ঝাপসা লাগা সজল আঁখি নূতন কাজল মাগ্‌ছে রে,
বুভুক্ষিত তপ্ত হিয়ায় স্তন্য তৃষা জাগছে রে।
হতাদরের পরাণ যে ফের
চাইছে সোহাগ মা মাসিদের,
অনাগতের অমৃত ঢেউ অধর কোণায় লাগ্‌ছে রে।

উইল

শতেক বরষ পর—
আমার ভিটায় আসবে যারা আমার বংশধর।
আমাদিকে স্মরার মত
কিছুই হেথা থাকবে না ত
কোন রাখীতে বাঁধবো আমি ভবিষ্যতের কর ?
গরিব গৃহস্থ—
কি বিত্ত যে দিয়েই যাব করছি মনস্থ।
জমিদারী মুক্তা মণি,
স্বর্ণ কিম্বা কয়লা খনি—
নাইক কিছুই, রইবে কদিন খড়ের ছাওয়া ঘর।
এই শেফালী হায়,
থাকবে কদিন ? শুষ্ক বোঁটার রঙ যে উবে যায়।
এই যে শ্যামল মাধবী মোর
থাকবে কিনা ? সন্দেহ ঘোর,
তা'রা রঙিন টবের সারি রাখবে থরে থর।
এই তুলসী তল,
মর্ম্মরেতে পড়বে বাঁধা স্থানটি নিরমল।
আমরা যাহা নয়ন লোরে
করে গেলাম সিক্ত ওরে,
পাথর চাপা থাকবে তাহা হয়ত অতঃপর।

এই পাপিয়া পিক
এত আপন থাকবে না ত থাকবে না নির্ভীক।
তাদের খাঁচার ময়না টিয়া
করবে মুখর ঝঙ্কারিয়া,
নূতন গড়া সুসজ্জিত হর্ম্য মনোহর।
সম্মুখে অজয়
দেবে কি এ ভালবাসার কতক পরিচয়?
তাহার তীরে এই যে বসি
হেরি উজল পূর্ণ শশী,
ধূসর বেলা আকুল করে জলচরের স্বর।
চণ্ডীর এ মন্দির
চিরদিবস থাকবে জানি উচ্চ করি শির।
আরতির এ আলোক মাঝে
এই যে হিয়ার পুলক রাজে
কেমন করে রাখবো ধরে বুঝবে কে তার দর?
যায় রেখে কবি
শুষ্ক কালির আঁখরে তার বুকের সুরভি।
যায় রেখে যায় ভালবাসি
খোঁকার এবং ফুলের হাসি,
বনবিহগের এই কাকলী, উদার নীলাম্বর।
জলের কলকল
বাদল দিনের সজল স্মৃতি, মালতী চঞ্চল।
যাই রেখে যাই মধুর স্মৃতি,
শুষ্ক ফুলের অথই প্রীতি,
যাই রেখে যাই জমাট করে বুকের পরিমল।
কোথায় পাব ধন?
বুক চেরা এই রত্ন হীরা করছি সমর্পণ।
ক্ষুদ্র সুখের দুখের কথা
হাঁটার আমোদ কাঁটার ব্যথা,
ভূর্জ্জপত্রে কস্তুরীর এই রইলো আলিঙ্গন।

মায়ের শেষ চিঠি

[আমার অসুখের কথা শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী এই চিঠিখানি লিখেন—২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪২ সাল উহা পাই—৬ই পৌষ বড়দিন তিনি স্বর্গারোহণ করেন।]

চিঠি খানি মায়ের হাতের লেখা
শুক্রবারে পেয়েছিলাম কবে,
গভীর স্নেহ অমৃতের সে রেখা
ভাবি নাই ত শেষ চিঠি যে হবে।
বুড়া খোকার তৃষিত এই মুখে
মায়ের বুকের শেষ দুধের এ ধার,
শেষের কাজল জলভরা এই চোখে
এ জনমে মিলবে না ত আর।
পরের কাছে মূল্য ইহার নাই
অমূল্য এ আমিই শুধু জানি,
বাৎসল্যের সাম্রাজ্যের এ—ভাই
মায়ের দেওয়া দানপত্র-খানি।
দুধসাগরের মানচিত্র এ গোটা
শেষ আশীষের দুর্ব্বা এবং ধান,
ললাটে শেষ দই হলুদের ফোঁটা
মায়ের লেখা শেষ চিঠি এই খান।

বাবার চিঠি

আর ত ডাকে আসবেনাক বাবার চিঠিখানি,
চিরতরে পথ চাওয়া তার ফুরিয়ে গেছে জানি।
আঁখর গুলি মুক্তাসম,
মুগ্ধ আঁখি করত মম
প্রাণ জুড়াতো সুদূর থেকে আশীষ ধারা আনি।

হায় সে চিঠির মূল্য কত বলবো আমি কাকে
আনন্দের এক রাজ্য গোটা আসত যেন ডাকে।

উৎসব সে পত্র পেলে—
তুল্য তাহার আর কি মেলে ?
মন শুনিত আকাঙ্ক্ষিত কত মধুর বাণী।

সে পত্র যে আশীর্ব্বাদী পারিজাতের পাতা,
কল্পতরুর সে পত্রে আজ নোয়াই আমি মাথা।
দুখের কথা কি আর কব
সুলভ আজি সুদুর্লভ,
সাগর তীরে কাঁদে চকোর অমৃত সন্ধানী।

চাইনে আমি জয়পত্র চাইনেক তায়দাদ
বাবার চিঠি পেতে আবার হয় যে শুধু সাধ
ছাপ দেওয়া সে পত্রগুলি
কোথায় যে যায় আমায় ভুলি,
আমি পেলেই ধন্য হতাম নাইকো কারো হানি।

শীতের অজয়

সিকতায় লীন শীর্ণ সলিল ধারা
আজ জননীর স্নেহ হতে যেন হারা !
কুলে কুলে তারি গড়া সবুজের ভিড়।
তীরে কাশ তৃণ করে উন্নত শির !
তারই সাড়া নাই, পায় সবাকার সাড়া।

ভুলে গিয়াছে সে উদ্দাম নর্ত্তন,
দুকুল ভাসান তুফানের আলোড়ন।
তৃণের মতন তরু ভেসে যায় বেগে,
বেণু নুয়ে পড়ে হিল্লোল তার লেগে
হেলায় ডুবানো গ্রাম প্রান্তর বন।

ভাঙিয়া চুরিয়া উর্বর করি মাটি,
যাত্রা তাহার জয়যাত্রাই খাঁটি।
বক্ষে তাহার কত আবর্ত্ত ওঠে,
রবি শশী তারা সঙ্গে তাহার ছোটে
যৌবনের সে প্লাবন গিয়াছে কাটি।

নাহি গর্জ্জন বাচাল হয়েছে মূক
লভিছে আঘাত-না-দিয়া যাওয়ার সুখ।
বালির বাঁধেতে করে তার পথ রোধ
আজি যেন তার নাহি মর্য্যাদা বোধ,
আছে যেন কার আগমন উৎসুক।

ঘুচেছে তাহার ভারের অহঙ্কার
সমারোহ নাই এ তীর্থ যাত্রার।
জলটুকু ভরা একটি আকাঙ্ক্ষায়,
বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চায়,
ধরা চেয়ে তার মেঘ বেশী আপনার।

ক্ষীণ তোয়ে তার এখন করিছে বাস
কোন্ এক মহা মিলনের উল্লাস।
প্রেমাশ্রু যেন হয়েছে তাহার জল
ঢলঢল করে, নাহি আর কলকল
বুকে পায় মহাসাগরের নিঃশ্বাস।

সাঙ্গ তাহার জীবনের হার জিৎ
কত ক্ষতি আর কতই করেছে হিত,
খসিয়াছে তার দম্ভের নির্ম্মোক
ভিক্ষু হয়েছে আজিকে চণ্ডাশোক
কণ্ঠে তাহার নির্ব্বাণ সঙ্গীত।

নিবেদন

খ্যাতির আমি নইকো কাঙাল যশে আমার দাবী নাই,
আমার কথা ভাব্‌বে যে কেউ সে কথাও ভাবি নাই।
ভয় করেছি পদে পদে
ধনী-মানীর পরিষদে,
দুরাশারি মন্দিরেতে একটি রাতও যাপি নাই।

মিঠা মেঠো পল্লীপথে আনন্দে গান গেয়েছি,
অকূল নদীর বিজন কূলে জীবন তরী বেয়েছি।

কাঁদিয়াছি কান্না হেরি,
উৎপীড়িত লাঞ্ছিতেরি,
ভক্তিপ্রীতি আদর সোহাগ ব্যথার সাথে পেয়েছি।
এসেছিলাম ক্ষণের পথিক হোলির দিনে একা ভাই
পান্থশালায় আবীর রাঙা গানের খাতা রেখে যাই
মাখা অনুরাগের ফাগে,
পূত রাঙা চরণ দাগে,
ইচ্ছা হলে ছিন্ন করো কিম্বা তুলে রেখ ভাই।

দিনান্তে

ধপ্‌ ধপে্‌ হায় মরাল সম যায়রে দিনগুলি,
চক্রবালের অন্তরালে শুভ্র পাল তুলি'।
পাখাতে তার জড়িয়ে গেল
কতই শিশির কতই আলো,
পথের ধূলা পদ্ম পরাগ প্রভাত গোধূলি।
যাত্রা কভু ইন্দ্র-ধনুর রঙিন আলোকে
বৃষ্টি ঝড়ের ঝাপটা কভু লাগ্‌লো পালকে।
কত গীত আর গন্ধ নিয়া,
ব্যথা ও আনন্দ পিয়া
কালের ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া উড়লো কৌশলী।

চরে এরা কোথায় গিয়া কোন মানস সরে?
দীন যে মোর দিনের লাগি মন কেমন করে।
ইচ্ছা করে সুধাই ডাকি
এ পথে আর আসবে নাকি?
ভালবাসা আলোর পাখি ভুল কর ভুলি।

বার্দ্ধক্য

দিবসের রূঢ় আলো লয়েছে বিদায়,
স্বর্ণসন্ধ্যা নামিয়াছে শান্ত আঙিনায়,
শতদল ঝরে গেছে, রেখে গেছে তার
পদ্ম চাকি, উপাদান স্বপ-মালিকার।

দামোদর থামাইয়া প্রচণ্ড নর্তন—
স্বচ্ছ বুকে গগনের হেরিছে স্বপন।
সাঁজে বসি সাজেহান নয়ন সজল
স্মৃতির সমাধি পরে গড়ায় মহল।
সাঙ্গ লেখা 'মেঘদূত' 'কুমারসম্ভব',
সিপ্রাতীরে কালিদাস বসিয়া নীরব।
মন্থনের অবসানে কোথা মন তার?
অমৃতের স্মৃতি বক্ষে বহিছে মন্দার।
কুরুক্ষেত্র শেষে রাখি গাণ্ডীব ও তূণ
মহাপ্রস্থানের কথা ভাবিছে অর্জ্জুন।

নো তে দিবসাঃ গতা

সে দিন বহিয়া গেল হে বন্ধু, সে দিন মোদের গত,
সেই চঞ্চল মুখর নয়ন আজিকে মৌন নত।
ভরা উৎসাহে উৎসুক বুক,
সব পথে পথে চেনা হাসি মুখ,
কোরকে কোরকে অরুণের আলো ফুলে ফুলে মধুব্রত

পিয়াল রেণুতে গোটা বসন্ত মদিরা পিকের ডাকে,
আসি বর্ষার হর্ষ জোয়ার লাগে কদম্ব শাখে।
কণ্টক হতে সাড়া দিত কেয়া,
দীর্ঘ ময়ূরপঙ্খীর খেয়া,
জীবন নদীর মরকত তটে আঁট দিত প্রতি বাঁকে।

সব বিহগের কণ্ঠে কাকলী রৌদ্র উঠান ভরা,
নভ ঘন নীল, সমীরণে মধু, মধুর বসুন্ধরা!
আজ ঝিঙাফুল ফুটিয়াছে হায়,
ঢাকে অঙ্গন পাণ্ডু ছায়ায়,
বায়স তাদের সান্ধ্য কুলায় উড়িয়া যেতেছে ত্বরা।

কোথা পুচ্ছের গৌরব তার কলাপী ভুলেছে কেকা,
ঘন বর্ষার সমারোহ হেরে পিঞ্জরে বসি একা।

যূথি পরিমল, মালতীর বাস,
আনে সে সুদূর দিনের আভাস
কাঁদায় তাহারে রামধমুকের সপ্ত রঙের রেখা।

সেই ক্ষীর সর নবনীর দিন আর ফিরিবার নয়,
তমালের ডালে তোলা হিন্দোলা সেও সেই কথা কয়
গোষ্ঠে যাবার বনপথ মরি
কাঁটা ও গুল্মে দিয়াছে আবরি,
কালো কালিন্দী কান্থর বাঁশীর ভুলে গেছে পরিচয়।

সেদিন বহিয়া গিয়াছে বন্ধু সে দিন মোদের গত।
হের সুমুখের শ্যামতালী বন হইয়াছে উন্নত।
স্নিগ্ধ উজল প্রিয় দিনগুলি
পারে নাই ধরা রাখিতে আগুলি
পোষা শুক সারী অকুলেতে পাড়ি দিল এবারের মত।

গরলের নৈবেদ্য

সোমনাথ

মিটিল না সাধ হয়তো আমায় আবার আসিতে হবে,
সে মূরতি তব না দেখি যে মোর আঁখি উপবাসী রবে
তব দেউলের প্রতি প্রস্তর ভাঙা,
জানি প্রভু মোর রক্তে হয়েছে রাঙা।
অস্থি আমার পাষাণের চাপে পিষ্ট হয়েছে কবে।

ধূলি হয়ে আমি ঘুরি ঝঞ্ঝায় সেই হাহাকার বয়ে,
আগুলি এ-ভূমি আমিই রয়েছি ভগ্নস্তূপ হয়ে।
মোর আঁখিজল পারাবারে আছে মিশে,
শিলা জর্জ্জর মোর বেদনার বিষে,
আছি বাঞ্ছিত-দরশন লাগি শত লাঞ্ছনা সয়ে।

মনে পড়ে সেই নীলাকাশভেদী মন্দির চূড়াগুলি,
স্বর্গসরণি দেখাইছে যেন বিধাতার অঙ্গুলি।
বিরাট দেউল শোভে ত্রয়োদশ তল,
স্ফটিক-সেখানে আছাড়ে সাগরজল,
তীর্থযাত্রী হেরে বিস্ময়ে উর্দ্ধে নেত্র তুলি।

জম্বূনদের সুবর্ণে গড়া দুইশত মণ ভারী—
শৃঙ্খলে ঝোলে ঘৃত-পরিপূর স্বর্ণ দীপের সারি।
চূড়ার উচ্চ হৈমকলসতলে
তারকার মতো সন্ধ্যা হতে যা জ্বলে,
নাবিকেরা সব বন্দি সে-আলো সমুদ্রে দেয় পাড়ি।

কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দনা গাহে সিদ্ধ-সাধকদল,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত সে-গীত সুমঙ্গল।
কত আগ্রহে, কত আনন্দে তাঁরা
রচেন স্তোত্র হইয়া আত্মহারা,
ধেয়ান-মগ্ন কবি সন্ন্যাসী নয়ন প্রেমোজ্জ্বল।

গুহায় গুহায় ক্ষোদিতেছে রূপ গুণী ভাস্করগণ,'
করে অনন্ত মূর্ত্তির কত মূর্ত্তি সে অঙ্কন।
কি অপরিমেয় চির লাবণ্য ধারা
রঙে ও রেখায় ধরিয়া রাখিছে তারা,
পটে ও শিলায় আঁকিয়া রাখিছে তাদের অকিঞ্চন।

দেশ দেশ হতে আসে নর্ত্তক নর্ত্তকী শত শত,
নৃত্যে তাদের কত ব্যঞ্জনা ভঙ্গিমা তায় কত।
অঙ্গে অঙ্গে কি প্রয়াস প্রাণপাত
প্রসন্ন হ'ল প্রীত হ'ল সোমনাথ,
সর্ব অঙ্গে পরমানন্দে প্রকাশ করাই ব্রত।

জুড়ি পত্তন দিবানিশি শুধু তাঁরি আরাধনা চলে,
কেহ পূজে গীতে নাটভঙ্গীতে কেহ বা পুষ্পে জলে।
যোজন প্রসারী সে-দেউল-অঙ্গন,
হেরি মহিমার অযুত নিদর্শন
ভক্তি-ক্ষুব্ধ জন সমুদ্র চলে কল-কল্লোলে।

অরুণ-উদয়ে প্রভাত বেলায় কি ভীড় স্নানার্থীর!
তর্পণ করে করপুটে লয়ে ফেনিল সিন্ধুনীর।
লক্ষ কণ্ঠে একের স্তোত্রপাঠ
মহাভারতের মহামানবের হাট,
শিব-শম্ভুর শ্রীচরণে সেই একসাথে নতশির।

পুণ্যে বিশাল ধর্ম্মায়তন তার সে পূজার প্রথা
নব-জাগ্রত স্বাধীন ভারত ভুলেছে কি তার কথা?
মহাতীর্থের অমৃতাস্বাদ আর
পাবে না কি হায় সন্তানগণ তার?
যুগ যুগ পর এ-স্বাধীনতার তবে কি সার্থকতা?

ক্ষুদ্র শব্দ-গন্ধ-রূপেরও হয় না কখনো লয়,
যাহা ছিল তাহা আবার হইবে নাহি কোন সংশয়।
সত্য মহৎ সুন্দর যাহা টুটে,
পঙ্ক হইতে পঙ্কজ পুন ফুটে,
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সেই অনুকূল বায়ু বয়।

হাজার বছর আগেকার সেই শুভদিন ফিরে আসে
অনাগত স্বর অনাগত রূপ শ্রবণে নয়নে ভাসে।
আসে সোমনাথ নাহি আর নাহি দেরী
জ্যোতির্ম্ময়ের জটার ছটা যে হেরি,
শতদল দশ শত বরষের ফুটে উঠে উল্লাসে॥

মেগাস্থিনিসের সোমনাথ দর্শন

(৩০৫ খ্রীঃ পূঃ)

দেউল কি ? না না, এ বিস্ময়,—
আবির্ভাব সুন্দরের নরের এ হাতে গড়া নয়।
তুঙ্গ মন্দিরের শ্রেণী মিশিয়াছে আকাশের নীলে।
ভূমারে আনন্দঘন আকার কে পাষাণেতে দিলে!
স্বরগের শিল্পী হেথা রেখে গেছে তার পরিচয়।

চূড়াগুলি সব স্বর্ণময়;
সুবর্ণ পরশ উর্দ্ধে 'জেসন' কি করেছে সঞ্চয়,
সঙ্গীত অশ্রুতপূর্ব সুধাস্যন্দী গম্ভীর মহান,
পাষাণ-ভিতরে যেন 'অর্ফিউস' গাহিতেছে গান।
অনন্ত অম্বরে উঠি স্বর্গ মর্ত্য করে সমন্বয়।

স্নাত ভক্ত পূজারীর দল
বিবিধ নৈবেদ্য বহি অবিশ্রান্ত করে চলাচল।
বিনীত বিচিত্র বেশ বর্ণের কি সমরোহ তায়
পুণ্য গন্ধ-পরিবেশে মানুষ সংস্কার ভুলে যায়,
আছেন যে ভগবান মনে আর থাকে না সংশয়।

দেবতা কি করে হেথা বাস ?
জানিনাকো দেখে শুধু বুকে জাগে অজানা উল্লাস।
হিন্দুর এ প্রাণকেন্দ্রে পাওয়া যায় জীবনের সাড়া
সুদূর যুগের গন্ধ সুপ্রাচীন সাধনার ধারা
হেথা আমি প্রজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন হেরি অভ্যুদয়।

সুঠাম পেশল দৌবারিক
যেন শত হার্কুলিস দাঁড়ায়ে রয়েছে নির্নিমিষ।
বিরাট তোরণ দ্বার সুবিশাল সুন্দর কপাট,
অভ্যন্তরে অফুরন্ত অপার্থিব আনন্দের হাট।
ধ্যানমগ্ন যোগীকুল প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে রয়।

এযে দেশ জাতির গৌরব,
সাধু, যাত্রী, পর্যটক সবাকার চিত্ত নেত্রোৎসব।
এ মহা বৈরাগ্য ক্ষেত্রে সবিস্ময়ে হয়ে যাই মূক,
ধর্ম্মের অমৃত সত্রে অপাংক্তেয় আমি আগন্তুক
তবু অবনত শিরে দেবতার গেয়ে যাই জয়।

হুয়েনশাঙ-এর সোমনাথ দর্শন

(৬০৩ খ্রীঃ অঃ)

এই সেই সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ যারে কয় লোকে,
উদ্গীত মহিমা যাঁয় পুরাণের শত পুণ্যশ্লোকে।
এ তীর্থ যোজনব্যাপী সুপ্রাচীন অশ্বত্থের মতো,
ভারতের সব রস শান্তরসে করে পরিণত।
এর দরশনই পুণ্য, এ শুধু মন্দির মঠ নয়,
হেথায় প্রস্তরীভূত জাতির আকাঙ্ক্ষা জেগে রয়।

শুদ্ধ অহিংসার ক্ষেত্র, কোথাও আমিষ গন্ধ নাই,
অপরূপ গন্ধ গীতে পুণ্যের পরশ শুধু পাই।
অদ্ভুত দেবতা এর নাহি জানে মান অপমান,
কখনো বা হলাহল কখনো অমৃত করে পান।
এ ঐশ্বর্য্য ভিখারীর ? এ সমৃদ্ধি, এই আড়ম্বর
ভালো কি লাগিবে তাঁর, ভোলানাথ যিনি দিগম্বর ?

প্রাচীন পবিত্র শান্ত তন্দ্রাবিষ্ট সুন্দর এ দেশ,
দেখিনু অমৃতহ্রদে কি সহস্রদলের উন্মেষ।
উত্থান-পতনে এর ভারতের উত্থান-পতন,
বৈরাগ্যের ক্ষেত্র এ যে ভারতের সর্ব্বস্ব এ-ধন।

হেথাকার ধনী, সাধু, বীর সবে ধর্ম্মভাবময়,
আকর্ষিবে বিধর্ম্মীর শ্যেনদৃষ্টি মোর শঙ্কা হয়।

ভাবে না বিমুগ্ধ জাতি কখন আসিবে সর্বনাশ,
হয়তো শ্মশান হবে তাহাদের অর্চ্চিত কৈলাস।
তবু নাহি নাহি ভয়, সনাতন ধর্ম্মের প্রতীক
পূর্ণতায় যত শক্তি চূর্ণতায় হবে ততোধিক।
রেণুতেই ষড়ৈশ্বর্য্য, বিন্দুতে অমৃত-পারাবার,
স্ফুলিঙ্গে ব্রহ্মণ্যতেজ নির্ব্বাপণ নাহিকো ইহার।

কি বর্ণনা দিয়ে যাব—আসে মনে দ্বিধা ও সংশয়,
দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতায় দিব কি ইহার পরিচয়।
এ বিপুল মহিমায় ম্লান হয় রাজ-রাজশ্রীও,
ভক্তের এ প্রাণরাজ্য একেবারে অনির্ব্বচনীয়।
ভারতের মহাদেব হিন্দুত্বের হে রসবিগ্রহ,
সুপ্রাচীন মহাচীন—তার তুমি প্রণিপাত লহ।

আল্ বেরুনীর সোমনাথ দর্শন

(১০২৪ খ্রীঃ অঃ)

গোটা দেশটাই মন্দির, ওই মন্দির গোটা দেশ,
করা যাবে এরে ধ্বংসি জাতির শক্তিকে নিঃশেষ।
আঘাত নিম্নে, আঘাত উর্দ্ধে, আঘাত ডাইনে বামে,
আঘাত হিন্দুজাতির মর্ম্মে, তার দেবতার নামে।
ধর্ম্মের নয়, অর্থের লাগি এ দেউল লুণ্ঠন,
জানিতে দিবে না স্বজাতিকে তার কূট মামুদের মন।

কি বিরাট এই ধর্ম্মায়তন—দেবের যোগ্য গৃহ।
অদ্ভুত এই স্থাপত্যকলা যুগে যুগে স্মরণীয়।
এ কি সম্পদ, কি ঐশ্বর্য্য বিচিত্র মনোরম,
এ প্রাচীন জাতি কোনো জাতি চেয়ে সুসভ্য নহে কম।
উগ্রতাহীন উন্মাদনায় গভীর ভক্তি ভরে
দার্শনিকের জাতি এরা তবু পাষাণের পূজা করে।

তারা বলে এই গোটা বিশ্বের সবটুকু ভগবান,
সর্ব্বময়ের শিলার সঙ্গে কেন রবে ব্যবধান।
পাথর যে নয় দেবতা তাহা তো হীন জন্তুও জানে,
পাথরে দেবতা দেখে যারা তারা বহু উন্নত জ্ঞানে।
ভাবভূয়িষ্ঠ মন ইহাদের, বুকে অমৃতের ক্ষুধা,
পাষাণ নিঙাড়ি ভক্ত চকোর বাহির করিবে সুধা।

এই মন্দির ভগ্ন করিয়া ফলিবেনা কোন ফল,
ভগ্ন চূর্ণ হইয়া জাতির অধিক বাড়াবে বল।
আনিবে স্তব্ধ আগ্নেয়গিরি হেন অনলোৎপাত,
বিধর্ম্মীদের বিজয়চিহ্ন করিবে ভস্মসাৎ।
প্রলয়-প্লাবনে ধুয়ে মুছে যাবে জয়ের আবর্জ্জনা,
ফুরাইয়া যাবে আবু হোসেনের নবাবির দিন গোনা॥

সোমনাথের মালাকার

ছিল সেথা মালাকার পাঁচ শত ঘর,
এক শত পুষ্পোদ্যান,
ধুস্তর কুসুমের বড়ই আদর
সাদা নীল সোনালী প্রধান।
দোলন জহুরী হেম চম্পক-দাম
ঘন লাল গোলাপের ভিড়,
অতসী করবী কুরুবক অভিরাম
কেতকীর ঝাড় সুনিবিড়।
গুঞ্জা গুলঞ্চ আকন্দ অশোক
কাঞ্চন পলাশ পিয়াল,
দেওমন্দার দ্রোণ কুটজ বসাক
বিল্ব ও শিরীষ বিশাল।
নাগেশ্বরের ছিল সেরা সম্মান
তুলনা ছিল না সুরভির,
তরুগুলি বাঙলার নৃপতির দান
পত্তন গন্ধে অধীর।

পুষ্পিত কাশ্মীর ফুল ভাণ্ডার
উৎপল মানসবলের,
প্রতিদিন আনিত সে শুভসম্ভার
শ্রেণী শেষ বাহক দলের।
আনিত যে অপরূপা মিশ্র কুসুম
উদ্যান করিয়া উজাড়,
কুসুমে ও কুঙ্কুমে লাগাইত ধূম
নিতি সোমনাথের পূজার।
কুমারিকা কর্ণাট দূর গান্ধার,
সৌবীর কোশল মগধ
পাঠাতো নিতুই নব পূজা উপচার
অবনত ভকত জগৎ।
কোটি হৃদয়ের প্রেম হয়ে যেন ফুল
রচিত সে শোভার কাতার
বৃহৎ ভারত ছিল সদাই ব্যাকুল
অর্চ্চনে সোমদেবতার।

সোমনাথ স্মরণে

নয়শো বছর আগেকার দুখ প্রাণ যে ব্যাকুল করে
সুদূর ব্যথার অশ্রু আমার ঝরে।
আমার সকল মর্ম্মে যাতনা জাগে,
আমার সকল অঙ্গে বেদনা লাগে,
বুঝিনে কেমনে নয় শতাব্দী এত কাছে এলো সরে।
নয়শো বছর আগেকার দুখ প্রাণ যে ব্যাকুল করে।
জানি ভাঙ্গা গড়া চলেছে চলিবে—এই জগতের রীতি,
জানি দর্পিরা লাঞ্ছিত করে ক্ষিতি।
ভেঙ্গেছে তাহাতে করিনা অধিক কোপ,
দুঃখ গড়ার শক্তি করেছে লোপ,
জাতীর জীবনে জাগায়ে রেখেছে কাপুরুষতার স্মৃতি।
জানি ভাঙ্গাগড়া চলেছে চলিবে—এই জগতের রীতি।

নয়শো বছর এলো গেল দেখে সেই ভগ্নস্তূপ,
অধঃ পতিত ভারত রয়েছে চুপ।
মর্য্যাদা জ্ঞান বুঝি জাগিবেনা আর,
নিপীড়ন দেছে বদলিয়ে ধাতু তার,
চাহেনা আর সে সেবা অধিকার সম্পদ অপরূপ।
নয়শো বছর এলো গেল দেখে সেই ভগ্নস্তূপ।

সোমনাথের ভগ্নস্তূপ
দেখে কেঁপে ওঠে বুক
প্রোথিত ওখানে ভারতের এক গৌরবময় যুগ।
গৌরবময় যুগ এবং গৌরবময় জাতি
আমাদেরি তারা পূর্বপুরুষ অতি দুর্জ্জয় ছাতি,
দেহে মনে প্রাণে বীর জীবনে মরণে ধীর
চলে গেল তারা উজ্জ্বল করে দেশ ও জাতির মুখ।
টলেনি একটি প্রাণী।
বিপুল বাহিনী সনে লড়িয়াছে মৃত্যুই স্থির জানি।
রণবিদ্যায় শিক্ষাবিহীন পূজারী ও ঋত্বিক
ভক্ত টহলী, ভারী, মালাকার, অতি বড় নির্ভীক,
মন্দির অঙ্গন করি রক্ষণপণ
দেবতার লাগি ডালি দিল প্রাণ নিজেকে ধন্য মানি।
রুক্ষ কঠিন স্তূপ !
অর্দ্ধলক্ষ দধীচীর হাড়ে বজ্রের নব রূপ।
রুদ্ধ ওখানে ধ্রুব প্রহ্লাদ খণ্ডশিলার তলে,
বাসুকীর সব ফণার মাণিক আঁধারে ওখানে জ্বলে,
হোথা নৃসিংহ জাগে স্ফীত কম্পিত রাগে
ওখানে ধোঁয়ায় দেশ ও জাতির মহাজাগরণ ধূপ।
ওই ভাঙ্গা বেদী তলে
অগ্নিমন্ত্রে হও দীক্ষিত তপ্ত অশ্রুজলে।
আকাঙ্ক্ষা যাহা বক্ষে লইয়া তাহারা দিয়াছে প্রাণ—
তাদের কামনা তাদের ধ্যানকে কর নব রূপ দান।
করো সবে বৎস অমৃত উৎস
মূর্ত্ত আবার, স্বাধীন ভারতে তোমাদের ভুজবলে।

কালাতীত

আমি বাস করি হাজার বছর আগেকার সোমনাথে,
ভক্ত ও বীর অধিবাসীগণ সাথে।
প্রত্যুষে মোর নিদ্রা ভাঙ্গায় প্রভাত আরতি রবে
শিবশম্ভুর স্তোত্র গাহিয়া সবে।
হয় রাজপথ মুখরিত গীতে উদিত না হতে রবি
কোটি কণ্ঠের মধুরতা যেন লভি।
সমীরণ আনে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের ধ্বনি বয়ে
ঘৃত গুগ্‌গুল ধূপের গন্ধ লয়ে।
নাচে আনন্দে ডমরুর তালে সাগর তরঙ্গ
নীলকণ্ঠের যাচে যেন সঙ্গ।
গন্ধে বাদ্যে গীতে দিবসের হয় যে উদ্বোধন
প্রণতি জানায় গোটা ভারতের মন।
নিশিশেষ হতে প্রদোষ প্রদোষ হইতে নিশীথ রাত,
কাটেযে সময় লয়ে শুধু সোমনাথ।
গৃহপরিজন সুখসম্পদ সাজানো গৃহস্থলী
সকলি শিবের নৈবেদ্যের ডাঁলি।
সকলি তাঁহার প্রীতি কামার্থ সবই সুন্দর শিব
তিনি মহাকাল তাঁরি রাত্রিন্দিব !
নাহি দ্বেষ ঘৃণা নাহিক হিংসা নাহিক বৈরীভাব
মনে সংযম শান্তি প্রীতির ছাপ।
আনন্দে সব কপোতেরা বসে দেউল বিটঙ্কে
কত আনন্দে কতই না রঙ্গে।
বলিভুক সব বিহগেরা আসি অঙ্গন দেয় ভরি
নির্ভয়ে তারা চারিদিকে ফেরে চরি।
সর্প তারাও শিব শিবানীর প্রিয় বলে পায় মান
একেবারে সেথা নাই হিংসার স্থান।
সব সমারোহ সব উদ্যোগ, সব পূজা আয়োজন
করে জগতের কল্যাণ চিন্তন।
বিশ্বনাথের কাছে তারা মাগে গোটা বিশ্বের হিত,
নীতিবিদ নহে, তাহারা ব্রহ্মবিদ।

সাম্যের দেবে পূজে তারা নিতি সমদম জপেতপে ।
বাহিরে এবং হৃদয়ের মণ্ডপে ।
ঐশ্বর্য্য যে সকলি তাঁহারি দৈন্য ও সব তাঁর
কৈলাস তাঁরি ভয়াল শ্মশান যাঁর ।
মনে পড়ে মোর পূজারীগণের সেই কণ্ঠস্বর,
সোমনাথ মোরে করেছে জাতিস্মর ।
অঙ্গন কোণে অতীব প্রাচীন মেহগ্নি তরু শাখে
শুনি কত রাতে লক্ষ্মী পেচক ডাকে ।
স্নান করে আসি দাঁড়াই নিত্য স্থানটিও ঠিক আছে
প্রস্তরে গড়া বৃহৎ বৃষভ কাছে ।
প্রধান পূজারী হাসি দেন মোরে বিল্বপত্র ফুল
সব মনে আছে হয়না একটু ভুল ।
স্বর্ণবর্ণ মুখ মনে পড়ে কপালে ত্রিপুণ্ড্রক
পুণ্য প্রভায় তনু করে ঝকমক ।
কোথাকার আমি কোথায় ? গিয়াছে কত শতাব্দী সন
তবু এ বুকেতে সে বুকের স্পন্দন ।
কয়টা জনম মৃত্যু গিয়াছে ! ছোট খাটো দেয়া নেয়া,
এক নৌকাই দিয়েছে কয়টা খেয়া ।
এ জীবন বৃথা, সেই জীবনই তো যাপিতেছি দিবা যামী
এ আমি অলীক, সত্য যে সেই আমি ।
হাজার বছর আগেকার সাথে আমার বর্তমান
এক হয়ে গেছে কমাইয়া ব্যবধান ।
এলেন দেবতা উল্লাসে মোর সেই বক্ষই নাচে
সেই চম্পকই ফুটিছে নূতন গাছে ।

শ্রীশ্রী সোমনাথ মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিবসে

(২৭শে বৈশাখ ১৩৫৮)

কলঙ্কময় দশ শতাব্দী গত—
আজ আর মোরা নহিক ভগ্যহত ।
শুভ নবযুগ, শুভ সুপ্রভাত—
যোগ-মগন জাগিলেন সোমনাথ ।

গোটা ভারতের আজি মুক্তিস্নান
পতিত জাতির আজি পুনরুত্থান—
এসেছেন শিব শম্ভু মহেশ্বর
ব্যোম ব্যোম হর হর।
আকাশে বাতাসে অমৃতের ধারা বয়
পার্থিব রজ আজ হল মধুময়।
হাজার বছর আগেকার সেই আমি
নব কলেবরে সোমনাথে প্রণমামি।
অনুরাগ অনুরঞ্জিত সেই প্রাণ
কেবল কয়টা নিঃশ্বাস ব্যবধান।
কিছু জানি আমি না হই জাতিস্মর
ব্যোম ব্যোম হর হর।
বক্ষেতে মোর আজও সে দিনের ব্যথা
চক্ষেতে দেবদর্শন ব্যাকুলতা।
আনো কল্যাণ, মঙ্গলময় শিব
তোমার আরতি হোক রাত্রিন্দিব।
ফিরে পাক দেশ হারানো সে সম্পদ
হউক অজেয় নির্ভীক নিরাপদ।
জনগণে দাও শক্তি লোকোত্তর
ব্যোম ব্যোম হর হর।

শ্রেষ্ঠ কবিতা

আমাদের ভারত

অভ্রভেদী তুষারকিরীট বিশাল হিমালয় ;
আপন করা তাকে বড় সহজ কথা নয়।
দুর্নিরীক্ষ্য অদ্রি বিরাট, নাগাল পাওয়া ভার ;
অন্ত না পাই তাহার রূপের তাহার মহিমার।
আমরা তো সেই হিমগিরির হেরি রাজশ্রী—
পার্ব্বতী যার কন্যা এবং মেনকা যার স্ত্রী।

সিংহ নরসিংহ তাহার মূর্ত্তি ভয়াল অতি।
ভালোবাসি আমরা তাহার থাবার গজমোতি।
সাপের মাথায় মাণিক খুঁজি, দৃষ্টি মোদের তথা ;
তুচ্ছ করি বিষের দহন, বক্র ভীষণতা।
হাঙর-তিমির লবণজলের সাগরে নাই সখ,
মুক্তা যে দেয় সেই সাগরের আমরা উপাসক।

এই ভারতে করেনি ভাগ মোঘল কি ইংরাজ ;
একদিকে তার কামাখ্যা, আর একদিকে হিংলাজ
নিজের জাতির কুষ্টি রেখে গেছে উৎপীড়ক,—
নিভেছে আগ্নেয়গিরি উদ্‌গারি হীরক।
শ্যামের ভারত শ্যামার ভারত অসি-বাঁশীর দেশ ;
মধুময় তার চরণরজ, মধুর পরিবেশ।

ভরা কোটি জ্যোতিষ্কেতে মহান্ নীলাকাশ,
মোদের আকাশ সেই যেখানে ধ্রুব তারার বাস।
মোদের আকাশ স্বচ্ছ সুনীল দিব্য নীলাম্বর,
রাকা চাঁদের সুধার সায়র, রামধনুকের ঘর।
কোথায় মোরা ক্ষুদ্র অনু, কোথায় মহাকাশ !
আমরা ঘটে-পটেই দেখি তাহার যে বিকাশ।

মোদের শ্যামা চামুণ্ডা ন'ন, তিনি তো ন'ন ভীমা,
অন্নপূর্ণা তিনি যে, তাঁর স্নেহের নাহি সীমা।
করেন নাকো কেবল তিনি দৈত্য দলনই,
'কমলে কামিনী' তিনি গণেশ জননী।
দশ হাতে দশ প্রহরণের রাখবো খবর কী,
আমরা দেখি কেবল মায়ের হাতের ঝিনুকই।

ন'ন তো মহাদণ্ডধারী মোদের ভগবান,
অজেয় অগম্য তিনি শুনেই কাঁপে প্রাণ।
আমরা করি ভক্তি ভরে তাঁহার আরতি,
ন'ন তো তিনি কংসারি কি পার্থ-সারথি।
মোদের ঠাকুর দয়াল ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর তিনি—
বাঁশী বাজান, পায়ে বাজে নূপুর রিনিঝিনি।

ভারত মহিমা

ধন্য আমরা পুণ্যবিশাল ভারতের সন্তান,
শত দৈন্যেরও মাঝে মানি মোরা পরম ভাগ্যবান।
ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তির লাগি মোরা করি তর্পণ,
করি যে সর্ব্ব কর্ম্মের ফল নারায়ণে অর্পণ।
মধু রাত্রিন্দিব—
গোটা ভারতের আরতি করিয়া জ্বালি মোরা গৃহদীপ।

(২)

অপবিত্র তো হবে না এ মাটি শুদ্ধ ও সিদ্ধ,
ভক্তের পদ-পরশে নিত্য সে অপাপবিদ্ধ।
এখানে বৃথাই অপ-শক্তির দম্ভ-সৌধ গাঁথা,
চূর্ণ হইয়া ধূলায় মিশিবে বাসুকি নাড়িলে মাথা।
নাহি কোন ভয় নাহি,
জ্বালামুখী শিখা সর্ব্বারিষ্ট সর্ব্বদর্প-দাহী।

(৩)

মন্দির ভাঙি উপলখণ্ড যাহারা গিয়াছে লয়ে,
সে-দেশ সে-জাতি রহিবে না পর, যাবে আপনার হয়ে।

শ্রদ্ধা তাদের থাক্ বা না থাক্, না থাকুক নিষ্ঠা,
অজ্ঞাতে তারা করেছে সেখানে শিবের প্রতিষ্ঠা।
অনেক কষ্ট সহি
বৃথাই তাহারা পাষাণের ভার লয়ে যায় নাই বহি।

(৪)

ভারতের ধনরত্ন লইয়া যাহারা করিছে ফেরি,
ক্ষতি কিছু নাই, বিনিময়ে তারা হয়েছে আমাদেরি।
সপ্ত-নদীর বন্যার জল প্রবেশ যেখানে লভে,
এই ভারতের ভাণ্ডার চির-প্রসারিত সেথা হবে।
ওই বাজে জয়ভেরী—
হরণ করেছে বরণ করিতে করিবে না বেশী দেরী।

(৫)

আনন্দ মোর কতই নিবিড়, কি বিপুল হর্ষ!
আমি ও আমার প্রতি অনুটুকু এ ভারতবর্ষ।
আমি গয়া কাশী, আমি অযোধ্যা, পুরী ও বৃন্দাবন,
আমি কামাখ্যা, আমি কাশ্মীর, সোমনাথ পত্তন।
আমি তো ক্ষুদ্র অতি
কিন্তু বিরাট ওই হিমাদ্রি আমার গোত্রপতি।

(৬)

ভারত-তনয় অমৃত-পুত্র আমি মৃত্যুঞ্জয়,
পুণ্য বাহিনী গঙ্গা আমাকে আদরে অঙ্গে লয়।
হোক ইউরোপ হোক আফ্রিকা হোক না সে আমেরিকা,
আমার চিতার অগ্নি যেখানে সেখানেই হোমশিখা।
যেখানে রবে সে ছাই,
চিরদিন তরে ভারতবর্ষ হয়ে যাবে সেই ঠাঁই।

ভারতের দাস-পর্ব

ভারতের দাস-পর্ব্ব পড়িতে বেদনা যে পাই ভারি,
এ যেন দীর্ঘ হত্যাশালার মাঝ দিয়া পায়চারি।
কে কেমন কি কি ধ্বংস করিল, লুণ্ঠিয়া হ'ল বীর,
কি হবে মাপিয়া লাজ লাঞ্ছনা অষ্ট শতাব্দীর?

কি হবে গনিয়া সজ্জিত সব দস্যুদলের সারি ?
ঘোড়া ও হাতীর নাচ দেখাইল, ঘুরাইল যারা গদা,
নারী হরণের বীরত্ব লয়ে গর্ব্ব করিল সদা,—
কি দিয়াছে তারা ? দেশ ও জাতিকে করিয়াছে শুধু নীচু
উই-ইঁদুরের মেটেগর্ব্বের শুনিবার নাই কিছু।
ও হানা বাড়িতে পেচক ডাকুক, উঠুক গোয়ালিলতা।
সে বিভীষিকার কুশ্রী চিত্র রত কেন অঙ্কনে
ক্ষয়ে যা গিয়াছে কাল-সাগরের তীব্র রসাঞ্জনে ?
কি হইবে রেখে শতাব্দী-চাপে পিষ্ট নষ্ট পাঁজি,
ভগ্ন মগ্ন ডাকাতী ছিপের অর্দ্ধদগ্ধ কাছি ?
মৃত কুমীরের জীর্ণ দন্ত গাঁথিয়ো না আভরণে।
কেটে ফেলে দাও, ছেঁটে ফেলে দাও, রাখ যা সাচ্চা খাঁটি,
ফোসিল হাঙর কচ্ছপ নয়, মুক্তা যা পরিপাটি।
মহা-সাগরের রত্নাকরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,
কাল-তরঙ্গ শুধু বারবার বাড়ালে যাহার মান,
যুগে যুগে যাহা দিবে আশা আলো দিবে আনন্দ বাঁটি।
কৃতঘ্নতা ও নৃশংসতার রঞ্জিত বিবরণ
কলঙ্কিত ও দূষিত করেছে যুগের তারিখ সন।
তাদের উপর নাইকো শ্রদ্ধা নাই মমতার লেশ,
শপ্ত সপ্ত-শতাব্দী কর সাতটা ছত্রে শেষ,
তাই কহ যাতে সুদূরাকাঙ্ক্ষী বলিষ্ঠ হয় মন।
যাহা ঘটে তাই ইতিহাস নয়, কতটুকু তার রহে ?
অনন্ত এই কালসমুদ্রে সদা তরঙ্গ বহে,
চিহ্ন রাখে না, ভাসাইয়া দেয় আবর্জ্জনার ভার ;
দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ ক'রে চলে তার কারবার,
কাঙ্ক্ষিত তরী বন্দরে আনে—অমৃতের কথা কহে।
তাই কহ যাহা দেশকে জাগায়, আনে দিব্যোন্মাদ,
শিশু গরুড়ের কানে এনে দেয় গোলকের সংবাদ।
আনে তপস্বী ভগীরথ কানে গঙ্গার কলগান,
ধরে দধীচির মনশ্চক্ষে জগতের কল্যাণ,
বিন্ধ্যের বুকে জাগায় আবার সূর্য্য-ঢাকার সাধ।

বাঙ্গালী

আমরা বাঙ্গালী হয়তো বা বটি দূষী,
মোদের নিন্দা করে যার যত খুশী।
'মেকলে' করিয়া বিষের কুম্ভ খালি
সাধ মিটাইয়া আমাদের দিল গালি।
'কার্জ্জন' হতে মার্কিনী 'মিস মেয়ো'
গালাগালি দিতে কসুর করেনি কেহ।
ডাকুক মশক, লাগুক যতই মাছি—
যেমন ছিলাম, তেমনি আমরা আছি।

কটা সেনা নিয়ে খিলজি বক্তিয়ার
শুনেছি এদেশ করেছিল অধিকার।
'ক্লাইভ' কয়টা ফাঁকা গোলা-গুলি ছাড়ি
হেলায় নবাবী মসনদ নিল কাড়ি।
নবাবে বধিতে অবাধ করিতে গদী
সবেগে হাজির হইল মহম্মদী।
মির্জাফরের উঠিল নামিল দর,
ছিয়াত্তরের এলো মন্বন্তর।

শিবাজী শাসনে বাঙ্গালী হইয়া দেক্
ইংরেজ রাজে ক'রে নিল অভিষেক।
ভারত-বিজয় করিতে হ'ল না দেরী,
বাঙ্গালী বাজালো বৃটিশের জয়ভেরী।
পাশ্চাত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,
লয়েছে বাঙ্গালী আগে হয়ে আগুয়ান
বাঙ্গালী মনীষা অপ্রতিহত গতি—
সতত সেধেছে ভারতের উন্নতি।

ইংরেজ যবে ত্যজিল ন্যায়ের পথ,
নিরেপেক্ষতা লুকালো স্বপ্নবৎ।
দিলো সত্য ও যুক্তিকে উপহাসি
কুবিচারে যবে নন্দকুমারে ফাঁসি,

স্বেচ্ছাচারের সাথে যবে নিপীড়ন
রাজলক্ষ্মীরে করিল আলিঙ্গন,
জানালো বাঙ্গালী স্পষ্ট সত্য ভাষে—
ঘুন লাগিয়াছে তোমাদের কাঁচা বাঁশে।

এলো দুর্দ্দিন, এলো সন্ত্রাসবাদ,
বিকটদণ্ড, উদ্ভট অপরাধ।
যুধিষ্ঠিরের উষ্ণ শোণিতবৎ
বাঙ্গালী রক্তে রঞ্জিল এ ভারত।
বাঙ্গালী তরুণ ঝাঁকে ঝাঁকে দিল প্রাণ,
আকাশ বাতাস মাতানো তাদের গান।
বাঙ্গালী দেখিল সজল-উজল আঁখি—
তিমিরে ডুবিছে ব্রিটিশের রাঙা চাকি।

নামিল বাঙ্গালী কল্পনালোক থেকে,
জ্যোতির্ম্ময়ের আলোক-আবীর মেখে।
দুর্দ্দমনীয়, মানে না সে আর মানা—
হানাদার ঘরে দেবেই দেবে সে হানা।
যাহারা হেরেছে, করেছে অত্যাচার,
প্রায়শ্চিত্ত হ'ল আরব্ধ তার।
যে যেথায় আছে কীচক দুঃশাষণ,
এলো তাহাদের শোণিতের তর্পণ।
বাঙ্গালী কপিল সগরবংশ দহি
সুন্দর ক'রে গড়িতে চাহে এ মহী।
সাগর তাহারি, গঙ্গা-সাগর তারি
পরশুরামের তীক্ষ্ণপরশুধারী।
তার করতোয়া, তাহার চন্দ্রনাথ,
হয়েছে তাহার কামাখ্যা সাক্ষাৎ,
ভগীরথ তারে দিয়াছেন তপোবল,
নব গঙ্গারে টানিছে সে অবিরল।

বাঙ্গালী দিয়েছে ভারতকে সেরা কবি,
বাঙ্গালী দিয়েছে ভারতকে সেরা ছবি।

বাঙ্গালী দিয়াছে দরদী বৈজ্ঞানিক,
বীরসন্ন্যাসী বাগ্মী অলৌকিক।
দেছে অনশনে দৃঢ়পণে তনুত্যাগী
দেশবন্ধু ও জেতা নেতা অনুরাগী।
বাঙ্গালী ঘটালো অঘটন দুনিয়ায়,
অদল-বদল পূজারী ও দেবতায়।

সোনার বাংলা ঘেরা মহাপীঠ দিয়ে,
বেড়েছে বাঙ্গালী সতীর স্তন্য পিয়ে।
শবসাধনায় করেছে সিদ্ধিলাভ,
হেরেছে 'কমলে কামিনী' আবির্ভাব।
বাঙ্গালী প্রেমিক রসের ব্যবসা ক'রে
গৌর করেছে সে-ই শ্যামসুন্দরে।
তাহার জ্ঞানের ক'জন নাগাল পাবে,
কাঁদিয়া আকুল পুরুষ-প্রকৃতি ভাবে।

পৃথক ধাতুতে গঠিত এদের হিয়া,
বজ্র এবং ব্রজের নবনী দিয়া।
বিজয়ায় এরা কাঁদিয়া ফুলায় আঁখি,
করুণা-কোমল হেন জাতি আছে নাকি ?
জগৎকে এরা আপন করিতে চায়,
মুখের অন্ন পরকে বিলায়ে খায়।
করিবে বাঙ্গালী ভুবন কান্তিমৎ
শুচি-সুন্দর শুদ্ধ শান্ত সৎ।
'এটম বম' কি লয়ে 'কসমিকরে'
সৃষ্টির নাশ করিতে আসেনি সে।
দেশকালজয়ী তাহার আবিষ্কার,
ঘুচাইয়া দিবে বিশ্বের জরাভার।
বাঙ্গালীর ভাষা মুগ্ধ করিবে ধরা,
জীবনীশক্তিভরা তা মধুক্ষরা।
সুসভ্যতর হইবে জগৎ যবে
বাংলা ভাষায় মন্ত্র রচিত হবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গার এই দেশ
নব চেতনার করিয়াছে উন্মেষ।
বাঙ্গালী জাতিই বাঁচাইবে এ ভুবন,
রণমুখী নয়, হরিমুখী করি মন।
সুধাসত্রের সেই অধিকারী ভাবী,
সারা ধরণীর গুরুপদে তার দাবী।
ভালে দাও তার প্রথম হোমের টিকা,
গালে উষ্ণতা, সন্ধ্যাদীপের শিখা॥

স্থপতি

দীপ নাম তার, ভাস্কর তারা, বহুদিন হেথা বাস,
গৌরবময় বংশের ইতিহাস।
পাঠশালে মোর সহপাঠী ছিল, মেধাবীও ছিল বটে,
আজ ভিক্ষুক, কপালে যা থাকে ঘটে।
ভাবিনু এবার তীর্থ ভ্রমণে যাইব একটু দূর
সমুদ্রতটে পুরী জগবন্ধুর।
দীপ আসি মোরে আগ্রহে বলে, "সঙ্গে যাইব আমি,
টেনেছেন মোরে পুরীর জগৎ স্বামী।"
মাসেক কাটানু পুরীধামে, পেয়ে তৃপ্তি দেহে ও মনে
জগন্নাথ আর জলনিধি দর্শনে।
দীপ খায়-দায় ঝিমায় ঘুমায়, রহে সে আপন মনে
বেড়াতে গেলাম কোনারকে দুইজনে।
বিশাল সূর্য্য-মন্দির যেই চক্ষে পড়িল ,তার
নূতন মানুষ—সে দীপ নহে সে আর।
উল্লাসে তুলি অঙ্গুলি তার দেখালো দেউল মোরে
সুন্দর এক সূর্য্যোদয়ের ভোরে।
হেরি সুগঠিত পাষাণ প্রতিমা, আগে চোখে পড়ে যেটি.
দীপ বলে, "আজো দাঁড়িয়ে আছিস বেটি!"
সব যেন চেনা, চলেছে ক্ষিপ্র দীপ্ত পদক্ষেপে,
জাগে যৌবন সর্ব্বশরীর ব্যেপে।

প্রতি প্রস্তর প্রতিটি মূর্ত্তি নেহারে বারংবার,
ওরা জীবনের শিলালিপি যেন তার।
পাষাণপুষ্প গন্ধ বিতরে, ছবি যেন হাসি নমে
যুগান্তরের সুহৃদের সমাগমে।
সম্ভ্রমে তারে ডাকিয়া বলিনু, "ফিরিতে হবে যে ত্বরা!"
দীপের চক্ষু এখনো স্বপ্নভরা।
কহিল—"বন্ধু, অপেক্ষা কর, দেখ হয়ে সুস্থির
আমার হস্তে গড়া এই মন্দির।
আমি করিয়াছি পাষাণের এই সূর্য্য-অর্ঘ্যদান,
কালের পরশ করিতে নারিবে ম্লান।
গড়িয়া দেউল লভেছিনু আমি সবিতার কাছে বর
এখানে এলেই হইব জাতিস্মর।
হেরিয়া দেউল ফিরিয়া পেলাম পুরানো মমতা প্রীতি,
মানসে জাগিছে জন্মান্তর-স্মৃতি
অর্কপুষ্প, বনঝাউ যেথা দুলিতেছে সমীরণে
প্রথম দাঁড়ানু ওখানে রয়েছে মনে।
রাজার নিদেশে প্রথম পাথর স্থাপিনু যখন আসি,
খণ্ডচন্দ্রে হেরিনু পৌর্ণমাসী।
সে কি আনন্দ, সে কি উচ্ছ্বাস, আমোদিত ভূর্ভুব,
চৌদিকে ধ্বনি, 'আরম্ভ হোক শুভ'।
বিপুল জনতা, ধ্বজা ও পতাকা বাদ্য শঙ্খরব—
মনে পড়ে সেই যজ্ঞ-মহোৎসব।
গায়ত্রীকে যে আমি দেখিয়াছি হইতে মূর্ত্তিমতী,
সৃষ্টি আমার হইয়াছে শাশ্বতী।
এই বিটঙ্কে কপোত-কপোতী দু'জনে থাকিত বেশ,
মন্দির গড়া তখনো হয়নি শেষ।
কর্ণিক দিয়া পাষাণে পাষাণে এইখানে দিনু জোড়;
দেখিনু নৃপতি পার্শ্বে দাঁড়ায়ে মোর।
বিদায়ের দিনে ওই দেহলীতে রাখিনু যন্ত্রপাতি,
উত্তরায়ণে শেষ প্রস্তর গাঁথি।"

আমি নির্ব্বাক, বিমুগ্ধ মোরে করিয়াছে যাদুকর।
যা দেখায়, দেখি—অনিন্দ্য সুন্দর।
দীপ তেজোময় সর্ব্ব অঙ্গে জ্যোতি কি অপার্থিব,
কথায় আমি কি বর্ণনা তার দিব ?
হেরিনু তাহার সত্যমূর্ত্তি শুনিনু সত্যভাস,
জন্মান্তর করি আমি বিশ্বাস।
আমার সঙ্গে দীপ গিয়াছিল বলিয়া ফেলেছি ভ্রমে,
দীন গিয়াছিল রাজেন্দ্র-সঙ্গমে॥

নমস্কার

দেশের লাগিয়া যারা দলে দলে হেলায় দিয়াছে প্রাণ,
কঠিন কারার কক্ষে যাদের হ'ল দিবা অবসান,
যাদের শোণিতে রঞ্জিত হ'ল মেঘনা গঙ্গা রাবী,
বিধাতার কাছে সব আগে হ'ল পেশ যাহাদের দাবী,
বড় বড় প্রাণ ডারি দিয়া যারা, বড় করিয়াছে দেশ,
অসীম যাদের সাহস এবং অশেষ যাদের ক্লেশ—
তাদের বারংবার
আজি শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

২

যুগের যুগের যেই কবিদল শিঙা বীণা বাঁশরীতে
পরাধীনতার যাতনা জাগালে—উন্মাদনার গীতে।
সবাই স্বাধীন এ বিপুলভবে ভারতই ঘুমায়ে রবে ?
ঠাঁই কি পাবে না সে স্বাধীনতার সুধার মহোৎসবে ?
আট-শতাব্দী-ব্যাপী স্বজাতির হীনতার অপবাদ
হৃদয়-রক্তে ধুয়ে দিতে যারা করিল ডঙ্কানাদ—
তাদের বারংবার
আজ শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

৩

সুদূরদর্শী মনীষী যে সব দিব্যদৃষ্টিমান,
ধ্যানে নেহারিয়া দেশের এ-রূপ গাহি বন্দনা গান,

ভবিষ্যতের এ মহিমময় দিনের পাইল টের,
রসনা যাদের আস্বাদ পেল অনাগত অমৃতের,
ব্যথিত করিল যাদের হৃদয় পরাধীনতার গ্লানি,
শব-সাধনায় জাতিরে জাগালো দিয়া অভয়ের বাণী—
তাদের বারংবার
আজি শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

৪

কটিবাস-পরা যে-মহামানব নীরব তপস্যায়
এ-দেশ জাতির মুক্তি আনিল কেবল অহিংসায়,
কোনো দেশে কোনো যুগে যাহা হয়নি অনুষ্ঠিত
সেই অসাধ্য সাধন করিয়া,—ধরা হ'ল বিস্মিত।
মনুষ্যত্বে হ'ল বড়, যারা বড় ছিল পশু বলে,
সিংহ তাহার কেশর লুটালো সাধুর চরণ-তলে—
তাঁহাকে বারংবার
আজ শুভদিনে গোটা এ-ভারত জানায় নমস্কার।

৫

এসো স্বাধীনতা চিরকাঙ্ক্ষিত, ছিলে হয়ে তুমি পর,
চেয়ে আশাপথ ছিল এ-ভারত সহস্র বৎসর।
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর তুমি পুন ইহার মৃত্তিকায়,
মহাভারতের গৌরবময় যুগ যেন ফিরে পায়।
হোক খণ্ডিত—অখণ্ড হতে হবে না অধিক দেরী,
বাজিয়া উঠুক শঙ্খ ঘণ্টা সঘনে বাজুক ভেরী।
চরণে বারংবার
গোটা এ-ভারত আজি শুভদিনে করিছে নমস্কার।

ভৃগু মুনি

কৃষ্ণের বুকে পদাঘাত করি,
চলে ভৃগুমুনি বনপথ ধরি,
কিন্তু মুনির মনটা বড় বিষণ্ণ।
কহে চার্বাক পথে হয়ে সাথী,
শক্তিমানকে মারিয়াছ লাথি
গৌরব সে তো, বেদনা মনে কি জন্য ?

সবে ভয়ে করে যাহারে প্রণাম
জানাইয়া দিলে তাকে তার দাম,
জগতের ভয় ভাঙালে, এতে কি দুঃখ ?
ভৃগু কন, শোন্ মূঢ় তোরে কই
করিয়া আঘাত দুঃখিত নই,
তাঁর ক্ষমা মোরে ব্যাকুল করেছে, মূর্খ !
শুনি তাঁর বুকে পদ ঠেকাইলে
অনন্ত কাল নরক যে মিলে,
তাই গিয়াছিনু তাঁরে পরীক্ষা করতে।
সর্ব্বশক্তিমানের বিনয়
দেখিনু তাহাতে টলিবার নয়,
অনন্তকাল হবে মোরে কেঁদে মরতে।
নরক-যাতনা ছিল যে রে ভালো,
ক্ষমায় আমার বুক জ্ব'লে গেল,
আঘাত করিয়া কি আঘাত পেনু বক্ষে।
ষড়ৈশ্বর্য্যে নাই অভিমান
অধমে করে সে মর্য্যাদা দান,
অনুতাপ-বারি রুধিতে পারি না চক্ষে।
তাঁরে পদাঘাত করা খুব সোজা,
শক্ত তাঁহার মহিমাটি বোঝা—
করুণার তাঁর নাহি রে নাহি রে অন্ত।
যিনি জগদীশ বিশ্বম্ভর
সব পদ পড়ে তাঁহার উপর,
তাঁর পদ পায়—সে বড় ভাগ্যবন্ত।

কঃ পন্থা

সভ্যতার সে রোমীয় গতির হয়নি ব্যতিক্রম,
'কেপুয়া' হইতে আমরা চলেছি রোম।
সভ্যতার আজ রন্ধ্রে শনিগ্রহ,
চারিদিকে শুধু ক্রীতদাস-বিদ্রোহ
সারি সারি সব ঝুলিতেছে ক্রুশে, এ নহে স্বপ্ন ভ্রম

২

কেপ্টয়া কোরিয়া কোজো কেনিয়ায় বিশেষ প্রভেদ নাই,
কাজ করিতেছে একই সে সভ্যতাই।
বাড়িছে শত্রু—যতই হতেছে নাশ
নব নব রূপে আসিছে 'স্পার্টাকাস'
এ-পথে কেবল পচা কৃষ্টির আমিষ গন্ধ পাই।

৩

আনন্দ পায় জাতি নিপীড়নে ভয়াল নির্যাতনে,
সুরুচি শরম গিরাছে নির্ব্বাসনে।
দেখি মুমূর্ষু গ্লাডিয়েটারের দল
হাসিছে জনতা উল্লাসে চঞ্চল,
যাহা নির্ম্মম, রোমাঞ্চকর, তাই দেখে তাই শোনে।

৪

শুচি ও সূক্ষ্ম রসানুভূতিতে আসিয়াছে অবসাদ,
এলো জঘন্য কদর্য্যতায় সাধ।
সংঘাতে, প্রতিহিংসা লোকক্ষয়ে
জাতির স্ফূর্ত্তি তৃপ্তি লুকায়ে রহে,
নরহত্যাই সব চেয়ে হ'ল লঘুতম অপরাধ।

৫

বিভীষিকা আর বীভৎসতার হ'ল সবে উপাসক,
কাপালিক-ব্রতে সিদ্ধি লভিতে সখ।
মানুষ তো আর নহে কল্যাণ কৃৎ,
ধ্বসিয়া গিয়াছে সাধু-সমাজের ভিত,
জ্ঞানের আলোক কালাগ্নি হয়ে জ্বলিতেছে ধক্ ধক্।

৬

নগরী যখন পুড়িত তখন 'নীরো' বাজাতেন বীণা,
তাতে ছিল তবু সুর শিল্পীর চিনা।
বীণা না বাজায়ে 'বোমাই' বাজায় যারা
নীরোর চেয়ে কি বেশী সদাশয় তারা ?
দহে হিরোসিমা, তপে বর চায় ধ্বংস, হিংসা, ঘৃণা।

৭

সভ্যতা এলো সূক্ষ্ম শরীরে পরমাণু পর্য্যায়ে ;
'র‍্যাটল' সাপের 'টোটেম' তাহার গায়ে,
হাতে ঠগী-ফাঁস, কনক-কলস কাঁখে,
উচাটন আর মারণ মন্ত্র হাঁকে,
বিভেদ এবং বিপ্লব-ডাকা মঞ্জীর তার পায়ে।

৮

'কেপুয়া' হইতে রোমের পথেই গতি তার অভিরাম,
ঘৃণ্য যা তাই লাগিতেছে অবিরাম।
সৃষ্টি যে আজ পুষ্টি চাহিছে দিতে
ইতিহাসে নয়, গোয়েন্দা কাহিনীতে।
ইহার লাগিয়া অপেক্ষমান পম্পীর পরিণাম।

এহ্যেহি

হে, প্রভু আসিছ তুমি কি ?
রাঙা হয়ে কেন উঠিতেছে ধরা জানিতে পেরেছে ভূমি কি ?
জনসমুদ্র কেন উতরোল ?
কোথা থেকে উঠে হেন কল্লোল ?
আবর্ত্তময় যত পল্বল দেখিয়া দাঁড়াই থমকি'।

(২)

তুমি কি আসিছ হে কেশব ?
র'য়ে র'য়ে মোর কানে যে পশিছে তব অশ্বের হ্রেষারব !
খর করবালে রক্তের রেখা—
করে ঝলমল, কেন যায় দেখা ?
মণ্ডলী রচি নর্তন করে নারায়ণী সেনা ও কি সব ?

(৩)

ওকি উৎসব মরণের ?
এই চরাচর ইঙ্গিত পেল বুঝি তব অবতরণের।
উন্মাদনায় যায় জীব মরি,
কদম্বরেণুসম পড়ে ঝরি'—
হিন্দোলে এসে ঘন দোল দেয় কোন্ সে শঙ্কাহরণের ?

(৪)

কুসুমে ঢেকেছে পিয়ালে,
জীর্ণ শীর্ণ মৃতকল্পেরে এমন ক'রে কে জিয়ালে ?
প্রলয় দোলের রাঙা পিচকারী
বিস্মিত ভীত—চিনিতে যে পারি,
ভুবন ভরিয়া উড়ে রাঙা ফাগ ও মরণবাহী খেয়ালে।

(৫)

দেখি আঁখি মেলে কি করি ?
কিরীটে তোমার কোটি সূর্য্যের কিরণ পড়িছে ঠিকরি।
তীব্র জ্যোতিতে হারা হ'ল সব,
তুমি ছাড়া নাহি কিছুই কেশব,
ছন্নছাড়া এ-বিশ্বে বাঁধুক তোমার প্রেমের নিগড়ই।

(৬)

বট' হে, তুমিই বটহে,
পাঞ্চজন্য কম্বুনিনাদ পশিছে কর্ণপট' হে।
নহে আনন্দ, নহে সৎ চিৎ,
এ বিশ্বরূপ লোকক্ষয়কৃৎ,
নূতন যুগের করিতে সূচনা হ'লে প্রলয়ের নট হে।

(৭)

কই শার্ঙ্গ ও-পাণিতে ?
দুষ্কৃতদলে দলিতে আসিছ, সাধুরে অভয় দানিতে।
মহাসমুদ্র উঠিছে কাঁপিয়া,
জীবময়ী ধরা উঠিছে কাঁপিয়া,
করাল কোটাল জোয়ার আসিছে শফরী পেরেছে জানিতে।

(৮)

ধরাতলে লুটে প্রণমি,
ভুবন টলানো তব আগমন এই লীলা গনি চরমই।
বহুদিন পরে আসিছ আবার
উদ্বেল করি সুধাপারাবার—
রেখে যাই নতি—জানিনে রহিব কোথায় কি হয়ে জনমি'।

অর্জ্জুন

মহাপ্রস্থান ঘনায়ে আসিছে, স্থির হয়ে আছে দিন,
যাবে পাণ্ডব—ধরা বান্ধবহীন।
কর্ম্মব্যস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ আজি অবসাদময়—
এবার যাত্রা দিগ্বিজয়ের নয়।
নগরের আলো মিট মিট করে, নীরব নাট্যশালা—
বিরাট বিদায়-আরতির এলো পালা।
রাজ কার্য্যেতে শ্লথ শৃঙ্খলা, কঠোরতা চারিপাশে,
বসন্ত যায়—জানায় নিদাঘ আসে।
পার্থ সমীপে দাঁড়ালো জনেক চিত্রশিল্পী আসি,
আলেখ্য তার দেখাইতে অভিলাষী।
কহিল বিনয়ে, "হে পরন্তপ, তোমার কীর্ত্তিগুলি
রঙে ও রেখায় এঁকেছে আমার তুলি।
সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব কালের অগ্রগণ্য বীর
হেরি আনন্দে ঝরে মোর আঁখিনীর,
তন্ময় হয়ে আঁকিয়াছি ছবি দ্বাদশ বর্ষ ধরি,
সময় হবে কি ? দেখিবেন দয়া করি !'
লভি অনুমতি, শিল্পী তাঁহাকে দেখান চিত্রাবলী
যেন সজ্জিত পুষ্পের অঞ্জলি।
যাজ্ঞসেনীর স্বয়ম্বরের সভা ওই দেখা যায়,
চন্দ্রের পরিমণ্ডল ধরা গায়।
মৎস্য-চক্র ভেদ করিছেন কিশোর সব্যসাচী,
বিপুল জনতা হেরে সাফল্য যাচি'।
চিত্রসেন ঐ দুর্য্যোধনকে কুরুকুলবধূসহ
ধ'রে লয়ে যায়—লজ্জা দুর্বিষহ।
শরজালে তার পথ রোধ করি রোষে ফাল্গুনী ক'ন,
'চেন না উনি কে ? নৃপতি দুর্যোধন।
বিচার-বিমূঢ় জেনো ভায়ে ভায়ে কলহ থাকুক যত
আজ মোরা ভাই পঞ্চোত্তর শত'।
রণে মহাবল চিত্রসেনকে বন্দী করিয়া আনি'
ওই শুনিছেন যুধিষ্ঠিরের বাণী।

বিরাট গোগৃহে যুঝিছেন দেখ বৃহন্নলার বেশে—'
চেনে শত্রুরা শরের আঘাতে শেষে।
তারপর হের কুরুক্ষেত্রের কপিধ্বজের পর
মুহ্যমান সে পার্থ ধনুর্ধর!
কৃষ্ণের তনু মাধুর্য্যময় স্বেদের বিন্দু ভালে,
বাণীরূপা গীতা আলোক অন্তরালে।
শরশয্যায় তৃষিত ভীষ্ম, গাণ্ডীবী চঞ্চল,
ভোগবতী ধারা উঠে ভেদি ধরাতল।
ওই দহিছেন খাণ্ডব-বন, ওই হের শরে শরে
রচিছেন সেতু নীলাম্বুধির পরে।
যত বিক্রম যত লাবণ্য, সংযমী তত তিনি,
অভিমানে ফেরে উর্ব্বশী গরবিণী।
প্রতি চিত্রটি রঙে অনুপম, নাহিক অঙ্গ হানি,
জয়-মুখরিত জীবন-নাট্যখানি।
হেরিয়া পার্থ প্রীত-বিস্মিত, শিল্পীরে ডাকি ক'ন,
'সত্যই তব চিত্র অসাধারণ।
কিন্তু কেন এ রঙ ও রেখার করিয়াছ অপচয়?
তব অর্জ্জুন এ অর্জ্জুন তো নয়।
ও অর্জ্জুন যে চির-কিশোরের বন্ধু ও অনুচর,
দেখিছ না মোর নিত্য রূপান্তর?
তোমার দিব্যবর্ণে তুলিতে তিনি রহিলেন বাঁচি,
মহাপ্রস্থান-পথে আমি চলিয়াছি।
একটি ছবি যে, হে চিত্রকর, আঁকিতে রেখেছ বাকি,
ভবিষ্যৎকে এখনি দিও না ফাঁকি।
তোমার অজেয় ওই অর্জ্জুন কৃষ্ণ সারথি হারা
কত অসহায় জানে দর্শক যারা;
ছিল না শক্তি তুলি গাণ্ডীব শত্রুকে রোধিবার,
লুটে নিল তারা দ্বারকার ভাণ্ডার।
তাঁহাকে খেলার পুতুল করিও, কৃষ্ণকে বাজিকর,
সে ছবিই হবে সত্য ও সুন্দর।'

বিন্ধ্যের আনন্দ

গর্ব্বিত মন, অভ্রংলিহ শির
যেন বিস্ময় মুগ্ধ ধরিত্রীর ।
বিন্ধ্য মূর্ত্ত দম্ভ দর্প ক্রোধ
উঠিছে করিতে সূর্য্যকে অবরোধ ।
দাঁড়ালেন তার সমুখে সহসা আসি,
স্নিগ্ধ দৃষ্টি বদনে মধুর হাসি,
ঋষি অগস্ত্য, বিন্ধ্যের গুরু তিনি,
করেন সাগর গণ্ডুষে পান যিনি ।
উদ্ধত গিরি সচকিত সম্ভ্রমে
হেরি গুরুদেবে ভূমে লুটাইয়া নমে ।
বিন্ধ্য গুরুর পদরজ—অভিষেকে
নবীন চেতনা লভিয়া ভুবন দেখে ।
কোথা অহমিকা আত্ম প্রতিষ্ঠার,
আত্মসমর্পণে-ই তৃপ্তি তার ।
সূর্য্যকে রোধ করুক যাহারা পারে,
বিন্ধ্য বিলীন একটি নমস্কারে ।
প্রতাপ-পিয়াসী পাহাড় নহে সে আর,
অফুরন্ত সে একটি নমস্কার ॥

গ্রামের পথে

আমার গ্রামের পথে আমার ঘুরে বেড়ায় মন,
যেমন নদীর ঢেউয়ে নাচে প্রভাত-সমীরণ ।
পরিচিত পথের গাছে
কি মমতাই মাখা আছে,
ঘাসের ছোট ফুলটি যেন করছে আলাপন ।
এমন শ্যামল এমন কোমল লতা কোথায় আর ?
ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে শীর্ণ তনু তার !
কি যেন এ পথের ধূলি
করলে নরম সোহাগ গুলি',

সূর্যকরে পাই যেন তার করের পরশন।
ফিরে যদি জন্মাতে হয়, এই করুণা চাই—
এই গ্রামেতেই দিও দয়াল ফিরে আমার ঠাঁই।
দেবালয়ের এ অঙ্গনে
আসব আবার শুভক্ষণে,
তুচ্ছ করি' ইন্দ্রপুরী নন্দন-কানন ॥

পুরাণো বাড়ী

শিউলির গাছ দুটি দুয়ার গোড়ায়
তলে ফুল বিছাইয়া ফিরাইতে চায়।
দক্ষিণে সারি সারি হাস্নুহানা,
ছেড়ে যেতে বার বার করিছে মানা।
মালতী মাধবী বেলা চামেলী ও জুঁই
আমার প্রিয়ারে বলে—'কোথা যাবি তুই'!
আম তাল বেল তরু বলে—'কিবা ভয়!
মোরা আছি, তোরা থাক, ফাঁপুক অজয়'।

(২)

মাথা নাড়ে বেনুবন, ওই বুড়া বট,
বহু দিন কাটায়েছি তাদের নিকট।
শাখে শাখে আজও পিক পাপিয়া ডাকে,
মৌমাছি গুঞ্জন করিতে থাকে।
এখনো ছাড়েনি বাড়ী কপোতগুলি,
বুলবুলি ঘুরে ফিরে আসে কেবলি ;
এখনো আসিছে ঝাঁক কাক শালিকের,
সঙ্গ ছাড়েনি তারা গৃহ মালিকের।

(৩)

অর্দ্ধেক ভিটে হ'ল অজয়ের চড়া,
তবুও তা এ কি কত মাধুরীভরা।
আধা তার স্বর্গেতে আধেক ধরায়,
জোড় মানাইতে দোঁহে সুধা যে গড়ায়।

কল্পনা বাস্তব দুই তীরে হায়
মুখোমুখি হয়ে আছে চখাচখী প্রায়।
পূর্ব্ব ও উত্তর মেঘের মাঝার
এ অজয় যক্ষের চক্ষের ধার।

(৪)

মোর প্রিয় বাড়ী বটে ভাঙ্গিছে অজয়,
সে দরদী শিল্পী যে দেয় পরিচয়।
শোভে বাড়ী, আহা একি ভাঙনের ছাঁদ !
মহাকাল-ভালে এ যে তৃতীয়ার চাঁদ।
মনে ভাবি, ভাসাইল কে কৃপা করি'
মন্দাকিনীতে মোর কাঠের তরী।
ভাগ্য এ ! নর আমি ছিলাম সেথা—
এখন সেখানে বাস করে দেবতা।

(৫)

করি আমি জয়দেব-পাদোদক পান,
আমার এখানে বহে অজয় উজান।
বলে নদী কলকল মধুর স্বরে—
জলধারা দিয়ে আনি লক্ষ্মী ঘরে।
অভিষেক অন্তে অ-মৃত নীরে তার
অপরূপ হয়ে গৃহে ফিরিবে আবার।
সেই সুখ উৎসব শান্তি নিবিড়
পুনরায় তার বুকে পাতিবে শিবির॥

স্মৃতির খেয়াল

বিস্মিত হই, হই যে অবাক—স্মৃতির খেয়াল দেখে,
কত সমারোহ ঢেকে মুছে দেয়, ছোটোখাটো ছবি রেখে।
কোথা বর্ণের উজ্জ্বল ছটা—কেমনে এমন ঘটে ?
ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ ক্ষণিকের ছবি অটুট চিত্তপটে।
কারে কি যে দেয় দর !
শুকায় বারিধি বড় বড় নদী, বহে যায় নির্ঝর।

(২)

আষাঢ়-গগনে নব ঘনঘটা দেখালো যে মোরে ডাকি',
মূরতি তাহার সে শোভার সাথে স্মৃতি যে রেখেছে আঁকি'।
কতই আষাঢ় এলো গেল পুন করিনি তাদের খোঁজ,
বিচিত্র এই চিত্রে দিয়েছে নূতন রঙের পোঁচ।
ব্যাপার কি অদ্ভুত!
দামী হ'ল মোর জীবন-আষাঢ়ে মেঘ চেয়ে মেঘদূত?

(৩)

মাঠের মাঝারে রেলের স্টেশন, গাড়ীতে তুলিয়া দিতে
বন্ধু এলেন, তুচ্ছ ঘটনা—অঙ্কিত আছে চিতে।
তিনি নাই আর, নামি গাড়ী হতে—দ্রুত চ'লে যায় ট্রেন,
তীর্থ হয়েছে এখন আমার সেই সে ইস্টিশেন।
স্মৃতি বেছে নিল কি রে—
গোলাপগুচ্ছ, চম্পক ফেলি'—ছোট আকন্দটি রে?

(৪)

গভীর রাত্রে চলেছে গো-গাড়ী, 'আউচ' ফুটেছে কোথা?
এখনো আমার বক্ষে তাহার গন্ধের মধুরতা।
ভুলেছি জলসা বাদ্য ভাণ্ড নৃত্য-গীতের জাঁক,
মনে পড়ে শোনা সুদূর 'চুনারে' সাঁঝ-শিয়ালের ডাক।
বলেছিনু. ওগো দেখো—
উহাদের সাড়া বিনা আমাদের সন্ধ্যা মানায় নাকো।

(৫)

বাঙালীবাবুটি 'সান্তারা' কেনে ফেরীওয়ালাকে ডাকি',
'আম্বালা'র এক ভবন দুয়ারে, সেটা স্মরণীয় নাকি?
ক্ষণিক আলাপে 'লুণ্ডি কোটালে' হাতে দিল মোর হাসি'
দুইটি আপেল, যুবক জনেক 'খাইবার-পাস' বাসী।
কোথা বড় বড় দান?
স্মৃতি করিয়াছে কেন জানি নাকো উহাই মূল্যবান।

(৬)

মনে পড়ে দূরে ছাদ হতে সেই রুমাল ওড়ানো কার?
কাঁধে ছোট নাতি, মেলা হতে ঘরে ফেরে শিখ সর্দার।

জালন্ধরের সরিষার ক্ষেতে এখনো কেন যে স্মরি—
দাঁড়াইয়াছিল কৃষক বালিকা রঙিন ঘাঘরা পরি'।
ঢেকে আছে মন গোটা—
রামধনুকের সপ্ত রঙের এইসব ছিটেফোঁটা।

(৭)

চলেছে মোদের স্টীমার সজোরে, শুনিলাম যেতে যেতে,
'মণিপুরী'দের নৃত্য হইবে চণ্ডীমণ্ডপেতে।
আলো ল'য়ে সবে করে ছুটাছুটি, আনন্দে উৎসাহে,
অপেক্ষমাণ গ্রামবাসীগণ আগ্রহে পথ চাহে।
সাবাস স্মৃতির দাবী!
মণিপুরী দল এলো কি না সেথা এখনো তা আমি ভাবি।

(৮)

স্মৃতির খেয়ালই রঙিন ঝুলিতে আহরি' রেখেছে, মরি,
সুদীর্ঘ মোর জীবনপথের এইসব মাধুকরী।
কোথাও সিঁদুর আবীরের দাগ, প্রসাদের রেণুকণা,
তীর্থ মহিমা মাখানো মধুর গন্ধের আনাগোনা।
উৎসব গেছে মুছি'—
মনে ভেসে আসে চালচিত্রের ভাঙা রাঙতার কুচি।

ক'খানা পুরানো রেকর্ড

সারানো হয়েছে পুরানো সে গ্রামোফোন,
খোকাখুকীদের নাই কোন আর কাজ।
বাজাইছে বসি'—করি' বেশ আয়োজন
বহু পুরাতন রেকর্ড ক'খানা আজ।
সেই সে কণ্ঠ, সেই গান সে আসর
নিঙাড়ি নিঙাড়ি তেমনি সে মধু ঢালে
অতীত শ্রোতায় যেন ভ'রে গেছে ঘর
সব ফিরে আসে সুরের ইন্দ্রজালে।
ঝরা ফুল পুন দেখা দেয় হয়ে কুঁড়ি
সেই পরিজন ফিরে যেন আসে ঘরে।

ভগ্ন তমালে ঝুলনের রাঙা ডুরি
উতল বাতাসে পরাণ ব্যাকুল করে।
ফিরে নিয়ে আসে সেই মুখ সেই হাসি
মনের যযাতি যৌবন ফিরে পায় ;
গোদাবরী নীর সরযুতে মিশে আসি
বহায় উজান জীবনের যমুনায়।
'ভালো হ'ল বঁধূ'—এই সেই গান বটে
ভোরেতে বাজিত লাগিত বড়ই ভালো।
সেই সে প্রভাত আনিল সন্নিকটে
দূর অতীতের হারানো দিনের আলো।
হাসির এ-গান—কত-না হেসেছি শুনে
সে সকল জুঁই কখন গিয়াছে ঝরি ;
রেখেছিল কে তা সাধের সাজিতে গুনে
এনে হাসিমুখে সুমুখে যে দিল ধরি।
ক'খানা রেকর্ড—কালো কালো ক'টা চাকী—
কালের চক্র ফিরালো এমন দ্রুত
রেখাতে রেখেছে কত আনন্দ ঢাকি,
গত উৎসব নিশি যেন ঘনীভূত।
মনে দোল দেয়, সহসা ফিরায়ে আনে
রঙিন বুকের রাঙানো আকাশ গোটা ;
দেখি নাই হেন হাসি-অশ্রুর বানে
শুষ্ক এমন মালঞ্চে ফুল ফোটা।

জাতিস্মর

অলকন্দা-পুলিনে একটি বাড়ী—
তুহিনেয় ভয়ে অতিথি হলাম তারি।
আত্মীয়তায় মনে হ'ল সারারাত
একটা জন্ম কেটেছে ওদের সাথ।
একদা নিশীথে স্তব্ধ মৌন সব,
চমকি' উঠিনু শুনিয়া বংশীরব,

সে সুর এমনি পরিচিত আর প্রিয়,
ডাকে যেন দূর জন্মের আত্মীয়।

কভু যমুনায় কভু সরযুর তীরে,
নারায়ণে আমি হেরেছি নরের ভিড়ে।
ভিক্ষু হইয়া ছিলাম অজন্তাতে,
সোমনাথে আমি লড়েছি পাঠান সাথে।
নিরঞ্জনার তীরে করিয়াছি দান,
মহাপথে আমি করিয়াছি প্রস্থান।
ত্যাগ করি' দেহ আমিই কাম্যকুপে,
গিয়েছি এসেছি হেথা নব নব রূপে।

সুন্দর আমি যাহা কিছু দেখি ভবে
মোর দৃষ্টির কষ লেগে আছে সবে।
রয়েছে ধরায় সব সৌরভ জুড়ি'
আমার বুকের প্রণয়ের কস্তুরী।
সকল সলিলে আমার অঙ্গবাস,
সব সমীরণে আমারি যে নিশ্বাস।
ঘন অনুভূতি দেয় মোরে সন্ধান—
সকল প্রাণেই রয়েছে আমার প্রাণ।

জন্মান্তর সঙ্গতি

পরিচয় পাই তার
এই পৃথিবীতে এসেছি গিয়েছি আমি যে অনেকবার।
সে-তারার আলো এখনো রয়েছে যে তারকা গেছে ডুবে,
মৃগ নাই, মৃগনাভির গন্ধ এখনো যায়নি উবে।
কত জনমের আঁখির পরশ রয়েছে রূপের গায়,
প্রণয়ের গাঢ় আলিঙ্গন যে দাগ রাখিয়েছে তায়।
চেনা-চেনা লাগে দেখে—
মাণিক্যহারে রয়েছে আমার বুকের পরশ লেগে।

সকল শব্দ ভাষা ও কাকলি, সব সুর সব গীতি
আমার জিহ্বা কণ্ঠ তালুর বহিতেছে পরিচিতি।

সুরের মীড় যে কোন্ নীড়ে ডাকে ভাবিয়া পাইনা সীমা,
বিস্মৃত প্রিয় কতই কণ্ঠ দিল ওতে মাধুরিমা।
ভালো- লাগা সব বর্ণে গন্ধে, ভালো লাগা সব গানে
জন্মান্তর সৌহার্দ্দ্যের অভিজ্ঞান যে আনে।
পাইনি অমর বর,
যুগের যুগের প্রেম শুধু মোরে করেছে জাতিস্মর।

স্পর্শে গন্ধে রসে কী আভাস, কী যে ইঙ্গিত রয়,
প্রতিটি শৈলে রয়েছে আমার শিলালিপি মনে হয়।
হেথাকার প্রেম স্নেহ মমতায় অফুরন্তের চিনে
আগন্তুকেরা ধরাকে বেঁধেছে অপরিশোধ্য ঋণে।
ল'য়ে যে বিপুল পণ্য এমন করি হেথা কারবার
একটি জনমে হিসাব-নিকাশ চুকিতে পারে না তার।
তাই এই গতায়তি
অপার্থিবের পরিবেশে করে ধরাকে কান্তিমতী।

এসেছি গিয়েছি এটা ঠিক জানি, দিয়ে নিয়ে গেছি কী ?
নিয়ে গেছি এর বেদনা, দিয়েছি বুকের সামগ্রী।
রূপে রূপবান ওই লাবণ্য, ওই যে আকর্ষণ
ফিরিয়া আসিতে বার বার মোরে করেছে নিমন্ত্রণ।
বিদায়ী নয়নে সেই রূপ ভাসে ত্যজিতে যা ব্যথা বাজে,
ধরার কঠিন বন্ধন তাই পুনরাগমন যাচে।
অমৃতের কণা বহি
এসেছি গিয়েছি ধরার প্রেমকে করিবারে কালজয়ী।

জালন্ধরের পথে

পাংশু-বরণ পথ চলেছে অন্ত নাহি তার
সরষে এবং গোধূম ক্ষেতে সবুজ চারিধার।
ইস্টেশনে টোঙা মোটর এক্কা গাড়ীর ভিড়,
পায়জামা আর পাগড়ী টুপির অরণ্য নিবিড়।
সলাজ আঁখি নাই প্রাসাদের জানালা ফাঁকে,
জল আনিতে যায়না বধূ কলসী কাঁখে।

বঙ্গবধূর মধুর শোভা বঞ্চিত দেশে
ভুল করেছি ভাবছি আমি সখ ক'রে এসে।

২

এমন সময় কে ও এলো হরিণ নয়না,
কাঁচা সোনার ঢেউ খেলিয়ে, কথাটি কয়না।
পাল্‌টে চেয়ে এগিয়ে গেল রূপের বিজলী
ঝাপসা দিনের সন্ধ্যা বেলা শোভায় উজলি।
নয়ন সে কি, সে যে গভীর প্রেমের সরসী,
চ'লে গেল পদ্ম বুকের পরাগ বরষি,
সেথায় পেলাম হলুদ পরীর হঠাৎ দরশন
জালন্ধরের পথে আমার আজও বেড়ায় মন।

৩

কুঞ্চিত কেশ চাঁদ মুখে তার পড়ছে আকুলি—
ভুল করিয়া চাঁপার দলে বসলো কি অলি!
সান্ধ্য তারার কাঁচপোকা টিপ পরার কি মরসুম,
কোকিলকে কি ডাকলে ক্ষেতে কাশ্মীরী কুঙ্কুম?
ছলছলে সে রূপের নদী যায় না পসরা,
চাউনি তাহার বঙ্গবালার অমৃতে ভরা।
সেথায় আমার আটকে গেল এই দুটি নয়ন
জালন্ধরের পথে আমার ঘুরে বেড়ায় মন॥

অশরীরী

ত্যক্ত বিশাল ভগ্ন ভবন—ঘন জঙ্গল মাঝে,
সেখানে সতত আলো-আঁধিয়ার ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝর বাজে।
ছিন্ন সৌধ মালা স্মৃতির বন্দীশালা
তোরণে তাহার কুতুহলী হয়ে পঁহুছিনু এক সাঁঝে।

ডাকিলাম জোরে, 'কোথা পুরবাসী? কোথা ওগো পুরবাসী
লও ডেকে লও, অতিথি তোমার দ্বারে যে দাঁড়ালো আসি'।
ধ্বনিত হইল গেহ আসিল না কই কেহ,
শুধু পেচকের কর্কশ রব সাড়া দিল উপহাসি'।

দ্বিতলের সব কক্ষে কক্ষে, বায়ু বহি সনসনি'
গত গৌরব গম্বুজগৃহে তুলিল প্রতিধ্বনি ।
কে যেন বলিছে 'আজও আছ কি তোমরা, আছ ?
শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে আমরা যে দিন গুনি' ।

সুবৃহৎ বট রচি মণ্ডপ 'নামালে'র পাকে পাকে
রয়েছে দাঁড়ায়ে, চীনা ফাহিয়ান হয়তো দেখেছে তাকে ।
দমকা বাতাস লাগি' শিলা-ছবি উঠে জাগি
বলে 'আমাদের ভরা ঘুমে কে রে গায়ে হাত দিয়া ডাকে' ?

রঞ্জিত যেন হয়েছে বাড়ীটি যুগের যুগের কষে,
ডালিমের গাছে ডালিম ধরেছে, ফেটে পড়ে রূপে রসে ।
ফুটিয়া হয়েছে ফুল কাহার হয় যে ভুল !
মানুষ ম'রে কি ফুল ফল হয় ? আমি ভাবি হেথা বসে ।

ভগ্নস্তূপে উঠেছে যে-সব বলিষ্ঠ তরু-লতা,
সাবাসি তাদের উদ্দাম গতি, অরণ্য সরসতা ।
যাহাদের এই ঘর, এরা কি তাদের পর ?
পায়নি কি রূপ এতেই তাদের বক্ষের ব্যাকুলতা ?

হাজার বছর আগে এ আবাসে ছিল যারা পরিজন,
অনিন্দ্য শত মুখচ্ছবি যে করেছি নিরীক্ষণ,
সুমুখে ঘুরিছে তারা, জরা ও মৃত্যু হারা,
রূপ যে অমর, যুগে যুগে তার নাহি পরিবর্তন ।

কণ্ঠের স্বর তেমনি—সুর যে অবিনশ্বর ভবে,
গুণী মহাকাল মধুরতা তার কেমনে কাড়িয়া লবে ?
সুরভিত চারিপাশ করে কস্তুরী বাস,
সুবাসিত যাহা করিত সুদূর অতীত মহোৎসবে ।

হাজার বছয় কয়টা বা দিন কয়টা বা নিশ্বাস ?
হাজার বছর ত্র্যম্বকের যে একটা অট্টহাস
মাটীর প্রদীপে হায় একটা দীপালী যায়,
বিসর্জ্জন তো নব বোধনের কেবল পূর্ব্বাভাস ।

এখানে জমেছে কালের কুহেলী ঘন যবনিকা প্রায়,
রহস্যময় করি' চরাচর আবরি' রাখিতে চায়।
মোরা ধরণীর প্রাণী ধরাই আসল জানি,
তাহাকেই যেন ছায়া মনে হয় এ ভবন অঙিনায়।

এখানে যা শুনি তাহাই তো ধ্বনি, প্রতিধ্বনি তো নয়,
আমরা যা বলি তাহাদেরই কথা নাহি তাতে সংশয়।
স্পন্দন তাহাদের এই বুকে পাই টের,
তাহাদের ব্যথা দুশ্চিন্তাই হয়ে আছে অক্ষয়।

আসল ভুবন কোনটা তারাই জানে বুঝি সন্ধান,
তাদের জগৎ স্থির—আমাদের সদা দোদুল্যমান।
ভাবি মোরা যাব যেথা উহারা রয়েছে সেথা
যে-সুধার মোরা পিয়াসী—তারা তা আগেই করেছে পান।

কর্ম্ম তাদের দিয়ে চলে গেছে লভিবারে বিশ্রাম,
সেই সে আদিম ভীতি ও ভাবনা মোরা সহি অবিরাম।
সেই চলা-পথে চলি সেই বলা-কথা বলি,
মোদের সাধনা পূর্ণ করিছে তাঁদেরই মনস্কাম।

তাদের খবর অধিক কি পাব মাটি বা পাথর খুঁড়ে,
এখন তাহারা বসত করিছে নিখিল ভুবন জুড়ে।
ডাকিয়া বলিছে "আজো আছ কি তোমরা আছ?
দেবতার কাছে আছি বটে, নাই তোমাদের বেশী দূরে"।

মাটির মায়া

স্বর্গে আবার ফিরিয়া এসেছি গুরু অভিশাপ অন্তে।
তবুও সতত চঞ্চল মন
ধূলার ধরণী করিছে স্মরণ,
গুমরি' তাহার পূরবীর সুর আসে স্বরগের পন্থে।

বধূ হয়ে ছিনু সেখানে রম্য সুধা-ধবলিত কক্ষে,
প্রেমিক স্বামীর সে কি রে সোহাগ,
এখনও মোছেনি চুম্বন দাগ,
ধরার প্রেমের পদ্মপরাগ আজো মোর সারা বক্ষে।

সেখানে ছিলাম লাজ-নতমুখী সবার আদরে ধন্যা,
ভরা যৌবনে সাজানো সে-ঘর
এখনো ভাসিছে চোখের উপর,
এখানে এসেও আছাড়ি' পড়ে যে আঁখিতে অশ্রু-বন্যা।

ভুবনের পাশে স্বচ্ছ তটিনী নামটী তাহার কৃষ্ণা,
আকাশ গঙ্গা সাথে তার যোগ
দেখিয়াছি সাধ করি উপভোগ,
ধরার ক্ষুদ্র শিশিরের বুকে রয়েছে সুধার তৃষ্ণা।

সবে আলোড়ন সোহাগের দোল, সে এক মধুর বিশ্ব,
জানি তাহাদের গতির কী মানে,
ছুটেছে কোথায় কার সন্ধানে
তুচ্ছ সে ধরা—তবু দেবতার দেখার মতন দৃশ্য।

হোক নশ্বর, হোক মায়াময়, হোক-না ধরণী রিক্ত,
তবু প্রেম তার কমনীয়তায়,
তবু আঁখিজল তাহার ব্যথায়—
ইন্দ্রজাল যে ইন্দ্ররাজ্যে করে তারে অভিষিক্ত।

সোনার স্মৃতি

দোল যামিনীর আবীর আমি, বীণার সুরের কাফি গো
পারিজাতের মাল্য গলে স্বর্গে নিশি যাপি গো।
মোর নীলাকাশ চাঁদে ভরা
লাবণ্যে মোর তনু গড়া,
নিত্য সুধা উথলে ওঠে বক্ষ আমার ছাপি গো।

কালকে সীতার গায়ে হলুদ, কাটল তাতেই দিবা হে
ফিরছি ভোজের নিমন্ত্রণে, ফিরছি যে পান চিবায়ে।
পরশু ছিলাম কৈলাসেতে,
মহামায়া দিলেন খেতে,
পথে নারদ বলেন যেতে সুভদ্রা-দির বিবাহে।

অমৃত যে মৃতের পুরে জয়-পতাকা উড়াল,
মার্কণ্ডেয়ের পুনর্জনম দেখে নয়ন জুড়াল।
কাল ফিরেছেন ঘরের পানে
সাবিত্রী আর সত্যবানে,
বর লভিয়া যম-সকাশে সব অভিশাপ ফুরাল।

মকর-তরী বেয়ে গেলাম কালিদাসের ভবনে,
মহাকবির কাব্য লেখা দেখে এলাম গোপনে,
মন্দাক্রান্তা ছন্দ চলে,
মেঘের ছায়া সিপ্রা-জলে,
উজল কবির নয়ন যুগল দূর অলকার স্বপনে।

রাম-গিরিতে অলকা তো আমিই পারি মিলাতে,
কুবের-পুরীর চম্পকবাস গিরির গুহায় বিলাতে।
মহাকালের মুক্তা মাণিক—
খেলাই কড়ি নিয়ে খানিক,
অহল্যা ফের হয় মানবী দিই চেতনা শিলাতে।

আমি হয়ে বরণ-বধূ বুড়ীর বুকে থাকি গো,
ঝরা ফুলের ঘরে আমি কুঁড়ির দিবস ডাকি গো।
মেনকাকে স্বর্গেও হায়—
মনে পড়াই শকুন্তলায়,
পঞ্চবটীর কুটীর রামের রাজপ্রাসাদে রাখি গো।

আমি অতীত শোভার থাকা, আমিই কাতার কাতারে,
আনি সুদূর স্বর্ণ মরাল খিড়কি-সরে সাঁতারে।
আমার শিষে আমার ডাকে,
ফিরাই হারা-পায়রা ঝাঁকে,
দেখাই ব্রজের নৌকা-লীলা দ্বারাবতীর পাথারে।

ভুলি নাকো কিছুই আমি, তোমায় কবি ভুলাব।
আমি তোমার কোমল বুকে কমল-রেণু বুলাব।
আবার নবীন করব তোমায়
সোহাগেতে বরব তোমায়,
আমি তোমার মানস-গগন রাখব চির-নীলাভ

লাল যাত্রী

যারা কেবল হাসায় এবং হাসে
আলতা দুধের ঢেউ খেলায়ে আসে.
যাদের পরিমণ্ডলেরে ঘিরি'
ন'বৎ বাজে, রঙ্ ছোড়ে পিচকিরী,
পৌষের শীতে পদ্ম ফোটায় যারা,
উৎসবে দেয় নিতুই বসুধারা,
রঙের খেলায় খেলে দিবস ব্যাপি',
কণ্ঠে যাদের 'আশা', 'ললিত', কাফি'—
আমার মনে জাগে যে সংশয়
ঝ'রে বুঝি মুক্তা তারাই হয়।
পারিজাতের শাখায় তারা ফোটে,
রামধনুকের রঙের মেলায় জোটে।
হর্ষে এরাই ঘোরায় রবির রথ,
স্পর্শে এদের জাগলো ছায়াপথ।

আজিকে রাতি

প্রিয়া, সেই প্রিয় পূর্ণিমা রাতি, সেই চম্পক সুরভি—
বাজে দরবারী কানাড়া কোথাও, কোথাও বেহাগ পূরবী।
সমুখে মাধবী তেমনি শ্যামলা, শাখে থলো থলো কুঁড়ি গো,
বরণ-পিড়িতে এখনো রয়েছে পুরানো এলুন গুঁড়ি গো।
কোকিলের ডাক তেমনি মদির, কই তো হয়নি পুরাতন?
মণি-মঞ্জীর—ঝঙ্কৃত-নিশি বাজে কঙ্কন কনকন।
এ রাতি করেছে মধুরা
যুগের যুগের কিশোর-কিশোরী জগতের বর-বধূরা।

২

হয় তো এমনি আলোক-তিথিতে তুমি যা বলেছ মিছে নয়,
হল সাবিত্রী-সত্যবানের শুভ দৃষ্টির বিনিময়।
আজও শোনা যায় কলধ্বনি যে সেই স্রোতবহা মালিনীর
বেতসকুঞ্জ তেমনি শোভন, হয়নি বদল অবনীর।

চন্দ্রাপীড় আর কাদম্বরীর বাসর-জাগা এ রজনী,
কত চাঁদ মুখ সুধা দিয়ে এর গরব বাড়ালো সজনি।
যায়নি, যাবার কিছু নয়—
তৃষিত অধর উৎসুক বুক তেমনি রয়েছে সমুদয়!

৩

এই সুধাময়ী ক্ষুধাময়ী নিশি বুঝিতে পারিনি কী বটে!
নৃত্যে ইহার একটি ভঙ্গী প্রিয়তমে ডাকে নিকটে।
সুধার গাগরী কক্ষে ইহার চুনুরিয়া শাড়ী পরণে,
লালে লাল করি চলে সুন্দরী অনুরাগ রাঙা চরণে।
কতই শিরিন কতই ফরহাদ, কত জুলিয়েট রোমিও
কুসুম-বিছানো এই পথে গেল, তারপর তুমি আমিও।
এ-নিশি কি কেহ ভোলে গো?
অমর হয়েছে রাই ও কানুর ঝুলন রাসেও দোলেও।

৪

লাগে নাকি ভালো? মোর ভাল্ লাগে, ভাল লাগে মোর অতিশয়,
পরিচিত সেই রঙ্গমঞ্চে এই নূতনের অভিনয়।
সুরভিত হল যে নিশি মোদের স্মৃতির গোলাপী আতরে,
তরুণ-তরুণী গোলাপে গোলাপে সাজাইছে তারে আদরে!
আছে পথ-চাওয়া সেই গান-গাওয়া বহে সেই হাওয়া অনুখন,
ফোটে সেই ফুল সেই গাছ আজও, সেই সে-বিরহ সে-মিলন।
সে-বাঁশীই বাজে অবিরাম
উহাদের খেলা আমাদের চোখে লীলা হয়ে রাজে অভিরাম।

মহাকাল

তুমি চলিয়াছ অনন্ত পথে, নীরব পদক্ষেপে,
হে অতন্দ্রিত, যুগ-যুগান্ত ব্যেপে।
কণ্ঠ তোমার বেষ্টিত হাড়-মালে,
ধক্ ধক্ করে বহ্নি তোমার ভালে,
বাজে ডম্বরু, ভুজগ গরজে ধরা উঠে কেঁপে কেঁপে।

(২)

শিলা-মর্ম্মরে মানুষ মাটিকে আকাশে তুলিছে বটে
ফিরে আসে মাটি মাটির সন্নিকটে।
কত প্রতিমার হেরিছ নিরঞ্জন,
কত রাজ্যের উত্থান নিপতন,
তুমি কোনো রঙ স্থায়ী রাখ নাকো মাটির ধূসর পটে।

(৩)

কাল ব্যাবিলন আজ লণ্ডন, কোথায় পরশ্ব ?
কে বুঝিবে তব গতির রহস্য ?
এই প্রচণ্ড আণবিক সভ্যতা
দেখিতে দেখিতে হয়ে যাবে উপকথা,
ক্ষয়ে খসে গেল কত রবি-শশী রেখে শুধু ভস্ম।

(৪)

যেখানে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজকীয় দপ্তর,
হয়তো সেখানে জমিবে তুষার স্তর।
শ্বেত ভালুকেরা আসিয়া বাঁধিবে ডেরা,
বল্গা হরিণ সহ সীল-মৎস্যেরা,
পেংগুইনের ঝাঁকে ডেকে এনে বাঁধাবে গোপন ঘর।

(৫)

অভ্রংলিহ জয়-তোরণের জংধরা ইস্পাত,
ভূমিসাৎ হবে হয়তো অকস্মাৎ।
মানুষের গুরু-গর্বিত ইতিহাস
জাগাবে কেবল তোমার অট্টহাস,
তব পঞ্জীতে তাহাদের আয়ু হয় তো একটা রাত।

(৬)

পতনের গতি কারো দ্রুত অতি কারো কিঞ্চিৎ ঢিমা
সীমা-শেষে গিয়া সব হবে হিরোশিমা।
পরিণামে এক শ্মশানে সবারি ঘর,
সাথে রবে শুধু তুমি শ্মশানেশ্বর,
লয়ের আঁধার হতে ফুটাইবে সৃষ্টির অরুণিমা।

(৭)

তাসের দুর্গ, পাতার প্রাসাদ, কাগজের রাজধানী,
সৈকতে তারা জলরেখা যায় টানি,
পঞ্চভূতেরা গায়ে রাখে নাকো ছোপ,
দগ্ধ মগ্ন করে ভেঙে করে লোপ,
মানুষ কিন্তু করিতেছে তবু অমৃতের সন্ধানই।

(৮)

ভঙ্গুর ভাঙা পানপাত্র ও রাঙা বোতলের সার
পরিচয় দেবে বিরাট সভ্যতার।
ক্ষয়া ইঞ্জিন, উড়োজাহাজের চাকা,
বোমার টুকরা, ফাঁসি কাঠ মাটি ঢাকা,
সৃষ্টিবিনাশী কৃষ্টির হবে সাক্ষী চমৎকার।

(৯)

তব সাথে চলে কীর্ত্তি-যশের বিপুল পণ্য লয়ে
আহা কতজন জয়-গর্বিত হয়ে।
প্রোজ্জ্বল যাহা কোথা ডুবে যায় নিভে,
নিষ্প্রভ হয় পরিণত মণিদীপে,
তোমার নিকট কার কত দর খাঁটি ক'রে দেয় কয়ে।

(১০)

স্তব্ধ হইবে সকল শব্দ, রবে শুধু ওঙ্কার,
সব রূপ এক-রূপে হবে একাকার।
দুরাশা আমার,—পুড়ে যবে হবো ছাই
তোমার অঙ্গে বিভূতি হইতে চাই,
হে দেব রজতগিরি-সন্নিভ—তোমাকে নমস্কার।

খেলাভঙ্গ

নীলকণ্ঠ নামটি তাহার—সুযশ বড় তার,
দেশের সে-যে সবার সেরা দাবার খেলোয়াড়।
কোনো খেলায় হারত না সে এতই তাহার গুণ,
দাবা-খেলায় কুরুক্ষেত্রে সে-ই ছিল অর্জ্জুন।

ভঙ্গী খেলার দেখত শত নয়ন সতৃষ্ণ,
বিজয় তারি—সারথি তার বুঝি শ্রীকৃষ্ণ।
একটি দিবস চলছে খেলা—ঘটলো অঘটন—
নীলকণ্ঠ উৎকণ্ঠায় বিষণ্ণবদন।
'চটে গেল বাজি এবার' বলিয়া চঞ্চল—
ছকটি দাবার উল্টে রাখে নয়ন ছলছল।
দেহে মনে সে কী গভীর নিরাশা-চিহ্ন ?
বেদনা তার বুঝবে কে আর দরদী ভিন্ন ?

'চটে গেল বাজি'—এ তো সহজ কথা নয়,
এ যেন এক দিগ্বিজয়ীর ভাগ্য বিপর্য্যয়
এ যেন রে অভ্রভেদী আকাঙ্খা চুরমার,
চটলো বাজি ভগ্ন হৃদয় ভাবিছে হিট্‌লার।
'লালকেল্লা' বৃহৎ দূরে, চটলো যে বাজি,
'কোহিমা'তে এ যেন বে কাতর নেতাজী।

বিক্ত ক'রে তিক্ত ক'রে জীবন সুদুর্লভ
প্রারম্ভেতে বন্ধ হল রাজস্থয় উৎসব।
ফাঁসলো পরিকল্পনা তার ডুবলো যেন হায়
আশার বিশাল বহিত্র এক—সাগর-মোহানায়
বিফল হল কী নৈপুণ্য, কী মহা উদ্যম!
এত বড ওলট পালট—ব্যথা কি এর কম ?

অমনি আহা কতই বাজি চটছে দুনিয়ায়,
বার্ত্তা তাহার মর্ম্মব্যথার কজন বলো পায় ?
জ্যোতিষ্ক যায় উল্কা হয়ে—বিধির অভিশাপ·
অসমাপ্ত খেলার বেদন রেখে যে যায় ছাপ
আনে যুগের পুষ্ট আশা কেমনে নৈরাশ
চটা বাজির ব্যথায় ভরা ধরার ইতিহাস।

মায়ার বাঁধন

পথতরু-তলে বসে আছি বিকালে,
পোষাপাখী আসি এক বসিল ডালে।

এখনো চরণে তার শিকলের দাগ,
শিখানো বুলিতে তার ঝরিছে সোহাগ—
মিশিতে পারেনা যেন পাখীর পালে।

মন দিয়া যত বার আমি শুনিনু,
মুখে তার মধু বোল 'মিণ্টু মিনু',
কণ্ঠে বাজিছে ওর তাদেরি বাঁশী,
বনে এসে মন তার আরো উদাসী—
জাদুর মোহন কাঠি কেবা ঠেকালে।

'মিণ্টু মিনু'র বাড়ী কোন্ বিদেশে,
হেথা তাহাদেরি কথা বলে সে এসে।
আহা, সারা বনে বনে পাতার ফাঁকে
সারাদিন ঘুরি ফিরি তাদেরে ডাকে—
ঘর, তুমি বনচরে একি শেখালে!

গৃহে থেকে এই দশা বন-পাখীরই,
গৃহী বলো কী করিবে লয়ে ফকিরি?
দেখে তার দশা মোর চোখে আসে জল,
কয়টা বছরে তার এতই বদল!
ভালোবেসে দাসখৎ নিজে লেখালে।

শুঁয়োপোকা

বিশ্রী একটা শুঁয়োপোকা দেখি উঠেছে আমার পায়,
শিহরি উঠিনু, কাগজে ধরিয়া ফেলে দিনু আঙিনায়।
ধুয়ে মুছে দেখি যায় নাকো জ্বালা--শুঁয়ার জ্বালা যে ভারি,
ভৃত্য দেখিয়া মারিতে ছুটিল পোকাটিরে তাড়াতাড়ি।

নিষেধ করিনু, পোকাটি ঢুকিল ক্ষুদ্র গুল্ম-বনে,
তাহার কথা তো স্মরিবার নয়—কাজেই ছিলনা মনে।
মাসেকের পর তেমনি বিকালে ছোট প্রজাপতি এ কি
বসিয়াছে পায়ে খাসা সুন্দর—মুগ্ধ হইনু দেখি।

ফুল নই আমি সকলেই জানে, আমিও তা বেশ জানি,
কেন মোর পায়ে আসিয়া বসিল হেন সুন্দর প্রাণী ?
মনে হ'ল সেই শুঁয়াপোকাটিই এই নব দেহ ধরি'
বিচিত্র বেশ দেখাতে এসেছে পুরাতন স্নেহ স্মরি।

লভি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—জীবন আকঙ্ক্ষিত,
ভোলে নাই মোরে, ভাবিয়াছে আমি দেখিয়া হইব প্রীত।
সকলে হয়তো হাসিয়া উঠিবে শুনিয়া আমার কথা,
হোক কীট, গড়া সেও বিধাতার,—সে জানে কৃতজ্ঞতা।

একই জীবনে কি দিব্য দেহ করেছে সে দেখ লাভ,
ফুলের রাজ্যে হইয়াছে যেন পরীর আবির্ভাব !
ক্ষুদ্র তুচ্ছ পোকাটিরও প্রতি বিধির করুণা হেন,
একই জীবনে দিব্য জীবন মানুষ পাবে না কেন ?

ভ্রমান্ধ

উপলের মাঝে মাণিক পড়িয়া থাকে—
তাহারা তাহাকে ঠেলা মারে অবিরত।
শামুক-গুগ্‌লি ঝিনুকে দাবায়ে রাখে,
মুক্তা-ভরা সে- -মূল্য তাহার কত !

পাখীরা গরুড়ে পক্ষী বলেই জানে,
বোঝে না, কতই শক্তি মহিমা তার ;
শ্যাওড়াও হাসে চাহি চন্দন পানে,
ভাবে, গন্ধের গৌরব কিবা আর।

কবীরের সাথে তাঁতীরা যাইত হাটে,
কবীরে তাহারা সকলে ভাবিত দীন ;
বুননির গুণে তাদের গামছা কাটে,
বুঝে না কিসে যে কবীরের চেয়ে হীন।

রামপ্রসাদের তবিলদারির কাজ
বহুজনে আরো ভালো পারে তাহা বুঝি।
করে দেখ দেখি হিসাব-নিকাশ আজ
কী সে রেখে গেছে কালের তবিলে পুঁজি।

ধরণীর মীন কূর্ম্ম ও বরাহেরা
যতই দেখুক ঘুরে ফিরে চারিপাশে,
চিনিতে নারিবে হরিরে কখনো এরা
হরি তাহাদের রূপ ধ'রে যদি আসে ।

বিয়ের ফর্দ্দ

বাক্সে পেলাম আমার বাবার বাবার বিয়ের ফর্দ্দখানা—
পাঁচটাকা মণ সীতাভোগ আর চারটাকা মণ মিহিদানা—
বরের টোপর চৌদ্দ আনা, হয়তো সেটা পড়েই পাওয়া,
নেইকো জুঁয়ের মালার কথা, মত্ত নিয়েই খাওয়া-দাওয়া।
দুই টাকা মন 'বাসমতি' চাল এখন যাহা পাইনে খুঁজি—
ঠাকুরদাদার বিয়ের সময় শায়েস্তা খাঁর আমল বুঝি !
সুলভ বড় মৎস্য তখন, ওজন পাকার চেয়েও পাকা,
এমন বিরাট বৃহৎ ব্যাপার, খরচ সাড়ে সাত-শ টাকা।

২

'রসান চৌকি' বিষ্ণুপুরের বাংলাজোড়া যাহার খ্যাতি—
ঠাকুরদাদার হিংসা আজি করছে বসে তাহার নাতি।
'সিউড়ি' হ'তে রায়বেঁশে দল, 'নারানপুরে'র দগড় বাঁশী ;
'নিগন' তাহার ঢোল পাঠালো, আতসবাজি 'বনকাপাসী'।
ভারে ভারে ক্ষীর ছানা আর 'ধেনো'র গোয়াল দই পাঠালে।
উজল রাতি 'পালিশগাঁ'য়ের ফুলছড়ি ও রঙ্‌মশালে।
দশটি হাজার পদ্মপাতা, দুঃখ নাহি পাইনি যেতে,
হৃদয় আমার উঠছে মেতে অতীত দিনের আনন্দেতে।

৩

'বালুচর'-এর রঙিন চেলী গায়ে যেন জ্বলছে হীরা,
ময়ূরকণ্ঠি ডাকশাইটা বুনেই দিলে 'বাঘডিগিরা'।
বর্দ্ধমানের রাজার এবং অগ্রদ্বীপের দুইটা হাতী
এঁকে সিঁন্দুর-তিলক ভালে হয়েছিল বিয়ের সাথী।
সঙ্গে গেল পাঁচটা ঘোড়া একেবারে সবার সেরা,
কোম্পানীর এক তঙ্কা ক'রে ইনাম পেলে মাহুতেরা।

গরুর গাড়ী পঁচিশখানা, বাকী সবাই চরণ-যানে,
শিবিকা মোট তিনখানা ও ষোলজনায় পাল্‌কী টানে।

৪

রঙের খরচ স'সাত আনা কেমন সে রঙ্‌ বসেই ভাবি,
হয়তো হবে অতি প্রাচীন 'ম্যাজেণ্টা' বা 'খুন খারাবি'।
ফর্দ্দখানি হলুদ মাখা, হরফগুলি স্পষ্ট অতি ;
ঠাকুরদাদার বাবার উপর প্রসন্ন খুব প্রজাপতি।
সেই সে দিনের হুলুধ্বনি শুনছি আমি কাব্য লিখে,
দেখছি আমি ধরতে কুলো ঠাকুরমায়ের শাশুড়ীকে।
নিতবর হবার ইচ্ছা যে হয়, হাসিমুখে পাল্‌কী চড়ে,
হয়নি সেটা, হবার তো নয়, জন্মেছি যে অনেক পরে।

সুদূর বান্ধবী

তুমি যে আমার প্রপিতামহের বৃদ্ধা প্রপিতামহী,
দাও বর দেবী—আমি তোমাদের প্রণয় কাহিনী কহি।
অনেক দিনের কথা
ক্ষমিয়ো প্রগল্‌ভতা
আমি দেখিয়াছি তোমাদের প্রেম ফুলছাবি হয়ে রহি।
যে বাটায় তুমি সাজিয়াছ পান,—গৃহেতে রয়েছে আজও
সে-বাটারই পান আমি যে চিবাই তুমি কি দাঁড়ায়ে আছ ?
অধরে মধুর হাসি,
সরে এস ভালবাসি,
আমার প্রিয়ার হাতে হাত দিয়ে মোর লাগি পান সাজো।

রয়েছে তোমার আতরদানীটি, তোমারে কেমনে ভুলি ?
সোহাগ পরশ দিল তারে তব চম্পক-অঙ্গুলি।
তোমার নীলাম্বরী
ফুলে ফুলে দিল ভরি,
সৌরভে তার আসিত নিকটে ভোমরা ও বুলবুলি।

নাসায় 'বেশর, সীমন্তে 'সিঁথি', সোনার ঝালর তাহে,
মিহি কাশ্মীরী শাল যে শোভিত গরবিনী তব গায়ে।

কটিতে চন্দ্রহার
কি বাহার ছিল তার,
অশোক ফুটায়ে চ'লে যেতে তুমি পাইজোর মল পায়ে !

চারু কর্ণেতে শিরীষ পরিতে, অলকেতে কুরুবক,
লোধ্র পরাগে যক্ষবধূ কি সাজিতে হইত সখ ?
নয়ন কাজল দিতে
হাসে মেঘে বিজলীতে,
ময়ূরকণ্ঠি কাঁচুলি করিত দীপালোকে ঝকমক্ ।

আলতা-রাঙানো পদে কাদাপথে যেতে যবে সরসীতে—
প্রিয় ননদীকে হয়ত বলিতে হাসি কোলে তুলে নিতে !
সে রসিকতার ধারা
এখনো হয়নি হারা,
অমর হয়েছে বাদল বাতাসে গ্রামের রীতে ও গীতে ।

চঞ্চল তব চাহনির দাম ছিল নাকো বড় কম—
ঘুরি বার বার নিকটে আসিত স্বামী তব প্রিয়তম ।
লভিতে মনের মতো
উপঢৌকন কত,
আজিও জড়োয়া ফুল-ঝুমকা যে হয়ে আছে অনুপম ।

কলসী কক্ষে সলিল আনিতে—সন্দেহ নাই তিল,
কুম্ভে করিত স্বর্ণকুম্ভ নভের সোনালী নীল ।
গড়া মেহগিনী কাঠে
তোমার সখের খাটে
আমরাও বসি—তোমার সঙ্গে সখীর রয়েছে মিল ।

সে জাঁতি রয়েছে বিবাহে যা ছিল তোমার বরের করে
তোমার হাতের কাজল-লতা তো দেখিতে পাইনে ঘরে ।
তোমার বরণ-থালা
ভাণ্ডার করে আলা,
তব সোনাহাতে কষ লেগে আছে, সোনা রঙ ঝরে পড়ে ।

কপোত হইয়া কোলে উঠিয়াছি, স্মর-শিশু হয়ে মনে,
শিখী হয়ে তব সমুখে নেচেছি কঙ্কন নিক্কণে।
ছিনু আমি দিবানিশি
তব লাবণ্যে মিশি,
এসেছি তোমার সোনার স্বপনে এসেছি সঙ্গোপনে।

মুগ্ধা চকোরী সুদূর সুধার লভিয়াছ আস্বাদ
কিরণ ধরিয়া চন্দ্রলোকেতে যাওয়াই তোমার সাধ।
হৃদি-দর্পণ পরে
হেরিতে বংশধরে,
তোমার মনের কামনা যে আমি অনাগত আহ্লাদ।

হয় নাই দেখা, তোমার লাগিয়া উড়ু উড়ু করে মন,
সুরলোক হতে লহ গো আমার বেতার নিমন্ত্রণ।
তোমার ঝিনুকখানি,
প্রেয়সীকে দাও আনি,
দাও বুকভরা আশীসের সাথে মুখভরা চুম্বন।

রিক্‌শ

টুং টুং ঘণ্টা, যান আগুয়ান
রাজপথ দিয়ে জোরে টানছে জোয়ান।
টুকটুকে লাল তার সুখাসন ভাই,
হিন্দোলা নয়, হয় দু'জনার ঠাঁই।
সন্ সন্ ধায় ট্রাম মোটরের দল,
রিক্‌শ এ টুনটুনি, তাহারা ঈগল।
ফায়ার বিগ্রেড ছোটে নাইকো গুজার,
এ যেন রে জেলে-ডিঙ্গি, তাহারা ক্রুজার।

ভালোবাসি আমি তার ক্ষীণ শোভাটি,
গ্রাণ্ডিফ্লোরার মাঝে দীন দোপাটী।
নয় হীরা জহরত, উঁচু নয় শির,
চুমকি সে যেন ছোট রঙিন পুঁতির।
গতির সে মেঘনা কি নয় দামোদর,

সে যেন রে অতি ছোট গিরি-নির্ঝর।
যেতে নারে দুর্ব্বল দেহ তার ক্ষীণ
মরু হ'তে মেরু আর পেরু হতে চীন।

রাজ্যের যান মহাকাব্য না হোক,
স্নিগ্ধ সে সুন্দর উদ্ভট শ্লোক।
ধ্রুপদ খেয়াল নয়, নাই মান তার,
তাইরে নাইরে যেন দুইটি কথার।
পজ্ঝটিকা সে নয়, নয় ত্রিষ্টুভ,
নব লঘু দ্বিপদীর ছন্দের রূপ।
নয় সে তো হঠযোগী, নাই যোগবল,
সহজিয়া চায় পথ সহজ সরল।

পাঠশালায়

আসিয়াছে বুঁচুবাবু পাঠশালে পড়িতে,
মুখে বলে 'ক' 'খ' আর লিখে তাহা খড়িতে
কী করুণা কাতরতা মাখা তার স্বরে রে,
বিশ্বের ব্যথা যেন একসাথে ঝরে রে।
হাসিছেন পণ্ডিত খুশী তারে রাখিতে,
গোমুখীর ধারা তবু উঁকি মারে আঁখিতে।
কণ্ঠের সুরে উঠে কী কাকুতি ছাপিয়া;
সারারাত ডেকে যেন ক্লান্ত এ পাপিয়া।
এ যে দেখি রাঙা হয়ে উঠিয়াছে গণ্ড,
বিষপান করিছেন যেন নীলকণ্ঠ।
বাণীপদ কোকনদে—বল দেখি তোমরা—
এত কি কোমল সুরে গুঞ্জরে ভোমরা?
করেছিল এমনি কী—বসে দেখি রঙ্গে—
ত্রস্ত অগস্ত্যকে সাগর তরঙ্গে?
কাঁদিছে—এবং আহা কাঁদাইছে সবারে—
বালক বাসব দেখি উচ্চৈঃশ্রবারে।

কে

দুখের নিবিড় অন্ধকারে আশার আলো কে জ্বালে ভাই ?
কে জ্বালে ভাই আশার আলো আপন মনে ভাবছি যে তাই ।
ভাবছি আমি অবাক হয়ে,
হৃদয় ভরে কি বিস্ময়ে ।
সব আঘাতের অন্তরালে এ কার পরশ অন্তরে পাই ।
শক্তিশেলের সঙ্গে যে পাই কাহার পরশ সঞ্জীবনী ।
মর্মে পরশ সঞ্জীবনী, কর্ণে অভয় মঞ্জুবাণী ।
বারেক কেবল হাত বুলায়ে
সকল বেদন দেয় ভুলায়ে,
দীনের চোখের জল রোধিতে নিরঞ্জনের অঞ্জন চাই ।

দারুণ জতুগৃহের তলে কে কেটে দেয় সুড়ঙ্গ হে ।
শার্দ্দুলে সে এক ধমকে করতে পারে কুরঙ্গ হে ।
হিংস্র নিঠুর বাজপাখীরে
করে কপোত সেই ডাকি রে,
অনলকে হায় জল করে দেয়, কিছুই তাহার অসাধ্য নাই ।

ইন্দ্রপ্রস্থ দেয় রচে সে বিরাটপুরের বন্দীশালায়,
সাধ্য কাহার বুঝতে পারে কোথায় কী সে ফন্দী চালায় ।
বিষতরুতে পীযূষ ফলায়,
শিশির নীরে ভূধর গলায়,
করছে কী সে তলায় তলায় ঠিক নাই তার ঠিকানা ঠাঁই ।

বুঝতে নারি কখন আসে কোন গরুড়ে কোন রথে সে,
চোখের পানিপথ দিয়ে হায় তপ্ত মনের বনপথে সে ।
যে পথে আর নাইকো আশা
সেই পথে হয় তাহার আসা ,
পাশ কাটিয়ে সামনে আসে ব্যাকুল হয়ে যে পথে ধাই ।

চড়ুইভাতি

পারের ঘাটের পান্থশালায় আমরা করি চড়ুইভাতি,
জুটলাম এসে, ছড়িয়ে ছিলাম শৈশবের সব সুখের সাথী ।

কতই দিকে কতই কাজে
গেল দিবস বিফল বাজে,
আঁচল ভরে কুড়িয়ে নিলাম কেউ বা খ্যাতি কেউ অখ্যাতি।

বেরিয়েছিলাম রঙিন ভোরে হাঘরেদের মতন সবে,
ভাবিনি যে মিলন আবার হেথায় বিদায়-মহোৎসবে।
কতই ভীতি, কতই স্মৃতি,
কতই প্রীতি, কতই গীতি,
সঙ্গে ক'রে এলাম নিয়ে অশ্রু-হাসির মাল্য গাঁথি।

আজকে করি চড়ুইভাতি, চড়ুইভাতি দুখের সুখের,
হাসিতে সেই বাঁশীর আওয়াজ বদ্‌লে যাওয়া চেনা মুখের।
নাচতো যারা নাচে না আর,
শুধু আছে ভঙ্গীটি তার,
ভাঙা বুকের ফাটলেতে উঁকি মারে যূথী জাতি।

ঘোরাই লাটিম, বাজাই বাঁশী, মেলার ফেরত সবাই মোরা
কেউবা পেলাম মাটীর হাতী কেউবা পেলাম কাঠের ঘোড়া
ধিন্‌তা ধিনা ধিন্‌তা ধিনা,
চিন্তা মোরা আর রাখি না,
আসবে খেয়ার নৌকা আসুক আমরা পাশার ছক তো পাতি।

বুলবুলি ঝাঁক ফিরবে নীড়ে—ধূলা ঝাড়ে পাখনা গুছায়;
চঞ্চু যে আর দেয়না ঠোকর টুকটুকে লাল 'তেলাকুচায়।
আবার ভোরের রেশটী নিয়া
উঠছে সবাই ঝঙ্কারিয়া,
ভয় কিছু নাই ডুবুক রবি, সম্মুখে পূর্ণিমার রাতি।

কায়া থেকে আমরা এখন ছায়ার দিকে যাচ্ছি ফিরে,
কথার মানুষ উপকথায়, ক্ষীরের পুতুল মিশবো নীরে।
ফুল থেকে যাই সৌরভেতে
বিন্দুব্যথা নাই তো এতে,
জীবন করি সঙ্গীতে শেষ—মরালকুলের আমরা জ্ঞাতি।

কবির সুখ

কবিতা লিখিয়া পাইনি অর্থ, পাই নাই কোন খ্যাতি ভাই—
হয়েছি স্বপ্ন বিলাসী, অলস—অনুযোগ দিবারাতি তাই।
হিসাবী বন্ধু, ভুল করিয়াছ, ভুল বুঝিয়াছ আমাকে,
ধন-মান লাগি কবিতা লিখিনা, মরি আমি সেই দেমাকে।
ফল পেতে হ'লে চাষ করিতাম, ব্যবসা চাহিলে অর্থ,
মৎস্য ধরিতে জাল ফেলা চাই, আকাশে চাওয়া যে ব্যর্থ !

অনটন দেয় আঘাত নিত্য, মচকাই, তবু ভাঙি না,
সাঁজের প্রদীপে তেল নাই মোর, ফুলে আলো করে আঙিনা।
আঁধারে যখন কাটীতে চায় না একা বসে বড় ভাবি রে,
অরুণ আমায় এসে উঁকি দেয়, আকাশ ভরে যে আবীরে।
ধিক্কার পাই নিন্দাও পাই নানা মুখে নানা ভাষাতে,
সব শুঁয়াপোকা প্রজাপতি হবে আমি থাকি সেই আশাতে।

কোন্ ধন-মান পাইবার লাগি ঝঙ্কারে পিক পাপিয়া ?
কী পায় সাধুরা গিরি-গহ্বরে কঠোর জীবন যাপিয়া ?
চিন্তামণির ধনে ধনী যারা তারা কি মুক্তামণি চায় ?
বিস্ময়ে দেখে বিশ্বরূপ যে নিতি প্রতি অনু-কণিকায়।
আমি সে সুখের সেই তৃপ্তির আর সে প্রেমের ভিখারী
আলোক মাগি যে আতপ মাগি যে সেই হোমানল শিখারই।

ভুবন আমার অমৃতসিক্ত শুধু আনন্দ আলোকের,
ক্ষীর নবনীর অবনী সে মোর, আমার ধরণী বালকের
সোনার নূপুর গুঞ্জরে যেথা, বাজে রয়ে রয়ে বাঁশরী,
সব দুখ মোর সুখ মনে হয়, সব ব্যথা যাই পাশরি।
লিখি হিজিবিজি, কী পাই তাহাতে ? বন্ধু, কহিব কিবা আর
সেই সুখ পাই, রামধনু আঁকি উপজে যে সুখ বিধাতার।

অসমাপ্ত

কত গান গাই কত কথা বলি কী বলিতে বাকি থাকে,
আমি যারে চাই সে দূরায়মান কেমনে ধরিব তাকে ?

পঙ্ক স্বপ্ন দেখে কমলের, শুক্তি মুক্তা চায়,
পাথর কাঁদিছে পরশ-পাথর হবার আকাঙ্ক্ষায়।
প্রতি পদার্থে অপার্থিবের রহিয়াছে পরিবেশ
অচিন্তনীয় সম্ভাবনার হেরি নিতি উন্মেষ।
প্রকাশ করিতে চাই—
অফুরন্তকে ফুরায়ে বলার সাধ্য আমার নাই।

গঠন কিছুরি করে নাই শেষ স্বর্গীয় ভাস্কর,
সব হতে চায় নিত্য-সূক্ষ্ম আরো বেশী সুন্দর।
যেটুকু আভাস ইঙ্গিত পাই তাই ভাবি যাব ক'য়ে,
পরে দেখি আরো রূপের জগৎ পড়িছে ব্যক্ত হয়ে।
যে রূপে আমার বুক ভরে ওঠে না ব'লে কেমন থাকি ?
যা বলেছি তাহা শেষ কথা নহে, অনেক রয়েছে বাকি।
বিস্মিত হয়ে হেরি—
মোর চন্দ্রের পূর্ণচন্দ্র হ'তে যে রয়েছে দেরি।

ভাষাও পায়নি পূর্ণ শক্তি, দৈন্য ঘোচেনি তার,
প্রকাশ করিতে পারেনা মনের নূতন আবিষ্কার।
অনাগত আসি সুমুখে দাঁড়ায়, দৃষ্টি পরিধি বাড়ে,
দেখি অকূলেরও রহিয়াছে কুল পেতে পারা যায় তারে।
পরশমণিও পরশে না যাঁরা হেরি তাঁহাদের দেশ :
পলে পলে যাহা নূতন, তাহা কি বলে করা যায় শেষ ?
মুখে না বচন স্ফুরে—
বাঁশরী কেবল আগাইয়া ডাকে ভুবন-ভোলানো সুরে।

মুগ্ধ করিছে, ভুলাইছে মোরে অমৃতের মরীচিকা,—
দেবতার নব-রূপ প্রকাশিছে আরতির দীপশিখা।
কমলের পর কমলেতে পূজা হয় না তো সমাপন,
দেখি আরো এক নীল কমলের রহিয়াছে প্রয়োজন।
ইন্দীবর তো নহে মোর আঁখি পদে দেব উপাড়িয়া,
চেয়ে থাকি শুধু রাঙাপদ পানে রসে-ভরা আঁখি নিয়া।
শেষ হয় নাকো কথা—
অফুরন্ত যে জীবন, রবেই অসমাপ্তির ব্যথা।

নৃত্য

নৃত্য ও তো পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন—
আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, আকর্ষণ।
সোনা মেঘ ওই, করছে সোনা বৃষ্টি,
চৌদিকে তার ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি,
রূপ চাহিছে অরূপকে যে করতে আলিঙ্গন।
ভাবের অভিব্যক্তি শুধু নয়,
সুন্দরে যে পূজা ওতেই হয় ;
সর্ব্ব অঙ্গ প্রেমাস্পদে করছে নিমন্ত্রণ।

স্বর্ণ গিরির অঙ্গ বেয়ে ঝরছে রে নির্ঝর,
উঠছে ফুটে হাজার নাগেশ্বর।
মানস-সরের দুলছে কোমল দল,
সুবর্ণ রাজহংসী কাঁপায় জল,
কাশ্মীরী জাফ্রানের ক্ষেতে লাগছে মৃদু ঝড়।
শিল্পী ছবি আঁকছে অজন্তায়,
বসায় মণি তাজমহলের গায়,
যক্ষ-বধূর নিশ্বাসে যে মেঘ-মেদুর অম্বর।

করছে চারু চঞ্চলতা সৃষ্টি কাব্যলোক,
ফুটছে শিরীষ কর্ণিকার অশোক।
ইন্দ্রবজ্রা মন্দাক্রান্তা সাথ,
মিশছে এসে ভুজঙ্গ-প্রয়াত,
ইঙ্গিতে ও ভঙ্গীতে তার সঙ্গীত এবং শ্লোক।
দেব ও দানব, মানব, পশুপাখী
নৃত্যে তাদের চিহ্ন গেছে রাখি,
সর্ব্বযুগের কৃষ্টি সাথে আছে ইহার যোগ।

নৃত্যে রাজে শিল্পী মনের গভীর সংবেদন—
ও রৌদ্রে রয় জল-ভরা শ্রাবণ।
রূপ যে তাহার সোনালী বিদ্যুৎ
দিক-দিগন্তে পাঠায় কবে দূত,

হস্তে তাদের অভিজ্ঞান আর প্রেমের নিদর্শন।
অঙ্গে অঙ্গে অনন্ত পিয়াসা,
আলোর পাখী খুঁজছে যেন বাসা,
গ্রহ-তারায় লাগছে লঘু পাখার আন্দোলন।

দীনতার আশ্রম

দীনতা আমারে দীন দেখে দিল মাথা গুঁজিবার ঠাঁই,
কৃপা লভিয়াছি, চাহিবার কিছু নাই।
পেয়েছি যে ব্যথা, আঘাত, দুঃখ, ভয়,
হেথা প্রবেশের তাই হ'ল পরিচয়।
এখন নয়ন-লবণ-সলিলে মুকুতার খোঁজ পাই।

প্রভাতে 'স্বরভি' মাতার স্তন্য, একবার করি পান,
শান্ত সে রস বুকে করে বল দান।
স্বপ্ন যে দেখি ছিন্ন চাটায়ে শুয়ে—
স্বর্গ আমার বক্ষে পড়েছে নুয়ে,
দীনবন্ধুর এ দেশে দীনের আশাতীত সম্মান।

মাটীর প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলে দীনতার আশ্রমে—
সে আলো-আঁধারে দেবতারা যেন ভ্রমে।
হেথা নিশি যাপে দিনশেষে ম্লান রবি,
নব প্রাতে ওঠে পুন নব তেজ লভি।
এইখানে রূপ তপস্যা-ফলে ভাব হয়ে যায় ক্রমে।

হেথা সব শুচি, কিছুই নাহিকো ঘৃণা কি অবজ্ঞার।
কাঠুরিয়া-বেশ শ্রীবৎস-চিন্তার।
জড়-ভরতের মত সবে রহে আহা,
জাগে সদা ভয় 'মৃগশাবকের মায়া';
কুবেরের নয় এখানে বিরাজে বিদুরের ভাণ্ডার।

নাহিকো শৃঙ্গী, নাহি দুর্ব্বাসা-কপিল মুনির ভয়,
হিংসা ও ক্রোধ অভিশাপ দূরে রয়।

এখানে ভক্ত, সাধু, সুধী, বিজ্ঞানী
সকলেই এক অমৃতের সন্ধানী,
জীব ও জাতির জীবনেতে চায় দিব্য অভ্যুদয়।

অদূরে কালের গতিপথ দেখি পর্ণ কুটীরে থাকি,
যুগ ও জগৎ আঁধারে যেতেছে ঢাকি।
জনঘন পথ চিহ্ন যায় না রেখে,
দেখিতে দেখিতে তৃণ তায় ফেলে ঢেকে।
এত সমারোহ—একি মায়া, ভ্রম প্রতারিত করে আঁখি!

কন্দুক ক্রীড়া করে মহাকাল বড় বড় নাম ল'য়ে,
স্বর্ণগোলক ফাটে বুদ্বুদ হয়ে।
বিশাল রাষ্ট্র, দুর্জ্জয় অনীকিনী,
সব ল'য়ে কাল খেলিতেছে ছিনিমিনি,
কীর্ত্তির শিলা মূর্ত্তিসমূহ ক্ষণেই যেতেছে ক্ষয়ে।

স্বর্গে যাবার সব পথ যায় এই আশ্রম ধরি,
পঙ্গু আমি—সে পথকে প্রণাম করি।
বস্তুর চেয়ে নামের এখানে দাম,
সবে হরিনাম জপ করে অবিরাম—
শিথিল সর্ব্বশরীর হইতে ভাব দেহ উঠে গড়ি।

মহতের পদরজোময় ভূমে কিছুই হয় না কালো,
এখানে নিভেনা কখনো ধুনীর আলো।
ভূমিতলে থাকা সবচেয়ে হয়ে ছোটো,
নামাতে চাহে না—সকলেই বলে 'ওঠো',
কি পরিতৃপ্তি!—চূড়া হওয়া চেয়ে নূপুর হওয়াই ভালো।

শায়িত দেবতা, যে রহে শিয়রে লভে নারায়ণী সেনা;
জিঘাংসু ধরা সাথে তার লেনা-দেনা।
যে রহে দাঁড়ায়ে চরণের তলে তাঁর—
ফলে নয়—তার কর্ম্মেতে অধিকার;
সেবক কি পায়?—প্রভু যেচে হন সারথি তাহার কেনা।

মহাপৃথিবী

হে মহাপৃথিবী, কত দিবা তব প্রখর রৌদ্রময়ী
যেপেছি কাতরে 'পরাণ-পোড়ানি' সহি ।
কতই ভয়াল ঝঞ্ঝা মুখর অমাবস্যার রাত
কাটায়েছি করি নীরব অশ্রুপাত ।
এলো বিভীষিকা জড়ীভূত করি মন,
লোভনীয় হয়ে এলো হীন প্রলোভন,
সব দূরে গেছে, যাতনার কথা নিভৃতে তোমারে কহি ।

২

কত নির্ম্মম শাণিত বচন—তীক্ষ্ণ ছুরিকা সম—
কত প্রিয়জন হেনেছে বক্ষে মম ।
কত অপবাদ, কত নিদারুণ অলীক নিন্দাভার
পরালো কণ্ঠে খর কণ্টক-হার ।
অচিন্তনীয় বিশ্বাসঘাতকতা,
এসেছে মর্ম্মভেদী সে কৃতঘ্নতা,
কিন্তু তারাই জীবন-যুদ্ধে করেছে আমারে জয়ী ।

৩

স্বভাবকৃপণা বিনয়বধিরা, তবু যে তোমারি দান
সন্দেহ মোর করিয়াছে অবসান ।
দুঃখ যা দাও বুঝিনে কী তাহা, দুখ ব'লে হয় ভুল—
তোমার কাঁটাই সহসা যে হয় ফুল ।
শব-সাধনার জীবন আমার ধরা,—
শবাসনা সাথে হয়ে গেছে বোঝাপড়া,
কৃপা লভিয়াছি, বিড়ম্বনার আর ক্রীড়নক নহি ।

৪

সামান্য নহ তুমি ভাবময়ী, তুমি যে অতুলনীয়া—
মাটি হয়ে থাকো সরস সদয় হিয়া ।
হেরেছি তোমার চিন্ময়ী-রূপ আমি দুনয়ন ভরি,
ভুবন তুমিই, তুমি ভুবনেশ্বরী ।
তুমি মাটি বট, দেবতা তোমাতে হয়,
রূপ আর ভাবে চলিতেছে বিনিময়,
তুমিই ষোড়শ-মাতৃকা দেবী তুমি মহাকালী অয়ি ।

কবিতার দুঃখ

বটি মানুষের সুখ-দুখ-ভাগী, বাস করি এক ঘরে,
কিন্তু আমি তো ভুগিতে পারিনে প্লীহা কি কম্পজ্বরে ?
দেখি তাহাদের অন্নকষ্ট—নানা দিকে ক্ষতি-ক্ষয়—
কিন্তু তাদের দৈনন্দিন দিই না তো পরিচয়।
তা'তে কী সার্থকতা—
হাঁপাইয়া আমি যদি তাহাদের কহি হাঁপানির কথা ?

২

দাবানলে মৃগ-মড়কের কথা বলে নাকো মৃগনাভি,
মুক্তা করে না লবণ জলের প্রতিনিধিত্ব দাবী ;
রৌদ্রও আছে, জলকণা আছে, সন্দেহ নাই অণু—
তবু মেঘ নয়, রৌদ্রও নয়, রামধনু—রামধনু।
পঙ্কেতে রহে বোঁটা—
কী দোষ যদি না রহে পঙ্কজে পঙ্কের ছিটা-ফোঁটা ?

৩

হীরক রাখে না আবেষ্টনীর কয়লা-কালিমা লেশ,
অলখিত থাকে খনির আঁধার খনি-শ্রমিকের ক্লেশ ;
সাপের মাথায় মাণিক, তাহারও আনন্দ দিতে সাধ,
সেও দেয় নাকো বিষদংষ্ট্রার গরলের সংবাদ।
শুভ শঙ্খ-স্বন—
শম্বুকদের শুঁড়ের কাহিনী করে না তো নিবেদন।

৪

'চোখ গেল' ব'লে পাপিয়া ফুকারে, সেটি হয় সঙ্গীত ;
ক্ষুধিত ব্যাঘ্র গর্জন করে, সেটা তার বিপরীত।
অতিক্রম যে করে সঙ্গীত সব যাতনার সীমা.
ছন্দে ও সুরে বাজে তার চির-বাসন্তী পূর্ণিমা।
তিক্ততা রহে দূব—
গীত যে সাগর-উত্থিত সুধা সব তার সুমধুর।

৫

এসেছে দারুণ মন্বন্তর, মানুষ করিবে কি ?
লাভ তো কিছুই হবে না করিয়া মনকে হতশ্রী।

সুধাকর নাম না দিয়া চাঁদকে যদি বলা হয় 'খেটে,'
পড়িবে কি একমুঠা বেশী ভাত তাতে ক্ষুধিতের পেটে ?
কে হবে তাহাতে ধনী—
খুলে লও যদি ধরা-গাত্রের সুষমার আবরণী ?

৬

অধিকারী-ভেদ সবেতেই আছে—কী বলিবে মহাজনে
কাশ্মীরী শাল না বুনে শিল্পী 'গামছা'ই যদি বোনে ?
যাবা 'অজন্তা' 'মাদুরা' গড়েছে খ্যাত যারা চরাচরে
কলা-লক্ষ্মীই কাঁদিবে, তাহারা যদি শুধু ঢেঁকি গড়ে।
বাড়িবে বিড়ম্বন—
সকল লেখনী লাঙল হইলে উপবাসী রবে মন।

৭

ভেবো না নেহাৎ উদাসীন আমি, নাইকো সহানুভূতি,
যদি না ফসল ফলাইতে পারি, জোগাতে না পারি ধুতি।
আমি তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনার কথা কই.
সুরপূরে তাহা পাঠাবার শুধু যোগ্য করিয়া লই।
বুঝিতে ক'রো না ভুল—
বাণী-অর্চ্চনা হয় নাকো দিয়ে গোবরের বর্তুল।

৮

যুগ-উপযোগী হতে কহ মোরে, তাতে মোর রুচি নাই,
সব দেশ কাল জাতির আমি যে মর্য্যাদা পেতে চাই।
ধনিক বণিক শ্রমিক ক্ষণিক কারও প্রীতিকামী নহি,
আমি জগতের যজ্ঞের হবি দেবতার তরে বহি।
আর কিছু নাহি পারি—'
আমি তোমাদিকে করি আনন্দ অমৃতের অধিকারী।

কেমন আছি

কাটছে দারুণ শীতের রাতি কষ্টে ছিটে-বেড়ার ঘরে,
হৃষিকেশের ঝারিতে সব সাধুর বসত মনে পড়ে।
সাধুর মত মন পেলে তো ? এ পর্ণবাস কাম্য বড়—
মন রে আমার হিমের রাতে অমরনাথের দেউল গড়ো।

শীত তো শুধু ভোগায় নাকো আনে কত ত্যাগের কথা,
'সুরভি' আশ্রমের সুধা, 'ধরাদ্রোণে'র পবিত্রতা।
নিশির শেষে ধোয়ায় অজয়, সিঁদুর মেখে ওঠেন রবি—
আমি যে এই পল্লীবাসে কল্পবাসের তৃপ্তি লভি।

শুনেছিলাম ভূমণ্ডলে স্থল বেশি নাই, তিন ভাগই জল,
দেখতে পেলাম ন'ভাগ সলিল, কোনখানেতে দাঁড়াই মা বল?
বন্যা নিলে অনেক কিছু নিতো আরও অধিক পেলে—
কিন্তু প্রচুর গান দিয়েছে বিহগগণের কণ্ঠে ঢেলে।
ভোর থেকে জোর জমায় আসর কাঁসর বাজায় লোচন-পাটে,
যোগ দিয়েছে কোকিল এবং টাক্‌সোনাও সে কনসার্টে।
মাধবীতে ফুলের স্তবক—অজস্রতা চক্ষে পড়ে—
দৈন্য এবং দরিদ্রতা যা দেখি তা নরের ঘরে।

শীত পড়েছে—শীত বেড়েছে—তবু দেখি সরিয়ে শীতে
দিচ্ছে উঁকি শ্যামল শাখায় আমের কনক-মঞ্জরীতে।
বাল্যে ডাকা সে চাঁদ সাঁজে মোর ললাটে পরায় টিকা,
বিরাজ করেন কুটীর ঘিরে বিশাল 'কেদার' 'বদরিকা।'
কুবের শুধান 'রত্নরাজি এলাম দিতে নেবেন কি গো'?
আমি বলি, 'যান ফিরে যান ও সব রাখার ঠাঁই নাহিকো'।
পেয়েছি যা তাহাই বেশি—আমি পাবার যোগ্য যাহা—
জুঁইয়ের বুকে ডাঁশের মধু কেমন ক'রে ধরবে তাহা!

রাজপ্রাসাদে দিন কেটেছে, কেটেছে রাত তরুর তলে;
কোথায় বেশী ভাল ছিলাম? শেষই ভালো মন যে বলে।
দেয়না বাধা গ্রীষ্ম-আতপ, অতি দারুণ বর্ষা শীতে—
ভুলায় মোরে—ভোলেনি যে পাখীর গায়ে পালক দিতে।
দুঃখ দিলে আমায় প্রচুর, যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা—
শক্তি এবং সান্ত্বনাও দিয়েছে যেই মহামনা।
অভাব বহু নীরব রহি, চাইতে আমার লজ্জা করে
মহামায়ার স্তন্যধারা লেগে আছে এই অধরে।

কথাতে আর গরল নাহি, কথার ভয়ে হই না ভীত,—
সকল কথাই আমার কাছে হয়েছে আজ কথামৃত।

নিন্দা যাঁরা করেন আমার—করেন না তা বন্ধু বিনে—
ধূলায় ধূসর যে-জন তারে ধূলা দেওয়া স্নেহের চিনে।
যাঁরা করেন সুখ্যাতি মোর, লই না, কারণ বিফল নেওয়া।
ন্যাংটা নাগা সন্ন্যাসীকে দয়াশীলের বসন দেওয়া।
গৌরব আমি রাখব কোথা? ক্ষুদ্র কুলায় আছি টিঁকে,
রে ভাই. ময়ূরপুচ্ছ দিতে এসনা এ টুনটুনিকে।

কাঁপে আমার পর্ণপ্রাসাদ—বৃষ্টি পড়ে, ঝড়ও বহে—
ডাকি, 'কোথায় হে জগদীশ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হে'।
সে ডাক তাঁহার কর্ণে পশে, সন্দেহ মোর নাইকো কোনো—
পাই গরুড়ের পাখার বাতাস,—ঘোরে যেন সুদর্শনও!
দর্শনীয়ের দর্শনেতে আনন্দে হই আত্মহারা,
কুশল শুধান যেন এসে যুগের যুগের মহাত্মারা।
পঙ্কজের এ পঙ্কগৃহে—রাতে মরি দিনে বাঁচি;
আমার মা আনন্দময়ী—দুখেই পরম সুখে আছি।

সাধন পথে

প্রয়াগে একদা মেঘাচ্ছন্ন মাঘের প্রাতে—
ধর্ম্মশালায় সাক্ষাৎ এক সাধুর সাথে।
সদা-ছাই-ঢাকা গন্‌গনে তার ধুনির আঁচে—
ঝুলি কাঁথা সাথে খাতা হাতে সাধু বসিয়া আছে।
বাঙালী বটেন—হাসিয়া বলিনু—'খাতায় ও কি'?
সাধু বলিলেন, 'ছবি আঁকি আমি, কবিতা লিখি'।
বৃষ্টি পড়িছে—বাহিরে যাওয়া তো কঠিন জানি—
শুনিতে লাগিনু অগত্যা সেই সাধুর বাণী।

বলিলেন তিনি—গীত রচি, গাহি—কণ্ঠ সাধি,
ভাষা ভাব সুর একেবারে সব রামপ্রসাদী।
বেছে বেছে কথা বসায়েছি বহু ভাবিয়া নিজে—
তবু জমিল না—রয়ে গেছে খুঁত কোথায় কী যে।
রামধনু আমি এঁকেছি—নাহিকো প্রভেদ অণু—
অসীমের সেই লাবণ্য কই পেল না ধনু?

অনিন্দ্য এক গোপাল গড়েছি—তাহাও' বৃথা—
লাড্ডু খায় নাকো—নাক টিপিলেও কহেনা কথা।

সব সাধনার গতিপথ এক—রসিকে বোঝে,
সবাই সুধার সন্ধানী—সবে সিদ্ধি খোঁজে।
বহু রামনাম করেছি—বড়াই কত বা ক'ব—
বাল্মীকি হওয়া ছিল না আমার অসম্ভবও।
ছিনু ধ্যানরত, এত অহিংস, উদারমনা—
হয়তো বা ছিল বুদ্ধ হবার সম্ভাবনা।
কিছুই হ'ল না—কোথা খুঁত ? ভাবি দিবস যামী ;
পরশ-পাথর না হয়ে পাথর হলাম আমি !

চণ্ডীদাসের মত পদাবলী লিখেছি দেখো—
ধ্বনি মিলিয়াছে চিন্তামণি তো মিলিল নাকো !
প্রাণ প্রতিষ্ঠা শিখিনি, করেছি গর্ব্ব জমা—
গড়া গেল নাকো তিল তিল রূপে তিলোত্তমা।
সাধনায় মোর সিদ্ধি এলো না—স্পর্দ্ধা ভাবো—
রামপ্রসাদের প্রসাদ পাইনে—দেবীকে পাব ?
শ্মশানে 'মা' ব'লে রজনী গোঙান্থ, কাঁদিনু এত—
ক্ষেপাই হলাম—বামাক্ষেপা কই হলাম না তো ?

তাতল সাগর-সৈকতে পুড়ে ঝিনুক ম'ল—
স্বাতীর বিন্দু বারি বিনা সব বিফল হ'ল।
রূপ ও রসের দধি পাতি নিতি—বুঝলে কিনা—
কিছুতেই দধি জমে না কৃপার 'সাজন' বিনা।
জড় জড়ই থাকে, ভাব আসে নাকো বস্তু হয়ে,
রূপে অপরূপ প্রকাশ পায় না—কী হবে লয়ে ?
সর্ব্বসিত সে শিব আসিল না—তুষারে শীতে,
সুদূর সুরভি এলো না আমার কস্তুরীতে।

তবু তপ করি, কেন আঁকি লিখি, শুনিবে গুণী ?
গঙ্গা আসেনি—আমি পাই তার কলধ্বনি।
শ্যামা না আসুন—চন্দ্র ভালীর চাঁদের আলো
চঞ্চল এই তাপিত সুতের চোখ জুড়ালো।

তরণী ডাঙায়—আছি জোয়ারের প্রতীক্ষাতে—
হাল ঠিক রাখি, দাঁড় বাঁধি, পাই শান্তি তাতে।
পরিপূর্ণতা আসিছে—চলুক এ টানা-বোনা—
মন বলে মোর কাঠের সেঁউতি হবেই সোনা।

ভাঙ্গন

ভাঙ্গলো লুকোচুরির খেলা শ্যামল বাগান শুকিয়েছে,
'দাণ্ডা-গুলি'র হিসাব নিকাশ দুদণ্ডে সব চুকিয়েছে।
'ঝুল ঝাপ্পুর' খেলতো যারা দুল্‌তো যারা হিন্দোলায়,—
'কু' দিয়ে সব বাল্য সখা কোথায় কে আজ লুকিয়েছে।

'বাঘবন্দী'র ঘরটি কেহ ঘুটিং দিয়ে আঁকছিল,
'দশ-পঁচিশে'র ছকটি পাতা রঙের গুটি পাকছিল,
হঠাৎ ধুলোট জমাট মেলায় ভাঙ্গলো খেলা মাঝখানে,
কেউ জানে না—কোথায় তাদের বনভোজনের ডাক ছিল!

প্রীতির বাঁধে ধরলো ভাঙন জল বাড়িছে চারদিকে।
ফুল খসেছে ঠাসবুনানী গাবের ফুলের হার থেকে।
ঝড় লেগেছে ফুল-ছড়িতে শোভার থাকা যায় ভেঙ্গে—
পড়লো যে চিড় বুকের মাঝে কোন প্রলেপে সারবে কে?
করলে সোনার তরীর বহর ছন্নছাড়া কোন ঝড়ে।
খোঁপছাড়া আজ কোন সে নিঠুর করলে কপোতপুঞ্জেরে?
দলহারা আজ পদ্মটাটি অশ্রুসায়র মাঝখানে—
শূন্য-মধু মৌচাকে আজ মন-ভোমরা গুঞ্জরে।

কাব্যসম্ভার

মুক্তার ডুবারী

তলাইয়া যাই নীল সাগরের গভীর অতল তলে।
ভাব সাগরের, রূপ সাগরের অগাধ অথই জলে।
হাঙর কুমীর ভয়াল অক্টোপাস,
পদে পদে বাধা, পদে পদে জাগে ত্রাস,
শুক্তিগুলিও লুকাইয়া থাকে ঘন শৈবাল দলে।

মহাসাগরের টান পাই আমি মুক্তা আমাকে ডাকে—
আমি সাগরের বুক চিরে আনি—বুকে ধরি আনি তাকে।
লাবণ্য তার দেখাই জগজ্জনে
রবির আলোক খেলা করে তার সনে,
জহুরী তাহার পানে চেয়ে চেয়ে অবাক হইয়া থাকে।

দেবতা তো নই করিতে পারিনে মন্থন জলনিধি,
তুচ্ছ ডুবারি শুধু ডুবিবার শক্তি দিয়াছে বিধি।
এই অজানারে পাবার আকাঙ্ক্ষা,
মানে নাকো বাধা মানে নাকো শঙ্কা,
মোরা দুর্দাম আগুলি রাখিতে পারে নাকো এই ক্ষিতি।

লোকে বলে কর কি লোভে কি লাভে এই কাজ দুষ্কর,
লাভবান হয় বিলাসী বিষয়ী ধনী হয় সদাগর।
গিরির শৃঙ্গে অভিযাত্রীর দল
উঠিয়া কি লভে? তবে তা কি নিষ্ফল?
এই মণিধরা ব্যবসায়ে কেহ খতাতে চাহে না দর।

কুলহীন ওই নীলাকাশে যারা খুঁজিছে নূতন তারা,
আকাশ ঘেরিয়া ফেলিতেছে জাল—এর কিছু বোঝে তারা।
তাহারা কি পায়? কত লাভ কত ক্ষতি?
পরমানন্দ নূতন তারার জ্যোতি
হাতের মুঠায় চাঁদ পায় তারা—তাতেই আত্মহারা।

এও তপস্যা এও যে সাধনা ইহাকেই ধ্যানে ধরি—
মুক্তা তুলিয়া মেটে নাকো আশ—কবির ব্যবসা করি।
জরা আসি যবে শকতি কাড়িয়া লয়,
মুক্তারি কথা তবু সদা মনে হয়।
দ্রব মুকুতার মালা দিয়ে বলি—মুক্তি চাইনে হরি।

নিষিদ্ধা

বলে নয় এটা কবিতার যুগ' তবুও কবিতা লিখি
যুগ উপযোগী হতে তো নারিব আছি যটা দিন টিকি।
প্রভাতী এবং বিদায়ী সূর্য্যে কবিতার পরিবেশ—
চাঁদের সুধার কবিতার কই হয়নি তো আজও শেষ?
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী বলে আমার হাসিটি আঁকো,
চুপ করে কেন? তোমাদিকে মোরা বুড়া হতে দেব নাকো।
আজও অঙ্গনে কুসুম যে ফোটে, কুহরে পাপিয়া পিক,
অফুরন্ত যে বসন্ত ডাকে 'আছো তো বন্ধু ঠিক'।
বর্ষায় আজও নৃত্য দেখায় পুচ্ছ মেলিয়া শিখী—
কবিতার যুগ না হলেও তাই আমরা কবিতা লিখি।

গীতের যে যুগ নহে—সে যুগকে, মৃতের বলিয়া জানি,
অমৃতের কণা নাহিক তাহাতে মুখে নাই তার বাণী।
অভাগা যে যুগ—সংযোগ নাই যার সাথে কবিতার,
মহাকাল কাছে পরিচয় দিতে সাক্ষী নাহি যে তার।
যুগ ও জীবনে জড়িত কবিতা কেমনে সরাবে তাকে?
কে কাড়িতে পারে কাল সাগরের বুক হতে নীলিমাকে?
মেঘ শুধু জল দিতেই পারিত ডম্বরু কেন বাজে?
তটিনীর ওই কলধ্বনি তো লাগে নাকো কোনো কাজে।
অশথের কচি পাতে ঝিলিমিলি কাঁচা রোদে ঝিকিমিকি
কবিতার যুগ না হলেও তাই আমরা কবিতা লিখি।

যুগ তো কবিতা গড়িতে পারে না কবিতাই যুগ গড়ে—
ছন্দের সুর ডোবাতে পারে না গর্জন ঘর্ঘরে।

শত ট্রাকটার আরমার্ড-কার যুগ গড়িবে না জানি,
পারে নাই যুগ গড়িতে যেমন গোরুর গাড়ি ও ঘানি।
ত্রেতা চলে গেছে—রাম রাবণের যুদ্ধের অবসান,
যুগ যুগ ধরি চলিছে কিন্তু সেই রামায়ণ গান।
গেছে দ্বাপরের গাণ্ডীব গদা কপিধ্বজও নাই—
শুধু গীতা আর নূপুরের ধ্বনি বাঁশরীর সাড়া পাই।
কবিতা যে কালজয়ী সনাতনী সে তো নয় আধুনিকী,
কবিতার যুগ না হ'লেও তাই আমরা কবিতা লিখি।

ঠকার আনন্দ

শৈশবে মোর গ্রামের নদী ও বিলে
হাত থেকে মাছ লইত শঙ্খচিলে।
না ধরিলে মোর চিনিতে পিঁপড়ে ডেঞে,
পাইনে আরাম এখনো খেয়ে ও নেয়ে,
মনে ব্যথা পাই হাঘরে ফিরিয়া গেলে।

দূরে তাঁবু পেতে যোগী ভবঘুরে দল—
ফেরে সাধুবেশে—করে নানাবিধ ছল।
ভিড় হতে বেছে আমাকেই তারা ডাকে—
বোকা চিনিবার ক্ষমতা বিশেষ রাখে,
বলে 'ওরে ব্যাটা পকেটে কি আছে বল ?'

'আছে পাঁচসিকা জানি, দেখ-শোন তবে—
টাকাটি ভোগের উহা মোরে দিতে হবে।
ভাগ্যবানের কাছেই যা কিছু লই।'
টাকাটা দিলাম—নতুবা উপায় কই।
বলিল, এ দান অক্ষয় তোলা রবে।

শিয়াল মারাও মোরে সাধুভাই জানি,—
সন্ন্যাসী সাজি ডাকে দিয়া হাতছানি।
কঠিন 'কেদার' বিশাল 'বদরী' যাবে—
কম্বল নাই—না দিলে কোথায় পাবে ?
ভোজন করাই শুনি কবীরের বাণী।

আমি মনে ভাবি—দাঁড়ায়ে যখন কাছে—
এদের বৃহৎ ঐতিহ্যই আছে।
গ্রহণ করেছে রাজরাজড়ার দান—
খাঁটি সাধুদের লভিয়াছে সম্মান,
রাজসূয়ে ছিল বুঝি সাধুদের পাছে।

জীবনকাব্যে এ সব মন্দ নয়—
'শার্দুল বিক্রীড়িত' ছন্দ হয়।
নয় তো দেখি যে ভিন্ন কোনো সে বেশে
হেথা 'ভুজঙ্গ প্রয়াত' আসিয়া মেশে।
স্বাগত জানাই,—মন আনন্দময়।

কি পেয়েছি

দীন বটি আমি, যা চাই পেয়েছি, ধূলা-ধূসরিত পল্লীগ্রামে,
শঙ্খ ঘণ্টা খোল করতাল, শুনি হরিনাম ডাহিনে বামে।
জল-বাহু দিয়ে ঘিরে আছে নদী, ফুলে ফলে বাড়ি ভরিয়া আছে,
পেয়েছি শোভনা শ্যাম বসুমতী—শান্তিতে আছি মায়ের কাছে।
আছে অনটন দুখ দারিদ্র্য নহে তা বিশেষ কষ্টসহ—
মা'র খাই পরি, নিন্দাও করি, হয়ে আছি মা'র গলগ্রহ।

মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস পর্ণকুটির, অন্নমুঠি—
তাহার উপর মায়ের সোহাগ উল্লাসে আমি ফুলিয়া উঠি।
সমীরণে লাগে শত রাজসূয় যজ্ঞভস্ম আমার গায়ে—
সলিলেতে পাই দ্রব নারায়ণ দেহ মন প্রাণ জুড়ায় তাহে।
পুলকিত হই, দ্রবীভূত হই, শুনিয়া 'কমলে কামিনী' কথা—
পদ্ম হইয়া ফোটে চারিপাশে আমার মনের প্রসন্নতা।

অবিশ্বাসের আঁচ লাগে পাছে বহুদূরে তাই সরিয়া রহি
দুরাকাঙ্ক্ষার ক্রীড়নক নই—বিকৃতির আমি বাহক নহি।
শুনিতে হয় না শাণিত তর্ক ভগবান কেহ আছেন কি না?
সহিতে হয় না বিষ-বিদগ্ধ তত্ত্ব কথার লজ্জা ঘৃণা।
পঙ্কেতে ডোবো পঙ্কিল হলে পঙ্কজ হবে বলে না কেহ
শুনিতে হয় না পাপ এনে দেবে দিব্যজীবন দিব্যদেহ।

ঘরে মোর দেবদেবীয় মূর্ত্তি ভক্তগণের পুণ্য ছবি,
আমি তাঁহাদের উপস্থিতির অনুভূতির যে প্রসাদ লভি।
ঘটে পটে তাঁরা আসেন বসেন—এ আসন পাতা নহেক বৃথা,
কি ব্যাকুলতায় আশা পথ চাই—দেবতা তারা কি জানেন না তা।
তাঁরা করে দেন পথ নির্দেশ—ঘুচে সন্দেহ সকল ভীতি।
চুম্বক তাঁরা লৌহকণিকা আপনি টানিয়া লহেন নিতি :

জেনেছি না হলে ইচ্ছা মায়ের—জীর্ণ পাতাও পড়ে না ঝরি,
তিনি বিশ্বাস, তিনি নিঃশ্বাস—তিনিই মা রাজরাজেশ্বরী।
সুবাসিত হয়ে ওঠে এ ভবন কতদিন তাঁর অঙ্গবাসে,
তাঁহার ভালের খণ্ডচন্দ্র দেখেছি সহসা আঁধার নাশে।
দেখা দেন তিনি কথা কন তিনি—তবে প্রতি পদে বিঘ্ন-বাধা।
বাজিকরের যে কন্যা তা ঠিক—ঘোরে সাথে শত গোলকধাঁধা।

আমি টুনটুনি—সহসা কেমনে গরুড়ের বল পাই এ বুকে,
সব গ্রহ তারা সংবাদ লয়, হাসে কাঁদে মোর দুঃখ সুখে।
আমি যে সফরী, সুধা-সাগরের জোয়ারের ঢেউ লেগেছে গায়ে,
আমি মরীচিকা-লুব্ধহরিণ—ফিরেছি ভূর্জবনচ্ছায়ে।
দেখেছি কি তাঁরে? চিনেছি কি তাঁরে? পেয়েছি কি কৃপা?
বলি যা জানি—
বলিতে পারিনে—মুখ চেপে ধরে—বাষ্পরুদ্ধ হতেছে বাণী।

বিদায়বেলা

সকল বাঁধন ছিঁড়তে হবে, সময় নাহি বাকি রে—
যাবার আমার সময় হল—শঙ্খ জানায় ডাকি রে।
ডাক শুনেছি, শুনেছি ডাক, যেতে হবে জল্‌দি হে—
ও ভিজে পথ ভিজাব না তবু নয়ন জল দিয়ে।
দেবযানে যে যাবে চলে তাহার আবার ভয় কিসে?
যাহার মা আনন্দময়ী নিরানন্দ রয় কি সে?
কাটলো জীবন সুখে-দুখে নয়কো নেহাৎ মন্দ,
পান করেছি সহস্রদল পদ্ম মকরন্দ।

পেয়েছিলাম মায়ের কৃপায় অমৃতময় দৃষ্টি—
দেখেছিলাম অভেদ আমি স্রষ্টা এবং সৃষ্টি।
বেদন ব্যথা ঢের পেয়েছি কাউকে নাহি দুষ্‌বো—
ফুটলো কাঁটার বৃন্তে আমার পারিজাতের পুষ্প।

২

গ্রামটি মোদের গ্রাস করো না অটুট রেখো ভাই রে,
যাবার সময় বন্ধু 'অজয়', এ ভিক্ষাটি চাই রে।
প্রণাম করি 'লোচনদেবে' নমি সজল চক্ষে,
গত এবং আগত ও অনাগত লোককে।
মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে 'মা' 'মা' বলে কাঁদবো—
প্রথম আশীর্বাদের কুসুম চেলাঞ্চলে বাঁধবো।
মাধবীতে অযুত স্তবক—ফুটবে মধু মঞ্জরী—
কোকিল হয়ে ডাকবো, যাবো ভ্রমর হয়ে গুঞ্জরী।
প্রণাম করি বিশাল ভারত, বঙ্গভূমি ধন্য—
স্বাধীন দেশের তনয় হয়ে মৃত্যুও হয় পুণ্য।
ক্ষপয়তু পুনর্জন্ম—হে নীল লোহিত কান্ত—
যাত্রা পথটি কর আমার সুন্দর শিব শান্ত

৩

এ নয়তো রোগশয্যা শুধু দর্ভ আসন দিব্য—
দেবারতির মাটির প্রদীপ আনন্দেতে নিভবো।
এও তো এক তপস্যা মোর বেশ পেরেছি জান্‌তে
দিবস-নিশি জননীকে ডেকেছি একান্তে।
বিরাম-বিহীন ব্যাকুল স্বরে জপিয়াছি নাম গো,
যজ্ঞ আমার সাঙ্গ হবে—এবার আমি থামবো।
রইলো সুখ ও শান্তি ভবন—পরিজনে ভর্তি,
সেবক তারা—রইলো মাগো তুমিই গৃহকর্ত্রী।
কি পুণ্যেতে স্বর্গে যাব—আমি যে জীববদ্ধ—
আকাঙ্খা মোর হতে শুধু তোমার পূজার পদ্ম।
যুগের যুগের শরৎ জুড়ে ফুটবো প্রেমানন্দে—
আগমনী গানের সুরে—রূপে এবং গন্ধে।

ব্যাকুলতা

মুখেতে ফোটে না কথা—
অনল-পসরা বুকে বহি আমি জ্বালাময়ী ব্যাকুলতা।
সদা ভাবাকুলা সদা উৎসুকী
আমি উন্মনা, আমি উন্মুখী,
আমি কাপালিক-পালিত কন্যা উচাটন-ব্রতরতা।
পদে পদে দুর্ভোগ।
বিশ্বের যত অশান্ত সাথে আমার রয়েছে যোগ।
গর্জে সাগর, কেঁপে উঠে ভূমি,
বিদ্যুৎ ছোটে, বহে মৌশুমী
সৃজি ধূমকেতু, উল্কা উড়ায়ে খুঁজি আমি ধ্রুবলোক।
কভু বসে মালা গাঁথি—
কভু সৃষ্টির প্রেরণা যোগাই মহাশক্তির সাথী।
কখনো বিরহী যক্ষের বধূ
কভু খর্পরে ঢেলে দিই মধু,
ভীমা চামুণ্ডা সঙ্গে কখনো রণরঙ্গেতে মাতি।
আমি উমা-সহচরী
আমিও যে শিব সুন্দর লাগি ঘোর তপস্যা করি।
পঞ্চাগ্নির মাঝে করি তপ
অগ্নি মন্ত্র আমি করি জপ,
স্বধা ও স্বাহার সঙ্গিনী আমি সিদ্ধিকে আনি বরি।
আমি উৎকণ্ঠিতা—
কলা-পাদপে জড়াইতে চাই তেজের অলকলতা।
আমি ভগবানে টলাইতে জানি
অঞ্চল ধরে লক্ষ্মীরে টানি,
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তিরে দিই যাজ্ঞিকী উষ্ণতা।
শুনেছি বংশীরব—
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি করি সদা অনুভব।
শূন্য কুম্ভ কক্ষে আমার
যমুনার পানে ধাই বারবার,
মোরে ডাকে কোন প্রভাস যজ্ঞ কোন মিলনোৎসব।

কবিমানস

বন্ধুরা ক'ন আমার কবিতা কেহই পড়ে না শুনি—
পড়িবার মত কি আছে তাহাতে, কেন পড়িবেন গুণী ?
পাষাণকে গান শোনাবার লোক আজও ফেরে কুতুহলে—
আমি তাহাদেরি একজন—আর, থাকি তাহাদেরি দলে।
যাহারে শুনাই গান—
হয় সে পাথর, নয় সে পুতুল। নয় বা সে ভগবান।

রাখাল-বালক মাঠে গান গায়, ভাবে না শ্রোতার কথা,
তাহারে যে গান গাওয়ায়—তাহার অন্তর ব্যাকুলতা।
যত দিন তার জীবন থাকিবে ফোটাবে পূজার ফুল—
কে পূজে কাহারে ? জানে না, দেখে না, সিদ্ধ ওই বকুল।
ঝঙ্কারে পিক বনে—
একবার সে তো ভেবেও দেখে না কেউ শোনে কি না শোনে ?

আলোকে ভুবন আলোকিত যার তাহারে আলোক দিতে,
অনুরাগী তোলে আকাশ-প্রদীপ প্রীতি-প্রসন্ন চিতে।
গিরি-গহ্বরে ইষ্টমন্ত্র জপিতেছে কত জনা—
কে শুনিছে তাহা ? সেই শুধু জানে মনে পায় সান্ত্বনা।
হয় না যে নিষ্ফল—
শুক্তি যে স্বাতী-নক্ষত্রের—মাগিছে বিন্দু জল।

অহঙ্কার তো কম নহে মোর, কতই দুরাশা আসে,
ভাবি অভিজিৎ নক্ষত্রই মোর গান ভালবাসে।
তার আলোটুকু বহুদিন পর মোর কাছে পঁহুছায়,
মোর নিবেদনও একদিন যাবে ঠিক তার ঠিকানায়।
একা গান গাই বসি—
ভাবি শুনিতেছে গিরি নদী বন—গ্রহ তারা রবি শশী।

স্বপ্নে যে দেখি পাষাণ দেবতা উঠিছে আমার ঘামি—
তাঁর করুণার সুরধুনীধারা এ বুকে আসিছে নামি।
আলোকি গহন অবজ্ঞার ওই ঘোর অমাবস্যা—
আসিয়াছে দেবী সফল করিতে আমার তপস্যা।

যে যাহাই মনে কর—
বাস্তব চেয়ে স্বপ্ন আমার সত্য অনেক বড়।

আমার গোমুখী গঙ্গাসাগর স্মরি হয় চঞ্চল—
কতটুকু হায় ব্যবধান মোর এই কুঁড়ি হতে ফল ?
আমার আদর বাড়ায়—যতই অনাদর করে লোক,
বংশীধরের বংশীর গান মোর সাথে দেয় যোগ।
যাহাকে শুনাই গান—
নয় সে পাথর, নয় সে পুতুল—সে আমার ভগবান।

মায়ের সোহাগে

দুঃখ কষ্ট অনেক সহেছি—তবুও সুখের অন্ত নাই,
মায়ের সোহাগে সহনীয় হ'ল তীব্র অনেক যন্ত্রণাই।
কূট বুদ্ধি কি কোন বুদ্ধিই, দেননি আমার মস্তকে।
কোনো কাজে নয়—সুখের কাছেই ঘুরিতে দেখি এ হস্তকে।
যশ পাই নাই, যশ চাই নাই,—পেয়েছি সরল সুস্থ মন—
রাজ্য-বিহীন রাজা হয়ে আছি—পেয়েছি মাটির সিংহাসন।
সব ধূলা মার চরণধূলা যে,—ধূসর হয়েছি তাই মেখে—
সবাই আপন, সবেই তৃপ্তি—সদা তাঁর সাড়া পাই ডেকে।

জানালায় মোর কপাট নাহিকো, মোড়া তা খড়ের কিঞ্খাপে,
পৌষে ও মাঘে ভরি যে মায়ের বাবার বাড়ির হিম্‌টাকে।
বাড়িতে হয় না চুরি কি ডাকাতি—সুখ্যাতি মোর দেশময়ই,
জানে দিনে যেথা অর্থ মিলে না—রাতে মিলিবে না নিশ্চয়ই।
বাড়ি পাকা নয়— কেন করি নাকো—লোকে যাহা বলে শুন্‌ছিতো,
অজয়ের ভয়ে বিশাল সৌধ রূপায়িত হতে কুণ্ঠিত।
রূপার অভাব জেনেও বলে না—গৃহে যদি ঠাঁই নাই থাকে,
সদয় অজয় নিজে দোষ লয়ে—নিতি গরিবের মান রাখে।

অতিথি আসেন তাঁরা দেবময়—প্রচুর না হোক খাদ্যাদি,
আদর এবং পানীয় জলের কতই করেন সুখ্যাতি।

আমি আত্মীয় বন্ধুগণের গৃহে গেলে ভয় পায়নাকো,
অভিক্ষুক যে লোকটা তা জানে—কারও কাছে কিছু চায়নাকো।
জ্ঞানী, গুণী, ধনী কিছুই তো নহি—তবু বসে থাকি বিজ্ঞবৎ,
যেতে হয়নাকো কোনো দরবারে—দিতে হয়নাকো কৈফিয়ৎ।
প্রজ্ঞা লভিতে পুস্তক পড়ি—খাইনাকো বটে গঞ্জিকা—
লেখা 'আড়া' জল—বিন্দু সলিল মিলে না নিঙারি পঞ্জিকা।

বুড়া হইয়াছি, বুঝতে পারিনে—বুঝি যাই—যবে গ্রাম ছেড়ে,
গ্রামেতে মায়ের ছেলে হয়ে আছি—আরামেই দিন যায় বেড়ে।
ছোট ছেলে মেয়ে ঘিরে রয় মোরে ভেসে আসে যেন গ্রাম গোটা,
বাধা মানেনাকো ষষ্ঠী দেবীর দধি হলুদের দেয় ফোঁটা।
প্রাচীন অশথ নূতন পত্রে সুশোভিত হয়ে প্রান্তরে—
হেসে বলে মোরে দেখেছ বন্ধু—বেশ কাঁচা আছি অন্তরে।
কোকিল শুধায় কেমন আছ হে ? বক বলে উড়ে যাচ্ছি ভাই,
ভাল আছ—আর ভাল থাক যেন—সবাকার মুখে এক কথাই।

কৃষ্ণচূড়াটা চূড়া বেঁধে দেয়—টোপর পরাতে বট চাহে—
বংশ বংশী লয়ে কাছে আসে, তবুও যায় না খট্‌কা হে।
বুড়া আকন্দ ফুলে ফুলে ভরা—বলে কই দেখা পাইনে আর ?
ফিরিবার পথে দেখা হ'ল আজ ঘনায়ে আসিছে অন্ধকার।
ফুল চেয়ে বেশী কাঁটা পেয়ে থাকি, কাহারও উপরে নাইকো রাগ,
সুবোধ বালক 'গোপাল' ছিলাম, 'বেণী' করিয়াছে মার সোহাগ।
ক্ষীর কই ? কই মিঠাই কোথায় ? জোগাইতে হয় আজ তাঁরে,
জগজ্জননী ঝালাপালা হ'ল, অকৃতী সুতের আবদারে।

বড় ঘর

[একখানি মাটির ঘর, অজয়ের ভাঙনে সম্মুখীন। ঘরখাটির প্রতি গৃহস্বামীর অসাধারণ মমতা। উহা তাঁহার পূর্বপুরুষগণের ব্যবহৃত নিকেতন, সামান্য সরল চিত্রকলায় সুসজ্জিত ও তাঁহার শৈশব-বাসগৃহ।]

জীর্ণ প্রাচীন তুচ্ছ অতি খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর
একি দরদ তাহার প্রতি, কি মমতা উহার উপর।

শুষ্ক কখান বাঁশের বাতা—তাহার লাগিই এতই শোক !
কেবল ক'টা সিঁদূর কৌটা সজল করে সবার চোখ ?
বসুধারার মলিন ধারা মোছা মোছা আলিম্পন,
করছে আহা আপন হারা একি পাগল মানবমন !
গরিবের ওই বাস্তুভিটা দারুণ অজয় ভাঙবে কাল
একেবারে ভাঙবে দীনের 'ভাটিকান' ও রঙমহাল।
শৈশবের ওই দোলন-দোলা' ঝুলন ঝোলা শৈশবের,
পুণ্যস্মৃতি প্রণয় গীতি তুলসী ও মৌ-বনের।
ভাঙবে মনিকর্ণিকা-ঘাট ভাঙবে চক্রতীর্থ যে
যায় দরিদ্রের ছত্র চামর—ব্যাকুল করে চিত্তকে।
সুখের দুখের শিলালিপি আনন্দের ওই অজন্তা
কাল যে উহা পড়বে ভেঙ্গে, বুঝবে বল কজন তা ?
ভাঙন ধরা মাটির পরে দেখছ না ওর কি শ্রদ্ধা
ও ঘর উহার এক সাথেতে পঞ্চবটী, অযোধ্যা।
প্রতি রাঙা মাটির লেপে কান্না হাসি জড়িয়েছে,
উৎসবের যে উল্লাস রস ওই মাটিতে গড়িয়েছে।
আধেক ছায়া আধেক কায়া আধেক কথা আধেক গান,
স্বর্গ আধেক মর্ত্য আধেক ওই যে উহার গৃহখান।
ওকি শুধু ভগ্ন দেয়াল, ওকি শুধু খড়ের ঘর
ও যে উহার দেবের দেউল বাসরগৃহ একত্তর।

মহাকালের শিল্পী

মহাকাল তব শিল্পী আমরা উৎসাহী অনুরাগী
করি তপস্যা বিনিদ্র নিশি জাগি।
আমাদিকে তব সেবক করিয়া লহ
আমাদের মুখে তুমি কহ কথা কহ
কর কালজয়ী যাহা গড়ি রচি, যাহা গাহি যাহা আঁকি।

সে তো দরিদ্র প্রকাশ যাহাতে হল না অপ্রকাশ,
যাহাতে হল না অপার্থিবের বাস,
সেই বর মোরা চাহি যে তোমার কাছে,

গড়ি অসীমের ইঙ্গিত যাতে আছে।
যা তব তৃতীয় নেত্র আলোকে আলোকিত বারো মাস

নির্মাণ করি লাবণ্য লোক জরা ও মৃত্যু জিনি
স্রষ্টা মোদের সৃষ্টির কাছে ঋণী।
রচি তপোবন বিরাজে শকুন্তলা
গাহি গীত হয় সুরধুনী চঞ্চলা!
মোদের শক্তি শিবের লাগিয়া সতত তপস্বিনী।

তব দৃষ্টির প্রসাদ লভিয়া আমরা সৃষ্টি করি
তাই রেখা-ছবি রূপে রসে উঠে ভরি।
সৃজি অশ্বিনী উর্বশী রূপ পায়,
বামন গড়ি সে ত্রিপাদ ভূমি যে চায়.
তুচ্ছ কালির আঁখরে আমরা বিশ্বরূপকে ধরি।

আমরা হরির অদর্শনেতে রচি ষড়দর্শন
দেখিয়া হয়ত হাসেন জনার্দন।
অন্যায় তিনি করেন দেখা না দিয়া,
ন্যায়ের তর্কে দিই তাঁরে উড়াইয়া।
তাঁরে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় করি, আমরা অকিঞ্চন!

ভগবান রূপ লুকাইতে গিয়া কোথায় পড়েন ধরা,
কার্য মোদের তাঁর সন্ধান করা।
বহুবল্লভ আমরা জেনেছি তাঁরে,
বহুরূপ তাঁরে দিয়াছি এ সংসারে,
সব রূপ তাঁরি—সত্য সে রূপ হোক আমাদের গড়া।
বিধাতার মোরা নিন্দা রটাই—স্বভাবতঃ দুর্মুখ,
আমরা তাঁহারে করেছি চতুর্মুখ।
তাঁর বাহনের হতেছি শুভ্র পাখা,
তাহাতেই হয় লেখা—আলেখ্য আঁকা,
কমণ্ডলুটি কেড়ে নিতে তাঁর মোরা সদা উৎসুক।

কোথা উবে গেল ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, দ্বারাবতী?
আমরা তাদিকে রেখেছি সজীব অতি।

ভাবের ধরণী স্বজি রূপ আসে তাতে
বাস্থকী তাহাকে ধরিতে ফণা যে পাতে।
আমাদের মহাভারতে বসতি—করেন সরস্বতী।
দেখি কল্পনা কল্প-পাদপে অমৃত ফল ফলে
জানি উল্লাসে-বিস্ময়ে অাঁখিজলে।
আমরা শিল্পী অরূপের রূপকার।
বিষ খাই করি অমৃতের কারবার,
স্নেহাদরে শিব-সীমন্তিনীর—আমাদের দিন চলে।
মহাকাল তব ডমরুর রবে উৎসব মোরা গণি
আনন্দে নাচি গরজিলে তব ফণী।
বৃষভের পিঠে তুলে লও তব পাশে,
আমাদিকে দেখে দেবতারা যেন হাসে,
তোমার সঙ্গে যাই দিতে দিতে তোমার জয়ধ্বনি।

বড়র দাবী

বড়ই বাজিছে মোদের চোখের আগে,
বড়র ব্যথাই বড় হয়ে বুকে জাগে।
পুড়ে রাশি রাশি গুল্মের দল,
তার লাগি নাহি ঝরে অাঁখিজল,
বড়র অভাবে দিক ফাঁকা ফাঁকা লাগে।
অভাগিনী রাণী 'মেরী এন্‌টনিয়েট,
তার লাঞ্ছনা ফরাসীর মাথা হেঁট।
লক্ষ পুঁতির কিবা দরকার?
একটা থাকুক সে হীরার হার,
তারি গৌরব জাতির দীনতা ঢাকে।
'ক্রমওয়েল' পরে দারুণ মোদের ঘৃণা
দেশের রাজারে কোতল করালে কিনা!
সিংহ মরিলে কানন অাঁধার
বনস্থলী যে হয় তোলপাড়,
'বলি' তো দিতেছি দিন শত শত ছাগে।

হাজার হাজার জেলেডিঙ্গি ডোবে রোজ,
তাহাদের বড় করে নাকো কেহ খোঁজ।
ডুবিলে ক্রুজার, ডুবিলে জাহাজ,
চঞ্চল হয় মানব সমাজ,
তারে ও বেতারে ধরারে সাগর ডাকে।

লক্ষ রোগী যে মরিছে হাসপাতালে
কজন তাঁদের স্মরণ-দিবস পালে ?
যাহারা বৃহৎ যাহারা মহৎ
ঘুরিছে দীপ্ত জ্যোতিষ্কবৎ
তাদেরি বিহনে কাঁদে ধরা অনুরাগে।

রাহু আসি যবে গ্রাস করে সুধাকরে
ভুবন ভরিয়া তখনি 'গ্রহণ' ধরে।
জ্বলিছে নিভিছে উল্কার দল,
কেহ তো দেখে না দেখিয়া কি ফল ?
বড় করে হায় বড়ই বিদায় মাগে।

টবের অশত্থ

রুপেছে এক অশত্থ তরু ক্ষুদ্র মাটির টবে,
দশটি বছর আছে আরো দশটি বছর রবে।
কোথায় তাহার সে উচ্চ শির কোথায় সরল শাখা,
ক্ষুদ্র কুসুম পাদপ সম ক্ষুদ্রতা তার আঁকা।
যখন চাহি উহার পানে আমার মনে হয়
রুদ্র এমন ক্ষুদ্র হয়ে কেমন করে রয়।
এ যেন হে ইন্দ্ররাজা সংগ্রামেতে হারি,
মালীগিরি করছে এসে রাবণ রাজার বাড়ি।
মায়াবাদের সাধ নাহিকো অন্নাভাবের টানে,
শঙ্কর হায় লিখছে যেন ঋজুপাঠের মানে!
কোথায় মানস অলকা তার সাধ্য নাহি যেতে,
কালিদাসের কাটছে জীবন বিয়ের শোলোক গেঁথে।

কোথায় গেল নন্দবংশ, চন্দ্রগুপ্ত রাজা—
চাণক্য গোমস্তা হ'য়ে শাসছে যেন প্রজা !
ক্ষুদ্র গ্রামের পাঠশালাতে ছাত্রদিগে লয়ে
নেপোলিয়ন শেখাচ্ছে ড্রিল গুরুমশায় হয়ে !

নামজাদা

জল তো ধরিতে ঘটি বাটি পারে—জলধর নাম মেঘেরি সাজে,
পদাঘাত এক ভৃগুই করেছে,—আর পদাঘাত বিফল বাজে।
পঙ্ক হইতে জনমে অনেকই কে কহে কে ভাবে তাদের কথা ?
জল আলো—করা পদ্মই আনে পঙ্কজ নামে সার্থকতা।

কেশর তো আছে ঘেঁটু-পুষ্পেরও—সিংহকে তবু কেশরী জানি,
বীণা তো এখন অনেকে বাজায় তবু বাগ্দেবী সে বীণাপাণি।
কর প্রতিদিন বেড়েই চলেছে করী হল কিনা বনের হাতি—
গিরি ধরে হনু হনুই রহিল গিরিধারী হল জগন্নাথই।

জীর্ণবাস

জীর্ণ-বসন পরা কি বিপদ কম
চাই চোরের বুদ্ধি—দধীচির সংযম।
হাওদা বিহীন হস্তীতে যেন চড়া,
ক্ষীণ দৃষ্টির আন্দাজে পুঁথি পড়া।
অশক্ত স্থতে খেলানো বৃহৎ রুই,
অপটু লাঙলে চষিবারে যাওয়া ভুঁই।
লতার পুলেতে লছমন-ঝোলা পার,
রুগ্ন উষ্ট্রে পাড়ি দেওয়া সাহারার।
পেট্রলহীন এযে ঠিক মথ্ প্লেনে,
বার্লিন যাওয়া বিমান আক্রমণে।

ইউরোপের এ সন্ধিপত্র প্রায়—
ঠিক নাই কিছু কখন ফাঁসিয়া যায়।
ঋন-গ্রস্ত ধনীর এ জমিদারী—
নিলামে কখন উঠিবে বুঝিতে নারি।

নদীয়া হইতে নহে আর বেশী দূর,
ভাসে নাই ডুবুডুবু এ শান্তিপুর।
চৌদিকে এর ব্রিটিশের দেশ রাঙ্গা,
খাড়া আছে শুধু নামেই ফরাসডাঙ্গা।
জীর্ণ-বসন জরায় জীর্ণ দেহ
রাখা ক্লেশকর বর্জনই তাই শ্রেয়।

পুরীপারের চিঠি

আমি পুরী এক্‌সপ্রেসেই চেপে সটান গিয়ে উঠবো স্বর্গদ্বারে
তোমরা সখা রও ওয়েটিংরুমে ধিকৃধিকিয়ে যেও প্যাসেঞ্জারে।
খেয়ার তরীর আশায় বসে থাকা আঁধার সাঁজে পারের ঘাটে ভাই--
কোনো ক্রমেই পারবো নাকো আমি, জানো তেমন ধৈর্য আমার নাই।
শুষ্ক বোঁটায় জীর্ণ বাসি ফুল অতীত শোভার দেখুক গে স্বপন,
চাইনে আমি রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে করতে সুখের দুখের রোমন্থন।
উৎসব ভোজ সাঙ্গ হ'ল যদি, চলুক বিদায় বিসর্জনের পালা
কেন সেথা দীন কাঙালীর বেশে পথের ধারে পাততে যাব থালা?
পক্ষহারা স্বর্ণ প্রজাপতি সাজবে কেন লাল করবীর শাখে?
ভাঙা গলা কোকিল উড়ে যাবে বসন্ত তার যে দেশেতে ডাকে।
বৃথা মলিন তাস ভেঁজে কি হবে, শেষ হয়েছে শেষই হউক বাজি,
আরবী ঘোড়া ডারবি রেসের শেষে পিঁজরাপোলে থাকতে নহে রাজী।
গুঞ্জরিয়া পদ্মচরণ ঘিরে এ চঞ্চরী ঝটিতি চায় যেতে
মৌমাছি যে, হাসপাতালে থেকে পারবে নাকো বার্লি সাবু খেতে।
পুনঃ পুনঃ পানকৌড়ির মতো, নয়কো ভাল ডোবার অভিনয়।
ডুববে যদি রবির মতো ডোব সমান মধুর অস্ত ও উদয়।
'যাচ্ছি যাব'র সার্থকতা নাই, যাবে চল, রইতে হয়তো রহ,
জ্বলা নেভা বেশ তো সহা যায় ধোঁয়াইবার ব্যথা দুর্বিষহ।
নেবার যাহা, নিয়েছি কোন দিন, থোবার যাহা এখন আমি থোব,
ভাঙলো আসর সাজের পোষাক ছেড়ে নিদ্রা যাব যেমনি আমি শোব।

ভক্তের ভগবান

ভক্ত তোমার যখন যেরূপ, দেখেছে করেছে ধ্যান,
সেই তব রূপ—ভক্তের ভগবান।
ভক্ত সতত সত্য দৃষ্টি অসত্য তাতে নাই,
তিনি যা দেখেন তুমি তাই, তুমি তাই।
তুমিই সাকার তুমি নিরাকার, অপরূপ রূপবান,
বহু বহু-রূপে তোমার অধিষ্ঠান।

সুন্দর তুমি, কুৎসিতও তুমি; বরাহ কমঠ মীন,
তুমি লাবণ্য পাথার, তুলনা হীন।
ভুবন তুমিই ভুবনেশ্বর, ভাবে রূপে ছড়াছড়ি
যাহা আছে নাই, সকলি যে তুমি হরি।

ভক্ত তোমার যে নাম দিয়াছে, তাই তো তোমার নাম,
মধুর মধুর সুমধুর অভিরাম।
নামের ভিতর বসতি তোমার, নামে ঝরে সুধাধার
শব্দ ও রূপ হইয়াছে একাকার।

নামের ডাকেই রঘুনাথ দাস, সনাতন গোস্বামী,
স্কন্ধেতে ঝুলি নিল, হে জগৎস্বামি,
গিরির গুহায় নাম জপে যারা, কি সুখ লভিতে সাধ ?
অনাস্বাদিত সে সুখের আস্বাদ।

যুগের যুগের কত পাপী তাপী, নিদারুণ ব্যথাতুর
নামেই শান্তি লভেছে সুপ্রচুর।
নাম জপ করি বাল্মীকি হল, কত যে রত্নাকর
নাম অমৃত আনন্দ, মনোহর।
নাম প্রেম দেয়, করে প্রেমময়, মানুষে ভাঙ্গিয়া গড়ে,
পতিত পাথরে পরশ-পাথর করে।

তোমার বিশ্বরূপ যে ভক্ত দিবানিশি আহা দেখে,
তুমিই বিশ্ব, তোমারে লইয়া থাকে।

তোমার জীবকে কতভাবে তুমি রাখিয়াছ ভুলাইয়া,
ভক্তে ভুলাও শুধু আপনাকে দিয়া।
তুমি খেলা-ধূলা-অশন-বসন, তুমি তার দেহ প্রাণ,
সর্বস্ব যে তুমি তার, ভগবান।

ভয়ের কথা

'পাপের দ্বারাই ভগবানে পাওয়া সহজ অতি।'
বলিছে অনেকে, এলো মানুষের কি দুর্মতি ?
গয়াসুর হরি চরণ লভেছে জানে তা সবে,
হরিকে পেতে কি কেবল অসুর হলেই হবে ?
যীশুর করুণা রোগী লাজারাস্ যেহেতু পেলে
কুষ্ঠী হলেই মুক্তি কৃপা কি মেলেই মেলে ?
যুক্তি যে বড় বিষম লাগে
হতে মহর্ষি চোর হওয়া চাই সবার আগে !

যে হেতু সর্প শিবের অঙ্গ বেড়িয়া আছে
সর্প হলেই যাবে শিবলোকে.. শিবের কাছে ?
সাধনা চাহিনে ? হত্যা ডাকাতি করিলে খালি
শুধু কল্মষে কৈবল্য কি দিবেন কালী?
উদ্যান বোমা, অণুবোমা সে যে অনেক ভালো
তারা শাশ্বত সত্যকে নারে করিতে কালো।
দেখায় এসব তত্ত্বকথা
মানবমনের দুষ্ট-ক্ষতের বীভৎসতা।

কি ক্ষতি নরক জনপ্রিয় হয় আজিকে যদি
চিরদিন ছিল ভয়াবহ হয়ে যে নিরবধি ?
হোক খেয়ালীর প্রমোদ-ভবন রোধিবে কে তা ?
রুগ্ণ মনের স্বাস্থ্য-নিবাস উঠুক সেথা।
শ্রদ্ধেয় যে হউক—কিন্তু সঙ্গোপনে
বসতি সে যেন না পাতায় প্রতি মানবমনে।
রামনামে ভূত পালাতো শুনি
ভূত-নামে রাম পলাবেন, চান দেখিতে গুণী।

বিষলতাকেই বলা যায় যদি কল্পলতা,
অবদান তার অভয়ের নয়, ভয়ের কথা।
কি সংক্রামক মনের মড়ক বিষয় ধরা ?
বিড়ম্বনার কি ভয়াল বোমা হতেছে গড়া।
ভয়ঙ্কর এই ভাবের ভস্ম তেজস্ক্রিয়,
হয়তো হরিবে মানবমনের বিমলশ্রীও।
হেন অভিশাপ কে চায় পেতে ?
পাপই এবার পাসপোর্ট দেবে স্বর্গে যেতে।

শ্রীভগবানকে বিদ্রূপ করা নূতন নহে,
'মানুষ তাঁহাকে গড়েছে' একথা অনেকে কহে।
বলে 'ভগবান যদি নাহি দেন তাঁহার দেয়
ধন্যবাদ না দিয়ে—তাঁরে বাদ দেওয়াই শ্রেয়'।
রূপকথার তো 'এক থাকে রাজা' নহেন তিনি
মূঢ় চাপল্য কি লইয়া খেলে কি ছিনিমিনি ?
তিনিই আছেন, বলো না নাহি
সে বিশ্বরূপ দেখার কেবল ভাগ্য চাহি।

ডাকা

মোর যেন মনে পড়ে
যুগে যুগে আমি তোমারে ডেকেছি, স্ফুট অস্ফুট স্বরে।
গিরির শিখরে সাগরের তলে,
ডেকেছি তোমারে নিতি নানা ছলে,
হয়ে কত জীব কীট ও কীটানু গড়া তব নিজ করে।

কভু উল্লাসে, কখনো ব্যথায়, ভয় ও যাতনা মাঝ
ডেকেছি তোমারে, তোমারে ডেকেছি দয়াল রাজাধিরাজ।
কখনো আরাবে, কভু কাকলীতে,
কভূ ঝঙ্কারে, কভু ব্যাকুলিতে
কভু সঙ্গীতে মন্ত্রে মন্ত্রে জনম জনম ধরে।

জড়িত ও মধু নামের সঙ্গে আমার লক্ষ জপ
আমার যজ্ঞ আমার সাধনা আমার কৃচ্ছ্র তপ।

মোর আঁখি জলে ভেজা ওই নাম
আমার শান্তি, মোর প্রাণারাম,
রসনা বাসনা হৃদি রসায়ন ওই নাম মধু ক্ষরে।

ওই নাম মোরে উজান বহিয়া তোমার চরণে লয়,
নাম সুরধুনী—আমি যে তোমার দেয় এই পরিচয়
তব রূপ রস স্পর্শ ও নাম
মোর ধ্যান জ্ঞান তীর্থ ও নাম,
ওই নাম মোর সকল দৈন্য সকল শঙ্কা হরে।
ও নাম স্মরণে ও নাম করণে আমি হয়ে যাই পর,
আমার বাঁশীতে সুর দেয় আসি স্বয়ং বংশীধর।
আমি গলে যাই, আমি ডুবে যাই,
আমি নিভে যাই, আমি উবে যাই
ক্ষীণ জলকণা মিলাইয়া যাই অমৃতের সরোবরে।

ভক্ত বৎসল

ভগবান দেন ভক্তকে কত যন্ত্রণাই—
নিতি নব নব যুগে যুগে তার অন্ত নাই।
ভক্তের লাগি তিনিও পড়েন সঙ্কটে,
দেখি যবে—হয় পুলকিত মোর মন বটে।
বিস্ফারি আঁখি বিস্ময়ে করি বন্দনাই।

গাহে রাম নাম হনুমান বসি সৈকতে।
দিক্‌-বিজয়েতে অর্জুন যান সেই পথে।
কহেন ছদ্মবেশী সে পবননন্দনে
নাই কৃতিত্ব রামের সাগর বন্ধনে
জয় পরাজয় হল যা—হল সে দৈবাতে।

ওই তো লঙ্কা, মধ্যেতে এই সমুদ্র—
সাগর বাঁধিতে লাগে বা কয়টা মুহূর্ত ?
কাঁদিতে হত না বানরকে শিলা আনতে
কাঠবেড়ালিরা খবর পেতো না জানতে,
সাগর-শাসন ব্যাপারই যে অতি ক্ষুদ্র।

শুনি হনুমান ভাবে এটা বড় দর্পী তো—
শ্রীরামের প্রতি করে কটাক্ষ গর্বিত!
কয় অর্জুনে 'বট তুমি কোন ব্যক্তি হে?
শরের সেতুর বিহগ-বহার শক্তি যে,
ভাঙ্গিবে একটু গুরুভার হলে অর্পিত।'

কন অর্জুন, চিন্তায় কেন মুখটি ভার?
সে সেতুতে গোটা কিষ্কিন্ধ্যাই হইবে পার।
রোষে হনুমান বলে, গড় সেতু হে মহাবীর,
হবে না তো মোর দুর্বল ভারে সে অস্থির
সহজে তরাও দেখি তো সাগর দুর্নিবার।

শরে শরে রচি সুদীর্ঘ সেতু বীর কহে—
যাও দ্রুত পদে যাও লঙ্কায় নির্ভয়ে।
হনু ক্ষীণ তনু করি পরিণত পর্বতে।
ভীম ভারে ধরা টলমল চলে গর্বেতে।
পার্থ ভাবেন—কেমনে এ সেতু ভার সহে!
হনুমান ফেলে প্রথম চরণ চিন্তিত,
কই তো শরের এ সেতু কাঁপে না কিঞ্চিৎও!
নয় সামান্য—এ বীর অসীম শক্তিধর—
পোড়ামুখ মোর পোড়াতে দেখিনু অগ্রসর।
মর্মের ব্যথা, ঘর্মেতে তনু সিঞ্চিত।

দ্বিধা-চঞ্চল বিষণ্ণ মন দুই জনার,
মুখের স্ফূর্তি বুকের স্ফূর্তি নাইকো আর।
একই ভগবানে দুই নামে ডাকে দুইজনে,
কাতরে দর্পহারী ও বিপদভঞ্জনে,
চূর্ণ দম্ভ চূর্ণ সকল অহঙ্কার।

কচ্ছপ রূপ ধরিয়া কেশব সর্বময়,
পার্থ-রচিত শরের সেতুটি ধরিয়া রয়।
অতি দুর্বহ হনুমন্তের ভার বিশাল,
কচ্ছপের যে রক্তে সাগর হইল লাল,
বিশ্বম্ভরে কচিত এ ভার সইতে হয়।

দোঁহে নীল জল রক্তাভ হেরি শঙ্কিত,
ভক্তের হরি সব রঙ্গের রঙ্গী তো।
দোঁহে পরিচয় অনুতাপ ভরা বক্ষেতে—
নবীন দুর্বাদল শ্যাম রূপ চক্ষেতে,
সরমের কথা মরমে রহিল অঙ্কিত।

নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ

নীড়ভ্রষ্ট নীর-আশ্রয় নিরাশ্রয় আজ আমি,
গৃহে তো এমন অনুভূতি নিয়ে কথনো ডাকিনি স্বামী।
অন্তবিহীন নীলাকাশে নাই একটুও আশ্রয়।
তবুও চকোর যার উদ্দেশে উড়িয়া তৃপ্ত হয়।
আশ্রয়হীন গ্রহ তারা লভি যাঁহার আকর্ষণ—
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে ঘুরিছে অনুক্ষণ,
তাঁহারি যে টান, তাঁহারি পরশ, পেতেছি বুকের মাঝ,
ডাকার লভেছি যোগ্যতা যেন আজ।

২

প্রতিমার মতো গলে গেল আহা সজ্জিত গৃহসারি
চারিদিকে জল তাতেই মিশিল ক' ফোটা নয়নবারি
নূতন দীক্ষা দিল মোরে আজ ভুবন মজ্জমান,
জীবন প্লাবন আমাকে নূতন জীবন করিল দান।
মূর্তিমতী যে গায়ত্রী সনে আজ হল পরিচয়,
আবার দেখিনু আদিম প্রাতের প্রথম সূর্যোদয়।
বাজিতেছে শুধু জলকলরব গভীর অহর্নিশ,
অভিভূত হয়ে কাতরে তোমারে ডাকিলাম জগদীশ।

নিরাশ্রয় যে হওয়াতেও আছে পরমানন্দ এত,
ভাবিতে পারিনি—নিবেদনে হয় গরল অমৃত মতো।
করে নীড়হারা বিহগ যেমন প্রতি তরুতেই বাস,
আমিও যেখানে থাকি তাই গৃহ—ফেলি দীর্ঘশ্বাস।

পর্ণ আবাসও পরম কাম্য, তুমি যদি কাছে থাকো,
মাটিকে কেবল ঊর্ধ্বে তুলিতে আর ভাল লাগে নাকো।
বন্যায় ভিজে গাছগুলি দেখি সতেজ হয়েছে ভারি—
তাদেরি মতন আমিও পেয়েছি তোমার করুণাবারি।

৪

আমার চেয়েও নিরাশ্রয়েরা আমারে ঘিরিয়া আছে—
তোমার কাহিনী উল্লাসে আমি কহি তাহাদের কাছে।
তুমি কত বড় তাদিকে জানাই শুনাই কৃপার কথা—
গ্রহ তারা হতে সবে তব টান—নাই নাই কৃপণতা।
চারিদিকে করে জল থই থই—অস্থির দেহমন,
হঠাৎ তাহাতে জাগিয়া উঠিল তোমার পদ্মাসন।
ভয়ের মাঝারে কখনো হইনি এতখানি নির্ভয়—
কোথা জগদীশ—রক্ষ আমারে—আমি যে নিরাশ্রয়।

বিস্ময়

তুমি ছিলে যবে শিব বর্ণীর বেশে,
দাঁড়ান শৈল স্থতার সুমুখে এসে।
তুমি বেপমান ছিলে বিস্মিত চুপ,
পার্থ যখন দেখেন বিশ্বরূপ—
শ্রীভগবানের তনুতে ভুবন মেশে।
ওগো বিস্ময়, হে অনির্বচনীয়,
মাঝে মাঝে তব শুভ দর্শন দিয়ো।
সাগরে তোমাকে দেখেছি চন্দ্রোদয়ে,
ঊষায় তুষার মণ্ডিত হিমালয়ে,
মানস সরের কমল কাননে প্রিয়।
যেথা জ্বলিতেছে 'অরোরা' আলোর শিখা,
মরুতে যেখানে ছলিতেছে মরীচিকা,
প্রপাত সলিলে প্রলয় নৃত্য করি,
যেখানে লক্ষ রামধনু দেয় গড়ি,
তোমারে বন্দে আনন্দে বিভীষিকা।

চুম্বক যেথা লৌহ কণিকা টানে
মৌমাছি রচে মৌচাক, মধু আনে,
ডিম্ব ভাঙিয়া বাহিরায় প্রজাপতি,
মুকুলের হয় ধীরে ফলে পরিণতি,
সেখানেও তুমি হাসি চাহ মোর পানে।
তোমারে দেখেছি দর্পী মৃত্তিকায়,
অধিবাসী যার ধরণী গ্রাসিতে চায়।
সেখানেও তুমি থমকি দাঁড়াও আসি,
কাপুরুষ দেয় বীরগণে যেথা ফাঁসি।
ন্যায় যেথা ডোবে হিংসার মোহনায়।
তোমাকে দেখেছি গান্ধী মহাত্মাতে
তোমাকে দেখেছি মোরা রবীন্দ্রনাথে,
চমকি দেখেছি নেতাজীর পলায়নে
পুনঃ কোহিমার পুণ্য রণাঙ্গনে,
স্বাধীন ভারতে অমৃত ভাণ্ড হাতে।
বাহিরিয়া এসো তুমি যেন বনটিয়া
কাঁচা স্বর্ণের টোপর মাথায় দিয়া।
পলকে মধুর কর যে জল স্থল,
রাঙাও পুলক আবীরে ভূমণ্ডল
দৈন্যকে লও ঋদ্ধিতে আবরিয়া।
ভঞ্জন কর মানবের অপরাধ—
দেবের মহিমা দেখিতে যে হয় সাধ—
যম ফিরে দেন আবার সত্যবানে
পতিব্রতার সকরুণ আহ্বানে,
গরলেতে পা'ক অমৃত প্রহ্লাদ।
অতি যান্ত্রিক প্রাণ হীন চারুকলা,
তুঙ্গ মিনার, সৌধ শতেক তলা।
লাগে নাকো ভাল, প্রসন্ন হও মিতা
শুনাও ধরাকে, শুনাও নূতন গীতা
নব মেঘদূত—নূতন শকুন্তলা।
হে সখা শ্যামের সমাগম উৎসবে,

মোর নাম মোর মনে পড়িবে না কবে ?
আনি সুধাসম সেদিন আকাঙ্খিত,
করি পুলকিত, মোহিত রোমাঞ্চিত
তুমি কি আমাকে আপন করিয়া লবে ?

কর্মারতি

জপের সময় ঠিক থাকে না—হরিনামও কচিৎ করি।
কিন্তু এখন সারা দিবস ভগবানের দেউল গড়ি।
ক্ষুদ্র দেউল, ক্ষুদ্র অতি, বলত সবে আসতে যেতে
বলে বলুক, করছি তো কাজ জগন্নাথের মন্দিরেতে
বাধা নাহি প্রেমের বলে ভগবানকে নামিয়ে আনি,
প্রাণ ভরিয়া চাই গড়িতে তাঁহার বসার আসনখনি।
ভাব যে আমার রূপ লভিছে, ইষ্টকে আর বালি চূর্ণে—
এ নয় আমার জড়ত্ব ভাই—হেসো না কেউ কথা শুনে।

২

ইট বহে দিই, জল এনে দিই, আনন্দেতে সরাই মাটি,
আমি হরির ঘরের লাগি শিল্পী সাথে নিজেই খাটি।
ওই কাজই মোর ভজন সাধন, তপস্যা আর উপাসনা,
কাজ করি, তাঁর কাজই করি, কথায় তাঁহার আর থাকি না
স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন করিনাকো এখন আমি—
দেখি পূণ্য চিন্তা চেয়ে পূণ্য কর্ম অধিক দামী।
ছায়াপথে ধাওয়া ছেড়ে আঁধার ঘরে জ্বালি আলো
গুঞ্জরণের চেয়ে ছোট মধুক্রমও গড়াই ভালো।

৩

মন্দিরময় করলে যারা সুবিশাল এই ভারতভূমি,
আকাংক্ষাকে কী রূপ দিলে! ভাবি এবং দিন প্রণমি
অমৃতের ও সত্রগুলি কে বসালে—বলিহারি,
মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে যেন ভজন গানের সারি।
যারা গড়ায়, যারা সাজায়, ভক্ত তারা কম নহে তো
সাধক তারা কর্মযোগী সম্ভ্রমে হয় মাথা নত।

অলস জীবন কাটলো আমার, বিস্ময়ে ও প্রশংসাতে—
কিছুই আমি করিনি তো, গড়িনি তো নিজের হাতে।

৪

সকল ভাঙা মন্দির হায়—ভাঙা দেউল সোমনাথেরি
অরুন্তুদ দেয় যাতনা—যখন তাহা যেথায় হেরি!
সব দেউলে সন্ধ্যা দেখাই, বেড়াই সারা ভারত ঘুরি,
শঙ্খ হয়ে আমিই বাজি, ধূপ হয়ে যে আমিই পুড়ি।
গড়েছিলাম ভাবের ভুবন অতীত সাথে মিশে ছিলাম—
অস্তমিত সে মহিমা ফিরাইতে আর কই পারিলাম?
ভাঙার লাগি কান্না ভালো চিন্তা এবং দুঃখ করা,—
তাহার চেয়ে অধিক ভালো একটি নূতন দেউল গড়া।

৫

ভাবের বহু মূল্য আছে—সত্য তাহা অপার্থিব
তবু আমি তাহার চেয়ে কাজকে অধিক মূল্য দিব।
ভাবই এখন কর্মেতে রূপ করছে দেখি পরিগ্রহ
আনন্দ যে অসীম এতে—সেঁবার লাগি কী আগ্রহ।
পূজার ফুলের বাগান রচি—অঙ্গনও বেশ বড়ই আছে—
কবিতা মোর পুষ্প হয়ে ফুটছে এখন গাছে গাছে।
আপনাকে আজ ঘসেই আমি মিলিয়ে দিই চন্দনেতে—
বজায় রাখি এই চাকুরী জীর্ণজরা এই দেহেতে।

৬

কর্ম যতই হোক না ছোট—নয় তা ছোট কর্ম নহে—
সম্ভাবনার পদ্মবীজে পদ্মনাভ লুকিয়ে রহে।
অনেক কিছু ভাবার চেয়ে অল্প কিছু করাই শ্রেয়—
সকল কাজই তাঁহারি কাজ, নয় কোন কাজ অশ্রদ্ধেয়।
ছোট আমি কাজও ছোট, কিন্তু তাতে নাইকো ক্ষতি,
তাঁহার কর্ম-যজ্ঞ-কুণ্ডে আমিও তো দিই আহুতি।
প্রভুকে কই—ভৃত্য তোমার দেখ কি আজ করছে নিতি,
যা করি, হোক তোমার প্রিয়, শ্রীচরণে এই মিনতি।

সাধু-সন্ত

সাধু দিকে কাজে লাগাইতে হবে, সাধু কি অসাধু এ মতিগতি,
দেশ জাতি নয়—এতে হতে পারে জগৎ এবং জীবের ক্ষতি।
কয়লা খনিতে জন্মেছে বলে হীরাকে পুড়িতে পোড়াতে হবে ?
সপ্ত রঙের রঙ্গমঞ্চে গেরুয়া কেন বা সরিয়া রবে ?
চন্দনে হবে ইন্ধন হতে বসতি করিছে সে জঙ্গলে—
পদ্মকে হতে হবে ফুলকপি রাঙাপদে থাকা আর কি চলে ?
অক্ষয় বট, বোধিদ্রুমের. তরু দেবতার মূল্য নাহি
ভাব রাজ্যে কি ছায়ালোক নয়—কাঠ-কুঠরায় মিশানো চাহি।
হোমের হবির নাহি প্রয়োজন, হবে নাকো হোম ভবিষ্যতে,
ঘৃত এইবার মলম হইয়া প্রলেপ লাগাক দেহের ক্ষতে।

২

যারা নিষ্কাম, অফলাকাঙ্খী যাহারা চাহে না মোক্ষফলও,
শুধু শ্রীহরির প্রীতিকামীদের বাজে কোন কাজে লাগাবে বলো ?
সর্বারম্ভ পরিত্যাগীরে কাজ দিতে করে শাস্ত্রে মানা—
এ হবে গোরুর গাড়ি চালাইতে গরুড় পক্ষী টানিয়া আনা।
দধীচি গড়িবে ইস্পাত নাকি ? কপিল তৈয়ারী করিবে বোমা ?
ভরতকে দিয়া ভার বহাইলে করিবেন নাকো হরি যে ক্ষমা।
ওরা অগস্ত্য জহ্নু শৃঙ্গী দুর্বাসা যার অশেষ খ্যাতি,
ওরা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অষ্টাবক্র ভৃগুর জাতি।
ও সব বামন ভিখারী হউক, সহসা চাহে যে ত্রিপাদ ভূমি,
গর্ব খর্ব করাই কর্ম, ওদিকে তুচ্ছ করো না তুমি।

৩

উহারা অকেজো ? কেজো তবে কারা ? জাতিকে উর্ধ্বে তুলে কে রাখে ?
জীবের জন্য অমৃতভাণ্ড সঞ্চিত করি কে সবে ডাকে ?
কাজ যাহা তাহা তারাই তো করে, যোগ রাখে ভগবানের সাথে,
তারাই তো শুধু এক করে দেখে জগৎ এবং জগন্নাথে।
করা যপ তপ হোম আরাধনা, পরমানন্দময়ীরে ডাকা,
এসব কর্ম, কর্ম কি নয় ? যা বিনা জীবনে জগৎ ফাঁকা।
দিবসে রাত্রে হরিনাম করে নামের লাগিয়া করে না কিছু,
তাদের প্রভাব বুঝিয়া বুঝিনে, হয়ে আছি সবে এতই নীচু।

অকর্মণ্য ধন্ত তাহারা পুণ্যের পরিবেশন করে
চুম্বক গিরি লৌহ কণিকা পতিতে উঠায়ে বক্ষে ধরে।

৪

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা চেয়ে তারা আলো দেয় অতন্দ্রিত।
করে অলক্ষ্যে পতনোত্থান জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত।
চিদাকাশে তারা রচে ছায়াপথ, যত অমৃত যাত্রী লাগি
ভুবন যখন ঘুমাইয়া থাকে, তারাই তখন রহে যে জাগি।
ভাব গড়িয়াছে, ভাব গড়িতেছে, বিপুল প্রেরণা শক্তি ভরা
অনাগত এক দিব্য ভুবন কর্ম তাদের তাহাই গড়া।
মানুষের মাঝে অক্ষয় যাহা সৃষ্টি করিছে তারা যে সবই
ধর্মরাজ্যে কর্মী তাহারা শিল্পী ভাবুক ভক্ত কবি।
তারা জীবন্ত তীর্থক্ষেত্রে প্রেমে বিরাজিছে সর্ব ঘটে।
যন্ত্র স্রষ্টা না হোক তাহারা, সত্য দ্রষ্টা স্রষ্টা বটে।

৫

অপার্থিবের তারা কারবারী অকথিত বাণী তারাই কহে,
পঞ্চতপার আদেশ পালিতে পঞ্চভূতেরা দাঁড়ায়ে রহে।
কী করিতে পারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বিশ্ব বিজয়ী শিল্পপতি
একটা অমন অকেজো মানুষ ফিরাইয়া দেয় যুগের গতি।
'অ্যাটম' বোমার চেয়ে বহুগুণে পদরেণু তার শক্তিশালী
সে কোটি প্রাণীকে প্রেতত্ব নয় দেবত্ব দিতে পারে যে খালি।
সাধুরাই শুধু এ ভুবন নয় পারে ত্রিভুবনে তৃপ্তি দিতে
ভূমি জলবায়ু অন্তরীক্ষ পুণ্য করিছে অলক্ষিতে।
তাদের ভজন তাদের সাধন সব আচরণ সৃষ্টি ছাড়া
সব শৃঙ্খল ছিন্ন করেছে ডঙ্কামারা ও শঙ্কাহারা

৬

সাধুর মধ্যে অসাধুও আছে, আগাছাও আছে শালের কাছে,
কুসুমের সাথে কাঁটা রয়ে যায়, ভস্ম বৈশ্বানরের আঁচে।
মন না রাঙায়ে বসন রঙায়ে অনুরাগে যারা ভবন ছাড়ে
তাহারাও দেখি হরি করুণায় আলোকের ফাগ পেতে যে পারে।
ওরা কস্তুরী মৃগের বংশ বুঝিতে পারিনে কেন যে আসে,
সুবাসিত করে দেব মন্দির প্রসাদী সে মৃগনাভির বাসে।

সাধুর সজ্ঘে সকলেই দাদু, কবীর কি উপগুপ্ত নহে—
কিন্তু জানো কি ? কত বামাক্ষেপা তাদের মধ্যে লুকায়ে রহে।
যাঁহার কাষ্ঠ পাদুকা বহাও রাজপদ চেয়ে শ্লাঘ্যতর
কি বিরাটত্ব লুকাইয়া থাকে, বোঝ না, বোঝার চেষ্টা কর।

ভক্তের ভয়

প্রভাতের কমলের মাঝে হেরি ক্ষুদ্র কীটাণুর দল,
শিশুর কোমল মনে রাজে যেন ছোট দুশ্চিন্তা সকল।
উদাসীন সাধকের চোখে যেন ক্ষীণ সংসারের মায়া
আরতির দীপের আলোকে শ্যামা পোকা ফেলে যেন ছায়া।
এ যেন সাত্বিক মহাদানে অসতর্ক গরবের ছিটা,
অনবদ্য ভজনের গানে ভুল শব্দ—লাগে বটে মিঠা।
এ যেন রে নৈবেদ্যের থালে, কামনার ক্ষুদ্র পিপীলিকা,
কমলার কমনীয় ভালে উল্‌কীর হিজিবিজি টিকা।
এ'যে শুদ্ধ শুভ্র শতদল—রত্নাকর ঋষি মহাকবি,—
ভাসে চিত্তে যেন রে চঞ্চল, দুষ্ট সঙ্গী দস্যুদের ছবি।
যতই পবিত্র হও তুমি—তবু ভক্ত ভুলোনাকো তাঁকে,
ভকতির গৌরবের সনে পতনের বীজ সুপ্ত থাকে।

গ্রামের টান

গ্রাম ছেড়ে কি থাকতে পারি ? আমি যে গ্রাম ভুলতে নারি ?
আমার মুখে স্তন্য দিল—এ গ্রাম তাহার বুক নিঙাড়ি।
থাকবো গ্রামের সবার মাঝে
লাগবো গ্রামের সবার কাজে।
উঠবো রাঙা রবির সনে রঙীন করে অজয়-বারি।

আসবো ফুলে, আসবো ফলে, আমের নূতন মঞ্জরীতে।
ভ্রমর হয়ে আসবো আমি গ্রামের গীতি গুঞ্জরীতে।
কোকিল হয়ে কুহুস্বরে
ঝঙ্কারিয়া সোহাগ ভরে,
আমার ডাকে উঠবে জেগে, পরাণ সবার নিব কাড়ি।

শুনবো আমি মেলার ঢেঁড়ি—শুনবো ভোরে কানটি পেতে,
'বাজার ঘাটে' খেয়ার শেষে ডাকটি মাঝির শুনবো রেতে।
শুনবো শীতে পেচক ডাকা
নইলে যে রাত লাগবে ফাঁকা।
দেখবো প্রাতে আসবে ডেকে আকাশ-পথে কাকের সারি।

স্নানার্থীদের ভিড় দেখিব গ্রামের মেলা বসবে যবে।
'ভোগ আরতির' গান শুনিব 'লোচন পাটের' মহোৎসবে।
পূজার মহা অষ্টমীতে
প্রথম প্রণাম আসবো দিতে,
লব প্রসাদ বিল্বপত্র দেউল-দ্বারে হাঁটু গাড়ি।

আমি গ্রামের চির দিনের সুখে দুখে থাকবো সাথে।
মায়েয় কাছে বর লভিব—রইবে সবাই 'দুধে ভাতে'।
আসুক আপদ বিপদ যত
হবে না শির করতে নত,
বলবো জোরে—'ভয় করো না—মোদের মা রাজ-রাজেশ্বরী।

গ্রামের মেলা

ছোট্ট গ্রাম, ছোট্ট নদীর তীর,
সেথায় বসে মেলা, লক্ষ লোকের ভিড়।
কিসের লাগি মেলা ? কার লাগি উৎসব ?
কোন সে মহাত্মার প্রাপ্য এ গৌরব ?
বৃদ্ধ জনেক কয়, শুনুন মহাশয়,
সামান্য এক লোক, রাজা উজীর নয়।
লোকটি ছিল ভাল, লোকটি ছিল খাঁটি,
একাই ছিলেন তিনি উজল করে গাঁটি।
শিক্ষা দিলেন সবে—হিংসা করা পাপ,
বধবে যারা প্রাণী আনবে অভিপাপ।
গ্রামে যে সব পাখি—আছে এবং আসে,
কুলায় যারা বাঁধে, বাড়ির চারি পাশে,

রক্ষা সবাই কর, রক্ষা করা চাই
তীর্থ করার অধিক পুণ্য তাতে ভাই।
গ্রামের সকল লোক, তখন থেকে আর
মারতো নাকো পাখি, ভাবতো আপনার।
গ্রামের প্রতি ঘরে গ্রামের প্রতি গাছে,
আনন্দেতে সবাই কুলায় বেঁধে আছে।
দুষ্ট বালকেরা মারবে নাকো ঢিল—
জানে পাখির দল ভয় করে না তিল।
হেথায় তারা আছে, যেন মায়ের কোলে,
ওই যে তেঁতুল গাছে হাজার বাদুড় দোলে।
ঢাকলে দীঘির জল বুনো হাঁসের ঝাঁক,
পাড়ায় পাড়ায় শুনুন শত পাখির ডাক।
অযুত কাকের ডেরা, গ্রামের বেণুবনে,
নোয়ায় বাঁশের ডগা পুকুর জলের সনে।
বকুলগাছে দেখুন উপনিবেশ বকের—
বটে হরিয়ালের, শিবির দেখুন সখের।
তালের প্রতি মাথায় বাবুই বোনে বাসা,
থাকে কুলের গাছে টুনটুনিরা খাসা।
দাঁড়ান বাবু খানিক—দেখতে পাবেন গ্রামে,
জোড়মাণিকের দল জোড়ায় জোড়ায় নামে।
সুখে গ্রামেই থাকি, হয় না কোথাও যেতে,
বছর বছর ফসল প্রচুর ফলে ক্ষেতে।
এই যে গ্রামের শোভা শান্তি প্রীতি মধু
আমরা জানি দেওয়া একটি লোকের শুধু।
ছিলেন নাকো ধনী, ছিলেন নাকো বীর,
পরাক্রমে তাঁর হয়নি কেউ অস্থির।
নন্ তো মুনি ঋষি, কিন্তু তিনি সব—
মমতাময় প্রাণ ক্ষুদ্র এক মানব।
উপেক্ষাতে লোকে লক্ষ্য করে নাই
পূজছে আজি স্মৃতি লক্ষ লোকে তাই।

কাঁটাবন

তীক্ষ্ণ মোরা, বিঘ্ন মোড়া কণ্টকের এই পল্লীতে—
আলাপ করে কাঁটার ফুল আর নির্ভয়ে বন্‌মল্লীতে।
ময়না থাকে তরুর শিরে,
আমরা থাকি তাকেই ঘিরে,
কলসী কাঁখে সাঁওতালীরা ক্বচিৎ আসে জল নিতে।

জলে পানিফলের কাঁটা ডাঙ্গায় মোদের ছাউনিটা
কণ্টকিত করতে পারি আমরা চাঁদের চাউনিটা।
আরাম ক'রে কেউটে থাকে
কেউ করে না ত্যক্ত তাকে,
শশক-শিশু—ধরবে তাকে ? এত সহজ পাওনি তা।

রসিক পথিক হেসেই বলে—থাক বাঁধিয়া থাক্ গ্রহ,
শজারুর এই উপনিবেশ ঢুকতে নাহি আগ্রহ।
এখানেতে কাঁটার ভিড়ে
যায় ভ্রমরের পাখ্‌না ছিঁড়ে,
বনবরাহ দূরেই থাকে—ঘেঁষে নাকো ব্যাঘ্রও।

পাখিও গায়, ফুলও ফোটে, জীবন মোদের মন্দ না।
ভীমরুল এবং ফড়িং থাকে টুনটুনি ও চন্দনা।
তীরন্দাজের এই যে মাটি,
ভয় করে লোক ফেলতে পাটি,
মোদের কেবল শরই আছে করতে গুরুর বন্দনা।

প্রাবৃট

মেঘে মেঘে তব দুন্দুভি বাজে, ঝঞ্ঝায় জয়রব,
নদ নদী পেলে উচ্ছল স্রোত পূর্ণতা—গৌরব।
এলো বিদ্যুতে বৃষ্টিতে নবঘনে,
নিত্যোৎসব নেত্রে শ্রবণে মনে,
ছুটে দিগন্তে বন কুসুমের দুরন্ত সৌরভ।

শীর্ণা শোচ্যা দীনা ধরণীর একি পরিবর্তন—
কে এঁকেছে হেন আলোছায়া দিয়ে রজত আলিম্পন ?
সব চঞ্চল উৎসুক উদ্দাম,
শোভন ভুবন নিবিড় সরস শ্যাম,
যত ঝঙ্কার, তব গুঞ্জন গর্জন নর্তন।

যুগে যুগে যারা নাচিল লইয়া হেমকুম্ভের ভার,
'জল সইবারে' ঝঙ্কৃত হ'ল যাদের অলঙ্কার।
ঝুলনে যাহারা যুগে যুগে খেলে দোল,
হ'ল হিন্দোলে বনভূমি উতরোল ;
এক সাথে আজ সমাগত যত তারুণ্য দুর্বার।

অতীতে যাহারা নেচে গেয়ে গেল মহাকাল-অঙ্গনে
কেহ বেণু বীণা কেহ মৃদঙ্গ পটহ ডমরু সনে।
নাচিল প্রভাসে গুজরাটে গঞ্জামে,
বঙ্কুবিহারী-প্রাঙ্গণে ব্রজধামে,
তারা যেন আজ করিছে নৃত্য স্থলে জলে সমীরণে।

মদির মধুর একি সজ্ঘাত চলিয়াছে অবিরত ?
ভূতল গগন এক সাথে যেন মধু ভুঞ্জনে রত।
জীবন মরণ হইতেছে বিনিময়
আঘাতের কথা স্মরণযোগ্য নয়,
নব জীবনের সংবাদ দেয় রসোল্লাসের ক্ষত।

একি আগ্রহ, একি উচ্ছ্বাস একি গো উন্মাদনা !
লাভ ক্ষতি কেহ খতায় না আজ, সংখ্যা যায় না গোনা।
উলট পালট মন্থন আলোড়ন
অমৃতময় করিতেছে এ ভুবন,
এত তপস্যা ভয়াল সাধনা—এও এক উপাসনা।

আমাদের সঙ্গী

গুটি ছয় পায়রা ও গুটি কত হাঁস রে,
আমাদের ঘরে করে এক সাথে বাস রে।

আসে কাক এক ঝাঁক—করে খুব হাঁক ডাক,
কোকিলের কনসার্ট শুনবি তো যাস রে।
চলে দোয়েলের শিস্, শালিকের গীত্‌ও,
খঞ্জন মাঝে মাঝে করে যায় নৃত্য।
মাছরাঙ্গা আসে যায়,—লয়ে কাঠঠোকরায়,
শংখ চিলেরা ডাকে হরষিত চিত্ত।
দল বেঁধে টুনটুনি আসে হেথা চরতে,
বাবুইরা তালগাছে লাগে বাসা গড়তে।
বেনেবুড়ী মারে ডুব—পুণ্যটা করে খুব,
ফিঙে আসে বেছে বেছে শুঁয়োপোকা ধরতে।
সুদূরের বটগাছে সারা রাত ব্যাপিয়া
একটানা গান গায় গোটা দুই পাপিয়া,
পেচকের চিৎকারে—কর্কশ শীৎকারে
নির্জন বনানীর উঠে বুক কাঁপিয়া।
ঝাঁক বেঁধে, বনটিয়া কভু আসে মুনিয়া,
বলাকার সারি শেষ হয়নাকো গুনিয়া,
উড়ে বাজপক্ষী—কত যেন লক্ষী
চঞ্চুর জোরে ভাবে জিনবে সে দুনিয়া।
মাধবীর শাখে বাঁধে মৌমাছি চাক রে
করে মধুগুঞ্জন গুন্‌গুন্ ডাক রে।
কভু আসে চন্দনা,—গেয়ে যায় বন্দনা,
টাকসোনা ডাক শুনে লেগে যায় তাক্ রে।
অজয়ের ভাঙনেতে করে বাড়ী ভঙ্গ
তবু নিতি নিতি হেরি নব নব রঙ্গ।
চায় না এ কুঞ্জে—ছেড়ে যেতে মন যে,
এক সাথে কোথা পাব এত সাধুসঙ্গ।
এত পাখি আসে যায় সহি এত ঝক্কি,
যদি পথ ভুলে আসে সে গরুড় পক্ষী
সে পাখার হাওয়া রে—যায় যদি পাওয়া রে
আমি থাকি অমৃতের আশা পথ লক্ষি।

অজয়ের প্রতি

কান্ত কোমল গীত গোবিন্দ দেশের আমরা লোক,
তোমার কণ্ঠে সাজে কি অজয় 'মোহমুদ্গর' শ্লোক ?
সহসা হইলে প্রলয় পয়োধি ঋণ করা ভিন্ জলে,
দুকুল ভাসায়ে ছুটিতে লাগিলে ভীম কল-কল্লোলে।
তোমার এ বারি নয় তো অজয়—এ বারি গরল ভরা,
তোমার স্নেহের কণা নাই এতে, এ শুধু বিষের ছড়া।

২

ভালবাসি আমি মাটির কুটির তোমার শ্যামল তীর—
প্রতিমার মত সজ্জিত গৃহ, তরু ও লতার ভিড়।
মথুরেশে মোরা মানি না, আমরা রাখাল-রাজারে ডাকি।
'ধীর সমীরের কুঞ্জের' লাগি উৎসুক হয়ে থাকি।
মালতী মাধবী ঘেরা কুটিরেতে নিবিড় আকর্ষণ—
পাকা ঘরে বাস চাহে না অজয় সুদামা এ ব্রাহ্মণ।

৩

কত বার বাড়ী ভাঙিলে তুমি হে—গড়ি বা আমি কত ?
বিপদ যে তোমার দুর্দমনীয়—বড়ই অসঙ্গত।
কাটালাম দিন শ্রীবৎস রাজ চিন্তাদেবীর সাথে—
আনন্দ আর অভাব আমার বন্ধু দিবস রাতে।
মাটিতে যে পাই স্নেহের পরশ—পদ্ম হস্ত মার
এইবার বুঝি মানিতে হইল তোমার নিকটে হার।

৪

শ্রীমন্ত গেল যেখান হইতে সাত ডিঙা সাজাইয়া
আমি যে সেখানে রচেছিনু বাস মাটি খড় কাঠ দিয়া।
গলে গেল আহা সুন্দর বাড়ী লাগালো বড়ই ত্রাস
এবার দেখছি পাকা ঘরে তুমি করাবে আমারে বাস !
এ মাটির সাথে সংযোগ মোর অল্প দিনের নয়,
বন্য হরিণ রাজ-পিঞ্জরে থাকিতে করে যে ভয়।

৫

শ্রীমন্তের যে মধুকর ডিঙা লয়ে গেলে সিংহলে
রাজৈশ্বর্য দিলে তুমি তারে নানাবিধ কৌশলে।

দেখাইলে তারে 'কমলে কামিনী' সাগরে কমলবন,
সেরূপ দেখিতে হয় মোর মন সতত যে উচাটন।
উজানীর দীন সন্তান আমি—নই বটে সদাগর
সুদূরের সেই রূপের পিয়াসী, চাহিনাকো পাকাঘর।

৬

ইট ও কাঠের ঘরে যদি মোরে করাতেই চাহ বাস,
ভাঙন বন্ধ কর, আনো নীতি আনন্দ উচ্ছ্বাস।
সুখের এবং শান্তির নীড় কর তুমি প্রতি গৃহ—
শক্তি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম সঙ্গী আমার দিয়ো।
অটুট রাখিয়ো দেব ও দেবীর করুণার নির্ঝর
হোক অক্ষয় বটের বেদিকা তব দেওয়া পাকাঘর।

অপেক্ষমান

ফুল ফল শেষ—ভাঙনের অতি কাছে,
প্রাচীন তরুটি একাকী দাঁড়ায়ে আছে।
ভরা শ্রাবণের ঘন রাঙা জল,
কবে ভাসাইবে ভাবিছে কেবল,
শিকড়ের মাটি লভিতেছে শিহরণ।

২

যেন সে থাকার সময় অতীত করি,
পান্থশালায় আছে বহু দিন ধরি।
আসে যায় যারা উদাসীনতায়,
দেখে না, কেহ বা দেখে ভাবে হায়,
পথের কথা কি হয়েছে বিস্মরণ!

৩

গত উৎসব তিথির তালিকা লিখা—
ও যেন ধরার পুরাতন পঞ্জিকা।
দিবসের শেষে ইতুর ও ঘট,
পূজা শেষে ম্লান প্রতিমার পট,
বিসর্জনের শুনিতেছে গুঞ্জন।

সইমা

সইমা আমার—আমার মায়ের সই,
নামই শুনেছি দেখি নাই তাঁরে কই ?
শুনিবে এ চিঠি লিখেছেন কবে ?
দশ বছরের শিশু আমি যবে,
আজিকে পড়িয়া উন্মনা হয়ে রই ।
গিল্‌গিট্‌ থেকে লিখেছেন চিঠি মোরে—
অসুখ শুনিয়া অশেষ আশিস ক'রে ।
গেছে শৈশব, গেছে যৌবন—
গভীর স্নেহের উপঢৌকন,
ডাকনামে যেন ডাক দেয় আসি' জোরে ।
এতই মমতা চিঠি কি ধরিয়া রাখে ?
প্রসাদী পুষ্প পাঠায়ে দিলেন ডাকে ।
ভাল হবে বাছা নাই কোন ভয়,
হবে চিরজীবী হবে অক্ষয় ।
নিজ হাতে তুমি চিঠি দিও সইমা-কে ।
কোথা গিল্‌গিট্‌ তুষারনগরী খ্যাত,
কাঁহা সে যশোদা মায়ি মোর অজ্ঞাত ?
তাঁর স্তন্যের স্নেহের ধারায়—
মন আঁখি-জলে পথ যে হারায়,
এ সুধার স্বাদ দেবতাও জানেন নাতো ।
চিঠি ছোট চিঠি, ছত্র তিন কি চার,
আঁখর যা বলে ঢের বেশী মানে তার ।
বিচিত্র এই মাতৃহৃদয়
নারায়ণ তার লোভে নর হয়,
দেবদেবী করে জয়গান বসুধার ।

প্রতীক্ষা

দিদিমা মোদের যেতেন গঙ্গা নাইতে,
গোরুর গাড়ীর পথ চেয়ে থাকি মোরা,

সে চাওয়া মিষ্ট সব প্রতীক্ষা চাইতে,
প্রাপ্যের চেয়ে আনন্দ বুকজোড়া।

দূরে বহুদূরে যেত খর শিশু দৃষ্টি,
সকল গাড়ীকে মনে হ'ত সেই গাড়ী,
বলদের রঙ বদলাতো অনাসৃষ্টি,
টপ্পরগুলা ভ্রম লাগাইত ভারি।

ছুটিয়া যেতাম দূর থেকে গাড়ী দেখে,
গাড়ী নয় মহারাণীর সে ভাণ্ডার।
সকল জিনিস আসিত আদর মেখে,
বাঁশী টুমটুমি লাট্টু কত কি আর!

দিদিমার হাসি ঢলঢল স্নেহরসে
সে দৃষ্টি শুধু সোহাগ মমতা মাখা,—
প্রাণ ঢের শোনে কানে ক'টা কথা পশে,
মোরা মৌমাছি, দিদিমা আঙুর পাক।

সে পথ চাওয়ায় শুধু আনন্দ আশা
ছিলনাকো দ্বিধা শঙ্কা কি সঙ্কোচ,
কানায় কানায় পূর্ণ সে ভালবাসা
মেনকার গৃহে যেন অমৃতের ভোজ।

তারপর কত বছর চলিয়া গেছে—
জীবন কাটিল কেবলি প্রতীক্ষায়।
আনন্দের সে স্মৃতিটুকু মনে আছে—
আবীরের গুঁড়ি উৎসব আঙিনায়।

মানদা

মোর জননীর সঙ্গিনী ছিলে—ছিলে যেন পিসী মাসী,
তুমি আমাদের ধাত্রী পান্না, আমাদের 'শ্যামা' দাসী।
আপন ভাবিতে আমাদের ঘর
গৃহকাজে রত, নাহি অবসর,
সুদীর্ঘ তব জীবন গোঙালে আমাদিকে ভালবাসি।

তোমার যত্ন, তব শুশ্রূষা আজ বুকে করে ভিড়,
জননীর পরিচারিকা যে তুমি অর্দ্ধ শতাব্দীর।
যাতে দিতে হাত তাই পরিপাটী,
তক্‌তকে ঘর, ঝকঝকে বাটী,
সবই নির্ম্মল, স্নিগ্ধ কান্তি—মোদের গৃহশ্রীর।

উৎসবে সে কি আনন্দ তব। হাস্যে ভরিতে বাড়ী,
দুঃখে ও রোগে তব সান্ত্বনা কভু কি ভুলিতে পারি?
তব আঁখিজল, মিনতির স্বর—
সকল বিপদ ক'রে দিত দূর,
আজ সপ্ততি বর্ষের পর চিরতরে ছাড়াছাড়ি।

তোমার চিতায় গড়িতাম মঠ থাকিলে প্রচুর ধন,
দাসীর শ্রাদ্ধে দানসাগরের করিতাম আয়োজন।
তোমার স্নেহের হ'ত প্রতিদান,
যোগ্য তোমার দেওয়া হ'ত মান,
কৃতজ্ঞতায় শুধু করি আজ শ্রদ্ধাই নিবেদন।

জানিনাকো তুমি জন্মিয়াছিলে উচ্চকুলেতে কি না—
তোমার ভক্তি, তোমার নিষ্ঠা আভিজাত্যের চিনা।
তোমার সেবায় দেবতা তুষ্ট,
তোমার সেবায় হয়েছি পুষ্ট,
মোদের কুলুজী অসম্পূর্ণ তব উল্লেখ বিনা।

কৈশোর স্বপ্ন

ভাল আমি বেসেছিলাম, কৈশোরে এক সঙ্গিনীরে,
নেইকো সে তো, সোনার স্মৃতি ক্ষয়ে গেছে নেত্রনীরে।
কাল যমুনা নদীর ধারে
দেখতে পেলাম স্বপ্নে তারে,
দীর্ঘ আধা শতাব্দী পর, পারের ঘাটে, লোকের ভিড়ে।

প্রেয়সী মোর সঙ্গে ছিলেন—পারে যাব ভাবছি মনে,
সখী আসি তেমনি হাসি দাঁড়াল যে মোদের সনে।

সে বলিল, সঙ্গে যাব
ভাবিনি আর দেখতে পাব,
সেই লাবণ্যময় সে তবু, কিন্তু বারি নয়ন কোণে।

আমরা দোঁহে কইনু, এসো—'ভালই হ'ল সঙ্গী হ'লে—
কালিন্দী যে কূলে কূলে ভরছে তখন নূতন ঢলে।
মাঝি বলে, দুটি জনার
অধিক নিতে পারব না ভার।
দারুণ তুফান দেখুন না এই নৌকা দোলে নৌকা টলে।'

কইনু আমি প্রিয়ায় ডেকে, 'প্রথম খেয়ায় তোমরা চড়ো,
আমি যাব ফের খেয়াতে পারাপার তো নয়কো বড়।'
প্রিয়া বলেন, খেপ্‌লে নাকি?
এ পারেতে আমিই থাকি,
তোমরা ওঠো দু'জনাতে বিলম্ব আর বৃথাই কর।

সঙ্গিনী কন, 'তাই কভু হয়?—ও জোড় কভু যায় কি ভাঙ্গা?
আমি হেথায় বেশ থাকিব—যায়নি ডুবে কই তো ডাঙ্গা?'
প্রিয়া তাতে হয় না রাজি,
ডাকাডাকি করছে মাঝি,
ওদিকে ওই যমুনা জল অনুরাগে হচ্ছে রাঙা।

পাটনীকে জানিয়ে দিলাম—'কেউ যাবে না কাউকে ফেলে,
এদের প্রাণের ব্যাকুলতা নিজেই তুমি দেখতে পেলে।'
মাঠে তখন বাজছে বেণু
আসছে হাওয়ায় কদম রেণু—
তাকায় মাঝি মোদের পানে বিস্ময়েতে নয়ন মেলে।

শেষে ডেকে বললে মাঝি—'এক সাথেতেই উঠুন সবে;
বুঝেছি আমি যা ক'রে হোক—ঠাঁই করিয়া দিতেই হবে।'
একটি ছায়া একটি কায়া,
পৃথক করা যায় না আহা,
ওই লীলা যে যুগে যুগে চলছে এবং চলবে ভবে।

বললে এসে প্রেম-যমুনা—প্রেমের দরদ কতক বুঝি,
পুরানো তো হয় না প্রণয়—ফুরায় না তার বিরাট পুঁজি।
রূপ গলিয়া হয় যে এ ভাব,
ভালবাসায় ক্ষতিই যে লাভ,
অতনু যে জনম জনম তনুই শুধু ফিরছে খুঁজি।

কোথায় গেল মায়া নদী? কোথায় তরী, কোথায় মাঝি,
রামধনু ওই মিলিয়ে গেল, বৃথাই চাহি চক্ষু মাজি।
শুধুই জাগে হৃদয় কোণে
কী এক ব্যথা সংগোপনে,
ছেড়ে আসা সুদূর পথে মঞ্জীর কার উঠলো বাজি!

ভালুকওয়ালা

গ্রাম-প্রান্তরে বাগানে আমার ছিল একখানা ঘর,
'হাঘরেরা' সেথা আশ্রয় নিত কভু কোন বৎসর।
ঘন বাঁশবন, শিশু ও শিরীষ ছিল আম জাম সাথে,
চৌদিকে তার কেতকীর ঝাড় জমকালো বর্ষাতে।
বেহার হইতে একদিন এক ভালুকওয়ালা আসি
বলিল, ও ঘর ভাড়া দিন বাবু, নির্জন ভালবাসি।
মাসে পাঁচ টাকা ভাড়া ঠিক হল—খুশী সবাকার মন,
বুঝিতে নারিনু গোমস্তা মোর কেন যে মৌন রন!

২

ঘেরি বেড়ি ঘর, করি সুন্দর, দুইটা ভালুক লয়ে—
থাকে নিরিরিলি পশু সাথে মিলি অনুগত প্রজা হয়ে।
খেলা দেখাইতে দূরে দূরে যায় সন্ধ্যায় ফেরে গ্রামে,
ভারি জাদুকর, শিশু নারী নর মুগ্ধ তাহার নামে।
তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে ভিখারীকে দেয় ভিখ,
চেড়া নামাইতে শুনি নাকি তার শক্তি অলৌকিক।
ভালুক এবং ভেল্‌কি লয়েই করে নাকো কারবার,
খবর সে রাখে দেশের, দশের, গান্ধী মহাত্মার।

৩

গোমস্তা মোর করি জোড় কর একদিন আসি কহে,
ওই বাজিকর বেহারেতে ঘর, লোকটা সহজ নহে।
সে নয় সুজন, শত্রু দু'জন মন্ত্রের চোটে তার—
ভালুক হইয়া রয়েছে হুজুর—নয় তারা জানোয়ার!
আমি বলিলাম, সব বুঝিলাম, তুমি সাবধানে থেকো,
তোমারে আবার চটে মটে যেন গাধা না বানায় দেখো!
গোমস্তা হাসে, কয় মৃদু ভাষে, বসানো হয়নি ভালো—
ভালুকের সাথে কথা কয় রাতে নীল হয় লাল আলো।

৪

মানুষে রেখেছে ভালুক করিয়া দুষ্ট ও বাজিকর—
ওই কথাটাই গ্রামের লোকেও কহে যে পরস্পর।
কাজেই ডাকানু, ভালুকেরি কথা কহিনু তাহার সাথ.
সে বলিল, বাবু জানাবার নয়, বড়ই পুষিদা বাত।
মানুষের বুকে আছে জানোয়ার, পশুতে রয়েছে নর;
যে সব ঘটনা ঘটে দেখিতেছি অতি বিস্ময়কর।
পশুকে মানুষ করাই বাবুজী গুণীদের হল রীতি,
সে যোগ্যতার যাচি অধিকার এখনো হইনি কৃতী!

৫

কথার ভেল্‌কি শুনিয়া তাহার সন্দেহ গেল বেড়ে,
কত রজনীতে ভাবি ওই কথা সকল চিন্তা ছেড়ে।
মানুষের মাঝে বাঘ সাপ আছে, শুনেছি অনেকে কয়,
হয় তো সে গূঢ় সত্যের সাথে আছে এর পরিচয়।
অদ্ভুত এই বিশ্বেতে নাহি কিছুই অসম্ভব—
স্রষ্টা ইহার সবচেয়ে গুণী, জাদু যে তাঁহারি সব!
প্রশস্ত ভাল আনমনা সদা, হেরি সেই লোকটাকে,
মনে হয় বুঝি গোপন সত্য-বারতা সে কিছু রাখে।

৬

মাস তিন পরে পুনঃ বাজিকর চিঠি একখানি আনি—
বলিল, হুজুর শুনান উহাতে লিখিত আছে কী বাণী?

আমি বলিলাম, তুমিও দেখনা—তিনটা সিঁদুর কোঁটা,
উপরে একটা শুভ্র বিন্দু—বিন্দুটা বেশ মোটা।
চৌরীচৌরা হতে আসিয়াছে লেখা কিছু নাই আর,
শুনি সে সকল রহে নিশ্চল বচন স্ফুরে না তার।
আমি ভেবে মরি হেন কর্কশ পুরুষ কঠোর লোক
কী হেতু হইল এমন কোমল অশ্রুসিক্ত চোখ!

৭

ধীরে সে বলিল, 'চৌরীচৌরা' হত্যাকাণ্ডে ঘোর—
পুলিশ বাবুজী জড়িত করিল প্রিয় সহোদরে মোর।
ধর পাকড়ের হিড়িক বহিল, হুলিয়া এড়ানো দায়—
প্রাণাধিক মোর সহদোরে লয়ে পড়িনু সমস্যায়।
আমি নিরুপায় বাড়ী ঘর হায় ফেলি এই দীন বেশে,
ভালুক নাচায়ে ডমরু বাজায়ে ফিরিতেছি দেশে দেশে।
একটা ভালুক সত্য ভালুক—অপর ভালুক-সাজে,
ভাইকে আমার লুকায়ে রেখেছি ফিরি লয়ে কাছে কাছে!

৮

কেহ তার পাছে সন্ধান পায়—নির্জনে করি বাস,
দিবসে ভালুক, রাত্রে সোদর, বুকে পাই নিশ্বাস।
তিলেক ছাড়িয়া রহিতে পারিনে, যেন গো তাহারি ছায়া
কাটাতে পারিনে বাবুজী আমার এই সোদরের মায়া।
মাতাপিতা-হারা স্বচ্ছল গৃহী—গরিব আমরা নই—
ভিখারী সেজেছি তবুও তৃপ্তি এক সাথে দোঁহে রই।
চিঠিতে এসেছে বড় সুখবর তিনটা খুনের দায়
মুক্তি পেয়েছে সোদর আমার, পুলিশ তারে না চায়।

৯

রক্ত বিন্দু তিনটা তিনটা হত্যার অভিযোগ—
শুভ্র বিন্দু জানায় তাহার কাটিয়াছে দুর্ভোগ।
এই ভ্রাতা মোর নির্দোষ, তবু সহিয়াছে শত পাপ,
বাঙলায় আসি মোর ভালুকের কাটিল যতেক তাপ।
বন্দে বাবুজী, বন্দে বাঙালী, চরণে লুটাই শির—
বন্ধন ব্যথা সব ঘুচাইলে বিপন্ন বেহারীর।

বাংলা দিয়াছে মুক্তির স্বাদ, অধিক কব কি আর,
মাটিতে ইহার এঁকে রেখে যাই জাতির নমস্কার।

স্বত্বাধিকার

আজিকে আমারে ডাক দেয় কে রে? ডাক দেয় বারবার—
শঙ্খের রবে উদ্বেল হৃদি—বুক করে তোলপাড়।
যে অত্যাচার শেষ হয়ে গেছে আটশো বছর আগে,
সঞ্চিত সেই মর্মবেদনা শিরায় শিরায় জাগে।
বিদ্রোহী হয়ে উঠে সারা প্রাণ ঘৃণা লজ্জায় ক্ষোভে—
বক্ষের ধাতু বদলিয়ে দেবে দস্যু উপদ্রবে?
বুঝিতে পারিনে ইহার অধিক দস্যু কি আছে আর?
আভিজাত্যের ভিত্তি হইবে ঘৃণ্য বলাৎকার।
রচে দিয়ে গেল অত্যাচারী যে চিরধিক্কৃত কারা—
তারে পৈত্রিক প্রাসাদ ভাবিবে বন্দী আত্মহারা?
কাটিয়াছে বীর পূর্বপুরুষে যে অরাতি তরবারি,
কোন শৌর্যের প্রতীক হইবে বিঘ্ন লাঞ্ছনারি?
নিহত পিতৃ-অস্থিতে গড়ি অক্ষক্রিড়ার পাশা,
নাচে যে দম্ভী—নিন্দিতে তারে খুঁজিয়া পাই না ভাষা।
বংশ-সংজ্ঞা উপাধির লোপ সহিবে কেমনে কহ?
অবিনশ্বর আত্মার নাশ সমান দুর্বিসহ।
ব্রাহ্মণ আমি, বলে দেয় তাহা প্রাণ যে আমার কানে,
ইতিহাস দেয় সাক্ষ্য এবং কুলজী সে কথা জানে।
হিন্দু হিন্দু রূপান্তর কি? যাহা ছিল তাই রবে,
গরুড় কেমনে রবীন পক্ষী মোরগ তিতির হবে?
ডাকিছে আমারে গোত্রের পিতা দেবতা মুনি ও ঋষি।
কোন বংশের সন্তান আছি কাহার সঙ্গে মিশি?
ডাকেন আমার ভবন দেবতা কুলপুরোহিতগণ,
দেবতা সপ্তকোটী টানিছেন—পেতেছি আকর্ষণ।
প্রতি আলো, আজ আরতির আলো, প্রতি গন্ধই ধূপ।
প্রতি পাষাণেতে দেবতার চিনে ভুবন-ভরা সে রূপ।

প্রতাপ প্রভাব, বিভব বিলাস ভোলায় না মোর মন—
করিতেছি দাবী গায়ত্রী আর কোশাকুশী কুশাসন।
বর্ণাশ্রম ধর্ম ডাকিছে, ডাকিছে পুণ্যশ্লোক—
ডাকিছে মন্ত্র—সব অপরাধ-ভঞ্জন-করা শ্লোক।
ডাকিছে আমার তুলসীমঞ্চ মঠ মন্দির সব—
পূজা অর্চনা বাদ্যভাণ্ড নিতি নব উৎসব।
সুদূর অতীত ডাক দেয় মোরে নির্বাসনের শেষে—
ঘরে ফিরে যেতে নিজের ভিটায় আবার নিজের দেশে।
সাত সমুদ্র তের নদী ঢালে উদক আমার শিরে,
করি আরোগ্য মুক্তিস্নান গৃহে যাব আমি ফিরে।
ক্ষতি ও লাভের ধারিনাকো ধার, নাই দাবী আর কোন,
ফিরে পেতে চাই স্বত্বাধিকার—ঐতিহ্যই পুনঃ।
নাইকো হিংসা, নাহি বিদ্বেষ, সবাকার ক্ষমা মাগি—
হের বরেণ্য জীবন-সবিতা আমার উঠিছে জাগি।*

* যখন বক্তিয়ারের সৈন্যদল গৌড়ে যায় তখন পথিমধ্যে বহু হিন্দুর সর্বনাশ সাধিত হয়। তাঁহারা জাতি ও সমাজচ্যুত হন, কিন্তু হিন্দু ধর্মের দাবী ত্যাগ করেন না। শুনা যায় শুদ্ধি-অন্তে অনেকে হিন্দু হইয়া সমাজে সুপ্ত হইয়াছিলেন।

দুধ-বিদ্যুৎ

মেঘনায় ডোবে বহুদিন আগে 'লোহিত' ইষ্টিমার।
দুই তিন জন আরোহী মাত্র পেয়েছেন উদ্ধার।
বাড়ী আমাদের গ্রাম,—মৃত্যুঞ্জয় নাম—
কেমনে বাঁচিল, শুনেছি কাহিনী নিজ মুখে আমি তার।

অকুল পাথার কেমনে পড়িনু পড়ে নাকো ঠিক মনে,
ঝঞ্ঝা ছুটিছে প্রবল বেগেতে জলোচ্ছ্বাসের সনে।
হাঙর কুমীর সারি, লাফায় আপল মারি,
মৃত্যু লইয়া মত্ত মেঘনা তাণ্ডব নর্তনে।

তবু প্রাণপণ সাঁতার কাটিয়া চলেছি কূলের পানে
কত ব্যাকুলতা! সে অকূলে কূল মিলিবে কেহ কি জানে?

কত মড়া লাগে গায়—শরীর যে শিহরায়—
উপরে বৃষ্টি, দৃষ্টি ঝলসি জলদ চিকুর হানে।

ক্ষুধিত বৃহৎ হাঙর সমুখে আমি প্রায় জ্ঞানহারা।
প্রকাণ্ড এক কুমীর দেখিনু তাহাকে করিল তাড়া।
যেন আগুলিয়া মোরে, কুম্ভীর জোরে ঘোরে,
দমকে দামিনী হেরি ঘেরি মোরে শুভ্র দুধের ধারা।

সেই সে ভয়াল মেঘনার বুকে ঘন দুর্যোগ রাতে—
দেখেছি শুভ্র দুগ্ধ ঘূর্ণী চলেছে আমার সাথে।
হাঙর কুমীর রেগে—আসি ফিরে যায় বেগে
মনে হয় যেন দুধ-তড়িতের তীক্ষ্ণ তীব্রঘাতে।

সন্ধানকারী নৌকা আসিয়া কখন লইল তুলি।
কিছু মনে নাই, শুভ্র গণ্ডী কিন্তু যাইনি ভুলি।
বাঁচি, কতদিন পরে,—ফিরিলাম যবে ঘরে,
জননীর কাছে নিবেদিনু সব—লয়ে চরণের ধূলি।

শুনিয়া চমকি জননী বলেন, চক্ষে তাঁহার জল—
সৎকাজ বাবা যত ছোটো হোক হয়নাকো নিষ্ফল।
বালিকা বয়স যবে, গ্রামবাসী জানে সবে,
পিতার সঙ্গে খেয়াঘাটে আমি থাকিতাম অবিরল।

অজয়ের চরে বেড়াতে বেড়াতে দেখি একদিন গিয়া—
মুমূর্ষু এক কুমীর শাবক ধুক ধুক করে হিয়া।
তাড়ায়ে কুকুরগুলা—মুছাইয়া বালি ধূলা
বাঁচানু তাহাকে বাটি ভরে ভরে মুখে দুধ ঢেলে দিয়া।

উপহাস করি কহিল আমার সঙ্গিনীগণ সবে—
ঘড়িয়াল খল কুমীর শাবক বাঁচায়ে কী ফল হবে?
বড় হয়ে যেথা যাবে—মানুষ ধরিয়া খাবে,
দুধ দিয়ে এ তো কাল সাপ পোষা, শাস্তি যে তোলা রবে।

সেই সে দুধের গণ্ডীরে বাছা দুধের গণ্ডী ওরে,
জীবন দিয়েছে রক্ষা করেছে আমার বংশধরে।

সেই কুন্তীরই বুঝি—তোমাকে চিনেছি খুঁজি—
ক্ষীণ পুণ্যও অসম্ভবকে দেখি সম্ভব করে।

বৃহন্নলা

বৃহন্নলার হল একদিন শ্রীকৃষ্ণ সাথে দেখা
বিরাটের পুরে একা।
হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন, 'পার্থ ওকি বিচিত্র সাজ
পরিয়াছ—নাহি লাজ?
অঙ্গে অঙ্গে নৃত্যভঙ্গী রমণীর চপলতা,
কণ্ঠে মধুর কথা,
নিজেকে এমন ভাঙিয়া গড়িলে কেমন করিয়া প্রিয়?
দৃশ্য দর্শনীয়।
শালপ্রাংশু—হে বিশাল ভুজ—অজেয় ধনুর্ধর
লভেছ রূপান্তর!
অগ্নিগর্ভ সে শমী কেমনে তরুলতা হল ভাবি,
রবি হল মৃগনাভি!
কেশরী কেশরে কে এমন বেণী বিনায়াছে বলিহারি,
দেখিয়া চিনিতে নারি।
মুক্তা ও মণি এভাবেই রয় গহ্বরের আধারেতে
পরিপুর্ণতা পেতে।'
শ্রীকৃষ্ণ পানে করি কটাক্ষ কহেন সব্যসাচী—
নাচি গাই ভাল আছি।
যা করাও করি, যা সাজাও সাজি, হে নিপুণ নটরাজ
নাহি ঘৃণা নাহি লাজ!
অক্ষয় তুণ, সে গাণ্ডীবের কথাই পড়ে না মনে,
রত গীত-গুঞ্জনে।
রাগ-রাগিণীর ঠাট দেখি আমি সাধি নৃত্যের তাল,
আনন্দে কাটে কাল।
সায়কের চেয়ে নৃত্য ও গীতে ভাল হয় অর্চনা,
তব পদ-বন্দনা।

অস্ত্রবিদ্যা শেখানো তো করা ধরারে উদ্বেজিত,
গীতে চরাচর প্রীত।
হেথা পৌরুষ পারুষ্য ত্যজি আস্বাদ পায় তার,
কি সুখ জিতাত্মার।
যে খেলা খেলাও তাহাতেই সখা করো মোরে যেন জয়ী,
অন্যাকাঙ্ক্ষী নহি।
যা দাও আমারে পরাজয় শুধু দিও না যোগেশ্বর—
মাগি এই এক বর।
সর্বকর্মে শ্রীবিজয়ভূতি ধ্রুবা নীতি আমি যাচি—
খেদ নাই মরি বাঁচি।
ভুলেছি রাজ্য অজ্ঞাতবাস, দিবানিশি মনে হয়
আমি সঙ্গীতময়।
সুদর্শনের কথা আজ নহে—সখা প্রসন্ন হও।
বংশীর কথা কও।'

ভগীরথের তপস্যা

অস্থি, রক্ত, মজ্জায় মোর এই আকাঙ্খা বহে,
মোর তপস্যা কেবল আমার জাতির জন্য নহে।
শুধু স্বকুলের মুক্তি চাহি না—চাহি না মা উদ্ধার,
সকল যুগের সকল প্রাণীর খোল মা স্বর্গদ্বার।
আজিকার নহে, কালিকার নহে—নহে ক্ষণিকের দান,
অনন্তকাল যেন তব কৃপা হয়ে থাকে অম্লান।
বিতর শক্তি বিতর মুক্তি শ্রীহরিপাদোদ্ভবা,
এসো মা সুদুর্লভা!
স্বল্প শীর্ণ সংকীর্ণ যা, নহে বর্ধনশীল,—
নাহি অভিরুচি, তাহাতে তৃপ্তি নাহি মোর একতিল।
কর নির্মল, অপাপবিদ্ধ, কর মা মহত্তর,
মানব জাতিকে কর বলিষ্ঠ রূপান্তরিত কর।
তোমার পুণ্য পরশে জননি! জগতের নারী-নরে,
কর প্রোজ্জ্বল, সর্বংসহ, তোল উচ্চস্তরে।
দাও তাহাদিকে নব দেহ প্রাণ সর্বারিষ্ট জয়ী—
গঙ্গে পুণ্যময়ি!

বিষ্ণু তেজের আবরণ দাও তুমি সবাকার গায়,
রোষবহ্নিতে যেন নাহি পোড়ে আর পতঙ্গপ্রায়।
সৃজি কালাগ্নি জীবগণে করে মৃত ও উদ্বেজিত—
যে জ্ঞাননেত্র—হোক তা অন্ধ, হোক তা নির্বাপিত।
কর অগ্নির অগ্নিমান্দ্য—জীবকে অগ্নিসহ,
হিংসাগ্নি না হইয়া অগ্নি হয়ে র'ক হুতবহ।
জ্যোতির্বর্ত্মে ফিরাইয়া দাও তুমি দানবের মতি
রোধ কর অধোগতি।
আমার কামনা, আমার সাধনা করো না মা নিষ্ফল,
সব যুগ সব জাতি যেন লভে আমার তপের ফল।
মোদের দুঃখ সবার দুঃখ করে যেন নিবারণ,
আমাদের ক্ষতি, গোটা বসুধার হয়ে রয় মূলধন।
সকল ভস্ম বিভূতি হউক, বিশুদ্ধ হোক লোক—
স্বর্গে মর্ত্যে করে দাও তুমি অমৃতের সংযোগ।
আরম্ভ হোক নূতন কল্প নূতন শতক্রতু—
নারায়ণ প্রসীদতু !

ব্যথার দাগ

রোপন করেছে পোষণ করেছে করেছে যে বর্ধিত,
হে তরু তোমার কোথায় তাহার চিহ্নও দেখিনা তো !
আঘাত করেছে যে তোমারে, বাপু শাণিত ছুরিকা দিয়া—
দাগগুলি তার বেশ তো রেখেছ আজও দেখি জিয়াইয়া !

কথার ব্যথা

মা-মরা মেয়েটি আসিত মোদের বাড়ী,
সাত বছরের—তবু চটপটে ভারি।
মাথাটি করিয়া নীচু, খাবার চাহিত কিছু,
পেলেই তখনি দাঁড়াত না আর—চলে যেত তাড়াতাড়ি।
প্রতি প্রাতে আসি রুধিয়া দাঁড়াত দ্বার,
নড়ে না, সরে না সাধিলেও বারবার।
বলিলাম, ওরে হাবি ! কেন তোর এত দাবী ?
নিত্য আসিস, কাল থেকে যেন দেখিনাকো হেথা আর।

মলিন মুখে সে বলিল আমারে দেখে—
আজ যেতে দাও—আসিব না কাল থেকে।
ছুটি তার ছোট কথা জাগাল কি ব্যাকুলতা,
দিন রাত ধরে তোলপাড় করে মন যেন তার লেগে।
পরদিন খুকী আসে নাই আর প্রাতে,
পাখিগুলা যেন সরে গেছে তার সাথে।
সমীরণ থেকে থেকে, বলিছে আমারে ডেকে,
ভিক্ষা তো নয়—পূজা নিতে আসে, রাগ কেন কর তাতে?
ওই কথা বলি নদী ছুটে চলে যায়,
পদ্মের সুখ ভরা যে ওই কথায়।
ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল কি জগৎ ছেয়ে?
ভিখারিণী তবু—সকল জিনিস বাঁধা তার মমতায়।
স্বস্তি পাইনে—ডাকিয়া আনিনু তারে,
তেমন হাসিয়া দাঁড়াল আসিয়া দ্বারে।
বলিলাম, এতদিন জমে গেছে বহু ঋণ
বুঝছিস হাবি, মোর চোখে জল—সে হাসি থামাতে নারে।
শাক্ত কিংবা ভক্ত আমি তো নহি,
তবুও নিজের মনের কথাই কহি।
কন্যা হোক সে যারই মূর্তি মা গিরিজারই
সকল মেয়েই উমা কি গৌরী, সবাই ব্রহ্মময়ী।

জরা

বিড়ম্বনা কি অভিশাপ নহে জরা,
জরাও বিপুল সম্ভাবনায় ভরা।
তাহার প্রধান ভোগই অতীন্দ্রিয়,
যৌবন চেয়ে নহে কম লোভনীয়।
নীরব বহির্জগতের শব্দ,
মুদিত কমলে ভ্রমর আবদ্ধ।
শক্তি তখনো ধরে —
স্মৃতির কোমল স্বর্গে সে পুনঃ নব মৌচাক গড়ে।

জরাই করায় সর্বারম্ভ ত্যাগী,
মানুষকে করে চকোরের সুখভাগী,
তখন কামনা কিছুই থাকে না আর,
কর্মে ও ফলে দুয়ে নাই অধিকার।
পাষাণ হইয়া এ থাকায় আছে সুখ—
রামচন্দ্রের পেতে পারে পদযুগ
দেবীকে রাখেনা দূরে—
এ শব-সাধনা নিজ অন্তঃপুরে
করে তনু হতে অর্ধমুক্ত মন
অনাস্বাদিত রসের আস্বাদন।
অন্ধকারেও আনন্দে রহে জাগি
নিশীথ-রাতের সূর্যোদয়ের লাগি।
এই জীবনের জরা অজ্ঞাতবাস
অভিষেকের সে এনে দেয় আশ্বাস।
শোচ্য নয় সে নয়—
বিশীর্ণ রেবা প্রত্যাসন্ন মুক্তির কথা কয়।
গুটি ফেটে আহা বাহিরিবে প্রজাপতি
তাহারি লাগিয়া চলিয়াছে প্রস্তুতি।
শিশু গরুড়ের পাখায় আসিছে বল,
সুধার তৃষ্ণা করে তারে চঞ্চল।
সদাগর তার কমায় পণ্যভার
তুফানের পথে পাড়ি তার নৌকার
ভাবে সে ক্ষণেক্ষণ—
ভরা গঙ্গার তরঙ্গে সব রূপের নিরঞ্জন।

ঢেঁকি

হে ঢেঁকি, তুমি কি ভানিবেই শুধু ধান ?
পাবেনাকো সুরশিল্পীর সম্মান ?
সুরও রয়েছে, রয়েছে নৃত্য, রমণীর পদাঘাত।
তোমার বুকেতে অশোক ফোটেই সে আঘাতে নির্ঘাত।

শব্দ তোমার আঁকে মোর মনে সারি সারি শুধু ছবি—
তবুও নহ কি কবি !
নিশিশেষে তব শব্দতে রূপ লভি'—
জাগে কি কেবলি পৌষ-পার্বণ ছবি ?
আমি তাতে পাই 'আইসেন হাওয়ার' 'চার্চ-হিলের' রব,
চক্ষেতে ভাসে 'টিটো', 'মোশাদেক', 'ডালেস', 'ম্যালেনকফ',
স্মৃতিতে জাগায় 'পানমুনজন' ভিয়েৎমিনের 'লাও',
কেনিয়ার 'মাও' 'মাও'।
তোমার মতন কর্মী সহিছে ক্লেশ—
দুর্ভাগা জাতি অতি দুর্ভাগা দেশ,
নারদ মুনির বাহন তুমি যে সংসারিদের প্রিয়—
রাষ্ট্রে সমাজে মাঝে মাঝে তব পরিচয়টুকু দিয়ো।
আমড়া কাঠের ঢেঁকি নহ তুমি 'হেয়ো' ঢেঁকি তুমি নহ,
কেন এত ব্যথা সহ ?
ধান চিঁড়া কুটি দেখিতেছ এই ভূমি—
কুটনীতিবিদ্ হবেনাকো কেন তুমি ?
বুদ্ধির ঢেঁকি তোমাকে আবার উপরোধে গেলা যায়,
দেবর্ষির সে শাশ্বত পেশা তোমাতেই শোভা পায়।
'আশানন্দকে' শক্তি দিয়েছ তব জয়গান গাই—
সম্মান তব চাই।
মৌনের যুগ জানো এটা নহে হায়—
বিশ্ব এখন বাণী—শুধু বাণী চায়।
প্রতিষ্ঠা তুমি অচিরে লভিবে বুঝেছ ধরার রীত—
ধান ভানিতেই যা কিছু সুযোগ, গাহিতে শিবের গীত।
ঘরের ঢেঁকি যে তোমার রয়েছে অনেক সুবিধা আরও।
কুমীর হতেও পারো।
স্বর্গে গেলেও ভাঙিতে হইবে ধান,
যে বলে তোমাকে—উহাতে দিও না কান।
দীনজনগণ দরদী যে তুমি কর বটে দুখভোগ,
আছে নারদের বীণার সঙ্গে তোমার বুকের যোগ।
সমানধর্মা যাঁরা তব গানে এত ভাব খুঁজে পান,
তাঁরাও ভাগ্যবান।

ভারত চিত্র

হেরি ভাবাঢ্য ভারত চিত্র বর্ণের সমারোহ—মুগ্ধ হইয়া রহি,
জননী আমার সত্য জ্যোতির্ময়ী !
রূপ সাগরেতে শ্রদ্ধায় অবগাহী
এ দর্শনের অধিকারী হওয়া চাহি,
অভাজন কোথা পাবে সে পুণ্য আঁখি ? ভক্ত তো আমি নহি।

ইলোরা এবং অজন্তা হতে মাদুরা ও তাঞ্জোর—নদীয়া বৃন্দাবন—
রূপের রসের ভাবের প্রস্রবণ।
পুরুষোত্তমে 'বামনে' দেখিতে রথে,
পুনর্জন্ম ক্ষপয়িতে ধায় পথে—
তাঁরি রূপ লাগি আঁখি ঝুরে—আর গুণে ভোর হয় মন।

উঠিছে যাত্রী দ্বাদশ হাজার সোপান অতিক্রমি গিরনার পর্বতে—
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ অঙ্কিত পথে।
ওই যে ভূধর নগর অরণ্যানী—
তাঁর দৃষ্টির রূস লেগে আছে জানি,
এর চেয়ে আছে প্রিয় তাঁর এক ঠাঁই কালিন্দী-সৈকতে।

কোথা 'হিরণ্যা' 'কপিলা'র তীরে 'দেহোৎসর্গ' ঘাটে, যাত্রীরা নাহে গিয়া—
তীব্র বিরহ-বেদনা-ব্যথিত হিয়া।
শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে নয়নজলে
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে লুটালেন শিলাতলে,
ব্যাধ-শরাহত শ্রীকৃষ্ণের সে দুটি রাঙ্গাপদ ভিজাইয়া।

শত বাধা ঠেলি মরু পাড়ি দেয়, হিংলাজ যায় কেহ, কেহ ছোটে জ্বালামুখি,
তীর্থভ্রমণই তপস্যা—তাতে সুখী।
কেহ পূজা করে সর্বসিত সে শিবে—
কামনা-বিহীন—কী বর চাহিয়া নিবে ?
দেখে এ ভুবন ভুবনেশ্বরে এক—হৃদি পর্যুৎসুকী।

কেদারনাথের গৌরিকুণ্ডে শুনি দেবদেবীগণে—স্নানার্থী হয়ে নামে।
সব দেবময় ভাবের পুণ্যধামে।

গিরি শিরে শিরে শুভ্র তুষার রাশ,
ঘনিভূত যেন শিবের অট্টহাস,
রূপায়িত হয় মানসের শিবলোক—মানুষের আল্‌বামে।

গোমুখী হইতে গঙ্গাসাগর—সেথা হতে দ্বারাবতী, তাঁর বংশীই বাজে,
সব ছুটে যায় জুড়াতে তাঁহার কাছে।
ঠাকুরের মালা আসে ফকিরের গলে,
সুধা ভেসে ওঠে লবণ-সাগর জলে,
সব দুখক্লেশ—চিরদিবসের তরে আনন্দ হয়ে রাজে।

রাগের পথেতে কোথায় কেমনে, কেবা যে কী ধন পায়? ঠিকানা পাইনে খুঁজি
যাহা পায় তাহা অনুভব দূর বুঝি।
গীতগন্ধের প্রসাদী কণিকা উড়ে,
ফোটায় পুষ্প ভাঙা মালঞ্চ জুড়ে,
পাথর যে দেয় নামের ঝুলিতে—কারো পরশপাথর গুঁজি।

বসিয়াছে যেন সসাগরা এই বিশাল ভারতব্যাপী জপ-দরশন মেলা,
হিমগিরি শির হইতে সাগরবেলা।
টোডা ও মুণ্ডা লেপচা সুলিয়া নাগা—
সবাই মেলার অংশীদার যে দাগা,
দেখে দাঁড়াইয়া, কলরব করে যারা, কেহ নহে হেলাফেলা।

সাপ নাচাইছে, ফেরি করিতেছে—বাঁশী বাজাইছে কেহ—কেহ দেখাইছে বাজি।
বিভিন্ন বহু ফুলের একটি সাজি।
মস্তকে বহি শত সব্‌জির ভার,
কৃষক-বালিকা হইতেছে নদী পার,
কোচিনের নীলজলে—নারিকেল ছায়ে তরী ভিড়াইছে মাঝি।

লকড়ি আহরি চলেছে কিশোরী রাজপুতানার পথে—স্নিগ্ধ মুখশ্রী,
ঊষর মরুর ঘন লাবণ্য কি?
বদরীনাথেতে পাহাড়ী রূপসী দল,
শান্ত কান্ত শুচিতায় ঢল ঢল,
তন্ময় হয়ে দেবতায় নিবেদিছে—পূজার সামগ্রী।

বিরাট বিপুল বিচিত্র ভিন জাতির সমন্বয়—দৃশ্য অসাধারণ,
অচেনা তবুও জাতি যে চিরন্তন।
প্রেমিক ভক্ত ভাবুক শিল্পী কবি
তারাই রচিছে তীর্থ—গড়েছে ছবি,
সবাকার এক গৃহস্বামীর ঘরে—করেছে নিমন্ত্রণ।

গতিভর্তা প্রভুঃ

গোমুখী হইতে ক্ষীণ জলধারা ঝরিল প্রথম ভূমিতে যবে,
প্রতি কণিকায় একই আবেগ গঙ্গাসাগর যেতে যে হবে।
দোলনায় শুয়ে শিল্পী শিশু যে দেয়ালে দেখিছে বারম্বারই
জগন্নাথের দেউল গড়ার গৌরব পেতে সে অধিকারী।
কুসুমকোরক কী বাণী শুনিল বক্ষ তাহার উল্লসিত,
করিতে হইবে তারে শ্রীহরির রাঙা শ্রীচরণ অলংকৃত।
সিংহশিশুর উষ্ণ শোণিতে কী পিয়াসা জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
দুর্বার বেগে ঘুরিতে হইবে তারে গজমতি অন্বেষণে।
কেহ দৌড়ায়, উর্ধ্বে উধাও, কেহ গর্জায় লাফায় নাচে,
কর্মধারা যে কোথায় চলিবে ঠিকানা তাহার করাই আছে।
এত পরাধীন তবুও স্বাধীন—বিপুল বিশ্ব যন্ত্র চলে
নিয়ন্ত্রিত যে সকলি করিছে তাঁর অঙ্গুলি সুকৌশলে।
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সব, করান তিনি যে তোমারে দিয়া
জয়ও তাঁহার পতাকাও তাঁর, তুমি চল জয়পতাকা নিয়া।

কুপুত্র

আমি একগুঁয়ে, বড়ই অসাবধানী,
নাহিকো বুদ্ধি, নহিকো গুণী কি জ্ঞানী।
বহু ঠকিয়াছি, ঠকাটা হয়েছে ঠিকও,
তবে মনে হয় কারেও ঠকাই নিকো,
জননী যে বাজিকরের মেয়ে তা জানি।

মার উপরেই যত রাগ, দিই গালি
সর্ব অঙ্গে ঢালিয়া দিয়াছি কালি।

যত দুখ-ক্লেশ যতই যাতনা পাই,
মনে বিশ্বাস পেয়েছি তাঁহার ঠাঁই,
সকলেই ভাল, বিনা সে চন্দ্রভালী।

অবুঝ সুতের মায়ের উপরই ঝোঁক,
তিনি মোর সব ব্যথা দুখ রোগ শোক।
তাঁহারই উপর সকল উপদ্রব,
তিনি ছাড়া কারও সহা তা কি সম্ভব ?
তিনিই আঁধার, তিনিই মোর আলোক।

পেয়েছি পেয়েছি সর্বংসহা মা
যতই রাগাই কিছুতে রাগেন না।
যত বকি-ঝকি মা মা ব'লে যত কাঁদি,
তাঁহারি আদরে আবার হৃদয় বাঁধি,
পদ্মহস্ত জুড়াইয়া দেয় গা।

আর কারও 'পরে নাই অভিমান ক্রোধ
সবারই লাগিয়া ভারি মমত্ববোধ।
গুণ দোষ যাহা সবই মোর জননীর,
ঝরে কারণেও অকারণে আঁখিনীর,
মরি অনুতাপে মানে না মন প্রবোধ।

এমনি অভাগা, অভাগাই বলি তাকে,
জীবন ধরিয়া ঝালাপালা করি মাকে।
তবু যেন এই মনে সান্ত্বনা পাই
তাঁর জগতের ভাল তো আর সবাই।
কে মোর আপন ? বকিতে যাইব কাকে ?

এ দৌরাত্ম্য, এই যে উপদ্রব
মোর জীবনের নিত্য মহোৎসব।
গরলের এই নৈবেদ্যই আমি
জননীকে দিই, পূজা করি দিবা যামি,
কানে পশে তাঁর সুধা-হাস্যের রব।

ইহাতেই মোর জীবনের সব দাম,
এমনি করেই এ জীবন কাটালাম !
কটা দিন বাকি ? তবুও যদিন পারি,
মায়ের সঙ্গে চলিবেই আড়াআড়ি,
কুপুত্র হায় পোষার যা পরিণাম !

গান্ধী মহাত্মা

অর্দ্ধ ধরণী নত হল যাঁর পদ্মাসনের তলে,
অহিংসা নব-যুগের সূচনা করিল ভূমণ্ডলে।
হেরি পশুঘাত সদয়-হৃদয় বুদ্ধ শরীর ধারী
কেশবে আমরা চক্ষে দেখিনি, হতভাগ্য যে ভারি,
পশুঘাত নয়, নরপশুদের আঘাত ব্যথিল যাঁকে,
আমরা দেখেছি সে মহামানব গান্ধী মহাত্মাকে।

প্রায় দু হাজার বৎসর পরে জন্মেছি ইহলোকে
যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমা-সুন্দর মূর্তি দেখিনি চোখে ;
কোথায় প্রতাপী 'পাইলেট' আর কোথায় বিচার দিন ?
উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর সে অমর 'নেজারীন'।
যুগের যুগের শিল্পী ও কবি চিত্র যাঁহার আঁকে
দেখিনি, কিন্তু আমরা দেখেছি গান্ধী মহাত্মাকে।

প্রেম অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ চলেছেন ভাবাবেগে
মাঠ ঘাট বাট তীর্থ হয়েছে চরণের ধূলা লেগে ;
ভক্তিতে নত যত নরনারী, যত পাখী তরুলতা,
জীবে সে কি দয়া ! শ্রীহরির লাগি কী গভীর ব্যাকুলতা,
আচণ্ডাল যাচি কোল দেন, যান যেথা তাঁরে ডাকে,
দেখিনি, কিন্তু আমরা দেখেছি গান্ধী মহাত্মাকে।

পদ্মাবক্ষে

বালক বৃদ্ধ বধূ ও কন্যা ভীত সব নরনারী,
আসিছে পলায়ে ঢাকার সুদূর পল্লী ভবন ছাড়ি।
ইষ্টিমারের বুকে বসে আছে নত মুখে

বিদায়-বেদনা-ব্যাকুল নয়নে তখনো রয়েছে বারি।
প্রাণের ভয়েতে আসেনি, নয়কো অর্ধাশনেও ম্লান,
এসেছে বাঁচাতে সম্ভ্রম আর ইজ্জত সম্মান।
গ্রামের বনের রেখা এখনো যেতেছে দেখা
নরের প্রকৃতি বিকৃত কিন্তু আছে প্রকৃতির টান।
সাত পুরুষের বাস্তু ভিটার সে মায়া কি ভোলা যায়?
প্রতি ঘরখানি সজীব হইয়া কেঁদে যেন পথ চায়।
আঙিনার তরুরাজি, আঁখিজলে ভেজে আজি,

মাটির মায়ার শত বন্ধন এড়ানো দারুণ দায়।
ভেঁপু বাজাইয়া ঠেলি জলরাশি চলিছে ইষ্টিমার,
নিদারুণ ব্যথা রঞ্জিত যেন পরিচিত চারিধার।
নদীর জলোচ্ছ্বাস বলে, ওরে কোথা যাস?
তোরা পদ্মার পদ্ম যে কোথা যাবি কোল ছেড়ে তার?
খানাতল্লাস করিতে আসিল গার্ড দল হয়ে জড়ো,
যত তৈজস পত্র হাতাড়ে তর্জন করে বড়।
তন্ন তন্ন করি দেখে নোট টাকা কড়ি,
স্বর্ণ গহনা এড়ায় না সেই দৃষ্টি রূঢ় ও খর।
কী কাড়িয়া লবে? ঠিকানা তো নাই, তাই শঙ্কিত সবে,
পুণ্য ও প্রিয় তৈজস হার অপরে কাড়িয়া লবে?
তাই 'তুমি নাও' বলে, ফেলে পদ্মার জলে,
যা হোক তাহারা শীতল অতলে তবু শান্তিতে রবে।
জলে ফেলে দেয় পুষ্প পাত্র ঘট ঘটি সারি সারি,
আইবুড়ো ভাত খাওয়ার থালাও ভোগ রাঁধিবার হাঁড়ি।
ডিস্ বাটা ফুলদানি যৌতুক সব টানি
সেরা খাগড়াই দানের বাসন তৈজস ভারী ভারী।
বধূ হাত হতে খুলি কঙ্কণ ভাবে অতি শঙ্কিত
শুভ কঙ্কণ কার করে গিয়া হইবে কলঙ্কিত।
'পদ্মা তুমিই পরো শাঁখা অক্ষয় করো।
তোমার সলিলে স্বর্ণ-কাঁকন থাকুক নিমজ্জিত'।
শূন্য হস্ত শূন্য হৃদয় আকাশের পানে চায়—

তাদের ব্যথায় করে পদ্মার জলো হাওয়া হায় হায়।
বলে, 'ওগো মনে রেখো, যেথা যাবে সুখে থেকো,
যাও মঙ্গল মঙ্গলময়ী কাহার উপেক্ষায়'।

দণ্ডকারণ্য

আমরা যাব, যাবই যাব, দণ্ডকারণ্য,
সঙ্গে লব, বাংলাদেশের পুণ্য ও পণ্য।
বাঁধব 'মরাই' ডাইনে বামে, বাঁধব সোনার ধান,
আম কাঁঠাল ও নারিকেলে প্রকাণ্ড বাগান।
ফলাইব সেই মাটিতে শ্রেষ্ঠ ফসল ঢের—
সিঙাপুরী আনারস ও কমলা সিলেটের।
অঙ্গনে পুঁই পুনকো পালং কুমড়া শশা ঝিঙা,
পদ্মভরা দীঘি দূরে—মাছ ধরিবার ডিঙা।

নানান রকম মাছ ফেলিব খিড়কি পুকুরে,
ছিপটি হাতে, বসবো মোরা, দিবস দুপুরে।
ঘর্ঘরিয়া ডাকবে হুইল—খেলবে বৃহৎ রুই,
আসবে ছুটে চাষী—যারা নিরুচ্ছিল ভুঁই।
ডিমভরা সব ট্যাঁরা পুঁটি ধরবো বাটা পোনা—
উল্লসিত ছেলেমেয়ের চলবে আনাগোনা।
চরবে গাভী মুখ ডুবায়ে শ্যামল তৃণ 'পর—
মাছে দুধে ভাতে রবে মোদের বংশধর।

জানাবো এ পুনর্বাসন—নির্বাসন তো নয়—
ভয়ের মাঝে লুকিয়ে রাখেন হরির বরাভয়।
গড়বো কেহ মুড়ি ভাজার খোলা খাপুরি —
বুনবো কেহ কুলো ডালা ঝাঝুরি ঝুড়ি,
বানাইব অমৃতি কেউ—ঢাকাই পরোটা —
লাড্ডু পেড়া বলবে দেখে 'পর নহে ওটা'।
সরভাজা ও ছানাবড়া খইচুর ও ল্যাংচা—
সীতাভোগ ও মিহিদানা—যে চাহিবে যা।

গড়বো নূতন বিক্রমপুর, নূতন নবদ্বীপ—
'চন্দ্রনাথে'র ভালে দিব নূতন চাঁদের টিপ।
বসাইব 'দত্তপাড়া' দণ্ডকেতে আনি'—
'জনস্থানে'র পীঠের কাছে তীর্থ রাজেন্দ্রানী।
সর্বহারা একেবারে নিঃস্ব ও নিঃশেষ—
অরণ্যেতে মিলবে নূতন 'সব পেয়েছির দেশ'।
কেড়ে নিলে—ফেলে এলাম—আকুল আঁখিনীরে—
পদ্মা এবং মেঘনাতে—যা—হেথায় পাব ফিরে।

আরতিতে বাজবে কাঁসর বাংলাদেশের ঢোল—
শঙ্খ ঘণ্টা হুলুরবে বক্ষ উতরোল,
পড়বো সবে মহাভারত পড়বো রামায়ণ
হবে মহৎ দুখের সাথে দুখীদের মিলন।
শ্রীবৎস ও চিন্তা এলো কাঠুরিয়ার দেশে,
চিনবে না কেউ এলো যে হায় অতি মলিন বেশে।
লাঞ্ছনাও বিড়ম্বনা পায়নি কিছু কম,
হেথায় যেন মেলে তাঁদের 'সুরভি আশ্রম'।

সবায় নিয়ে করবো যে ঘর বড়ই মনে সাধ,
জন্মাষ্টমীর সে আনন্দ পড়বে নাকো বাদ।
দশভূজা মূর্তি মায়ের বাংলাদেশের ঢঙে
তৈরী হবে চুম্‌কি চুনী, রাংতা এবং রঙে।
লক্ষ্মী-পূজার সমারোহ এলুন দেওয়া বাড়ী,
মনসা ও ষষ্ঠী পূজা ভুলতে কি গো পারি?
পৌষ আগ্‌লাবো, রোদ পোহাব, গড়বো পুলি-পিঠা,
পার্বণও যে মোদের কাছে ভিটার মত মিঠা।

ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগের দণ্ডকারণ্য,
গুণীগণের বাসে হবে নৈমিষারণ্য।
সেথায় মোরা খুঁজবো নিতি দেবদেবীর পাঁজ
পুণ্য সে সব পদধূলির কিছু কি নেই আজ?
মুনি ঋষি যক্ষরক্ষ সবার অতিথি—
তাঁদের কৃপা তাঁদের আশিস্ মাগবো যে নিতি।

ধুলা-মুঠি সোনার-মুঠি, ঘরকে তপোবন
করবো মোরা, লাগলো চোখে অমৃত অঞ্জন।

যে প্রতিভা ফুটবে হেথা বল সকলে বল—
পূজবে মায়ে একশত আট দিয়ে নীলোৎপল।
অতি বিপুল সে ঐশ্বর্য একলা ভোগের নয়,
বহুর ভোগে লাগবে, তবু রহিবে অক্ষয়।
অনাগত যাঁদের কথা এখনো অজ্ঞাত
জন্মগ্রহণ করবে হেথায় মহামানব কত।
বিরাট তাদের অবদান ও মহাপ্রাণতায়
চিনবে সারা বিশ্বকে যে—যাচ্ছি সে আশায়।

শান্তিরক্ষক

শান্তি রক্ষা করাই মোদের কাজ,
আইন এবং শৃঙ্খলা মোরা রাখি।
বদল একটু হইতে হয়েছে আজ,
উপেক্ষা করি নিরপেক্ষই থাকি।

২

অশান্তিকেই রক্ষা করেছি মোরা,
রক্ষা করেছি শুধু বিশৃঙ্খলা,
খুর ছুঁড়িয়াছে ক্ষোভে আমাদের ঘোড়া
মানুষ কেটেছে স্রেফ মানুষের গলা।

৩

ডেকে আমাদের পায় নাই কেহ সাড়া,
মরণকান্না উঠিয়াছে ঘরে ঘরে,
সুমুখে মোদের জ্বালায়ে দিয়েছে পাড়া
দাঁড়ায়ে যে থাকে সেও একরূপ লড়ে।

৪

সাজানো নগরী হল যে হত্যাগার,
ফেরে লুণ্ঠন হিংসা ও আক্রোশ,
মোদের ছিলনা কিছুই কি করিবার,
ভগবান কাছে আমরা কি নির্দোষ?

অভিজ্ঞতা

সুশ্রী ধরায় বিশ্রী করে স্বার্থ এবং অভিজ্ঞতা,
ভালো তেমন জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞানের এ অলকলতা।
স্বার্থ এসে শিখায় সবে
বৃক্ষ চিরে তক্তা হবে
চক্র ভেঙে মিলবে মধু—সুসভ্যতার অনেক কথা।
মরাল মেরে মিলবে কলম, ময়ূর মেরে মিলবে পাখা,
হরিণীর ওই চক্ষু চেয়ে চর্মেরও দাম অনেক টাকা।
অমল শিরীষ ফুলের বাসে,
এ ধরণীর কী যায় আসে?
প্রকাণ্ড ওর কাণ্ড কেটে গড় গরুর গাড়ির চাকা।
ফুলে তো আর পেট ভরে না—ফুটে থাকুক দিবস নিশি,
শুক লয়ে কি সুখ পাবে হে? তোমরা তো আর নওকো ঋষি।
নয় তো এ যুগ কাদম্বরীর,
জেনো এ যুগ টাকাকড়ির,
'শকুন্তলা' ফেলে এখন—হাটতলাতে জমাও তিসি।
পিক পাপিয়া কাজ কি পুষে? তারা আবার কী গান গাবে?
হংস পোষো, ভোরে উঠেই যা হোক ক'টা ডিম্ব পাবে।
আকাশ পানে চাইছ বৃথা
রামধনুর নাই সার্থকতা,
ঢেউ গুনো না, মৎস্য ধর, পরকে দেবে, নিজে খাবে।
চিবাও বরং পদ্মচাকি, শতদলের কথাই ভোলো,
অর্থ যাতে নাইরে বাপু—কেন তাহার ঢাকনা খোলো?
কাব্যেও চাই অর্থ থাকা,
নইলে বৃথা, নইলে ফাঁকা,
ফুলের বাগান উজাড় ক'রে বালি না হয় কয়লা তোলো।
তুলদাঁড়ি ও বাটখারা বই আবশ্যক আর অন্য কী হে?
লক্ষ টাকা মূল্য পাবে—হস্তী পলাক অস্থি দিয়ে।
হেম রেখে প্রেম পলাক যথা,
উদর রেখে উদারতা
ভাব রেখে হোক প্রতিভা লোপ উদ্ভাবনের ভাণ্ড লয়ে।

এসব কথা সত্য দারুণ—যথেষ্ট দেয় শিক্ষা এতে,
মানুষ যে চায় মনের খোরাক, কেবল শুধু চায় না খেতে।
হলে এসব কথাই দামী
থাকতো কেবল মালগুদামই
শোভাময়ী মস্ত ধরা 'পোস্তা' হ'ত একটি রেতে।

তেশিরের স্বপ্ন

তেশিরার কাঁটাগাছ কেবা দেখে তাকে ?
পড়ো এক পগারেতে থাকে।
থাকে বহু বহু দিন ধরে,
ঠাঁইটি আগল শুধু করে।
ফুল বড়—কদাচিৎ হয়—
সে ফুল পূজার ফুল নয়,
রাখালেরা তুলি' করে খেলা—
সকলেই করে অবহেলা।
শুভ প্রাতে সাধু এক সেই পথ দিয়া
যেতেছেন একাকী চলিয়া।
তেশিরার ফুল ফুটিয়াছে—
দেখিয়া গেলেন তার কাছে।
সোহাগে ফুলটি তুলি' হায়—
পরিলেন নিজের জটায়,
গাছটি উঠিল শিহরিয়া,
সে কি পেলে চেতনা ফিরিয়া ?
সিদ্ধ সৌম্য সে সাধুরে চেনে নাকো কেবা ?
আমি চিনি, নাম বামাক্ষেপা—
দেখিনু কি দৃশ্য অভিরাম,
গুহকের গৃহে এ যে রাম।
পয়নালী স্থান পেলে কিরে—
একেবারে গঙ্গাধর শিরে ?
রে তেশিরে, কি সৌভাগ্য বল ?
আজি তোর স্বপন সফল।

গতি মন্থর

কুন্নুরে বন্যা ছোটে রাঙা জল, একূল ওকূল খেয়া—
কত বার হল খেয়ারীকে ডাক দেয়া।
নদী পার হয়ে গো-গাড়ীতে গেল ওঠা,
তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে ফোঁটা ফোঁটা,
ছুটে যা 'পটলা', ভুলে গেছি আমি ছাতাটা হয়নি নেয়া।

এই 'জোঁকা নালা' ইছাবটগ্রাম, পথে খাল ডোবা কত,
এ যাত্রা যেন জীবন-যাত্রা মত।
দীঘিতে কতই পদ্ম ফুটেছে ওই,
থামা রে শকট, গোটা কত তুলে লই,
মাথার উপর শঙ্খচিলেরা—ডাকিতেছে অবিরত।

পথের পাশেই কে দিয়েছে 'আড়া'—লাফাইছে পুঁটি মাছ-
আর বেলা নাই—ঘনায়ে আসিছে সাঁজ।
ওই স্কুল, কাঁচা ও কচির হাট—
উত্তরে ওই 'হাউই-ওঠা' সে মাঠ,
চেনা সেই বট—চাঁদ উঠিয়াছে ত্রয়োদশী তিথি আজ।

এই ছোট পথ বহিতেছে দূর দুর্ভিক্ষের স্মৃতি—
আজও লোকে গায় সেই বেদনার গীতি।
যেতে যেতে শুনি পল্লীর রসিকতা
'দবীর সেখের' 'চেড়া নামানোর কথা,'
কত চেনা গাছে ভূতের সঙ্গে মানুষের পরিচিতি।

সামান্য পথ তবু যেন কত বিচিত্রতায় ঘেরা—
সাধুর আখড়া, ভ্রমনকারীর ডেরা।
মন্দির চূড়া ওই যে জাগিয়া আছে,
পথ তো ফুরালো পরিচিত বাড়ি কাছে,
এই যে পুকুর চারিদিকে যার কেতকী ফুলের বেড়া।

পাঁচ ক্রোশ পথ—আসিতেই দেখি হল যে প্রহর রাত,
ওদিকে আমরা করি না তো দৃক্‌পাত।

এই সময়েতে এরোপ্লেন গেলে পাওয়া,
এখান হইতে 'কায়রো' যাইত যাওয়া ;
মোটর পাইলে দুইবার হত কলিকাতা যাতায়াত।

'মন্দাক্রান্তা' তালে এই চলা—নেহাৎ মন্দ নয়,
গোটা পথটিই করে উৎসবময়।
কণ্টকবনে ফুল হাসে মুখ টিপে,
ক্ষুদ্র কুটির আলোকিত ক্ষীণ দীপে,
প্রসন্ন মন তৃণলতা হতে মধু যেন টেনে লয়।

বন্ধুর পথ মন্থর গতি—ইহাতেই মোরা প্রীত—
মৃত্যুতে নয় অপমৃত্যুতে ভীত।
মসীমসৃণ পথেই গতির ভীতি—
'মান্থরে' নাই মানুষ মরিছে নিতি।
মরণের সেই গা ঘেঁসিয়া যাওয়া বীরের আকাঙ্ক্ষিত।

খ্রীষ্ট

খ্রীষ্টান নহি প্রভু—
তোমার ক্রুশের বেদনা যে আমি অনুভব করি তবু।
প্রসন্নতা ও প্রসাদ তোমার চাই
মোর দেবতার পাশেই তোমার ঠাঁই,
ক্ষমা-সুন্দর তোমার মূরতি ভুলিতে পারি কি কভু ?

ধর্ম তোমার নিয়েছে যাহারা নিয়েছে তোমার চিনা
আমার দয়াল সন্দেহ হয় তোমারে নিয়েছে কিনা ?
তোমার কথা কি একবার তারা ভাবে ?
তোমার স্বর্গে প্রবেশ তারা কি পাবে ?
মমতাবিহীন করিতেছে দিন বসুন্ধরাকে দীনা।

অপ-বিচারেতে ফাঁসি দিল যারা জাপান জার্মানীতে—
তোমার চেয়ে যে ক্রুশকেই তারা বড় করে ভাবে চিতে।
ইস্পাতে গড়া তাহাদের সব হৃদি,
ক্ষমাহীন প্রতিহিংসার প্রতিনিধি
ধরাকে কলুষ কালিমায় চায় কুৎসিত ক'রে দিতে।

তোমার আলোকে যাবে কি তাহারা আঁধারের পথ বাহি
তারা যে আলোক সৃষ্টি করিছে তোমার সৃষ্টি দাহী।
কী শুভ্রবেশ পরেছে বর্বরতা ?
মুখেতে বিশ্বশান্তির বড় কথা,
মোহ-আবিষ্ট মদ-গর্বিত স্পর্ধার সীমা নাহি।

তব প্রেম ক্ষমা শান্তি রাজ্যে মেষ পালকের দেশে—
মেষ কোথা ? ক্রূর নেকড়ে ব্যাঘ্র ভ্রমিছে ছদ্মবেশে !
রক্ত পাগল হীন হিংস্র প্রাণ,
হে ত্রাণকর্তা তাহারা পাবে কি ত্রাণ—
তোমার জর্ডনে বিষ-বিসর্পী কী নদী মিশিল এসে ?

অতীতে যাহারা কাঁটার কিরীট পরাইল তব শিরে—
কণ্টকিত কি করিতে ধরণী তারাই এসেছে ফিরে ?
কোনো অপরাধ সাধনে কি তারা ভীত ?
নহে প্রীতিকামী, স্বার্থলাভেই প্রীত ;
করে সমারোহে হিংসার পূজা দাঁড়ায়ে তোমারে ঘিরে।

ক্রুশে আরোপিয়া বলেছিল যারা হাসি বিদ্রূপ হাসি—
"পরম পিতা তো রক্ষিতে সুতে আসিল না ভালোবাসি ?
রস-বিগ্রহ জীবন্ত মন্দির
ভাঙে যুগে যুগে দূতেরা দুষ্কৃতির,
লাঞ্ছনা মাঝে দেবতা উঠেন নবরূপে উদ্ভাসি।

বৈষ্ণব মোরা বিশ্বাস করি তব পুনরুত্থান,
তুমি প্রোজ্জ্বল—পাষণ্ডদল লুণ্ঠিত ধূলিম্লান।
তুমি জাগ্রত—হে অবিস্মরণীয়—
প্রণাম আমার, প্রণতি আমার নিয়ো ;
অপাপবিদ্ধ হে মূর্ত প্রেম গাহি তব জয়গান।

সহজিয়া গান

থাক অনটন শতেক বেদন দ্রব্য মূল্য যাক বেড়ে,
অদল বদল হোক না যতই আমার শ্রোতা থাকবেরে।
অর্দ্ধাসন কি হোক অনশন,
বাস্তুহারার পুনর্বাসন,
দেশে যে দল হউক প্রবল যে দল যাবে যাক হেরে—
গানের আদর থাকবে রে।
গীত কবিতার নয় এ সময়, তর্কে যতই জাল পাতো,
প্রেম চিরদিন তেমনি নবীন চলছে সমান ব্যবসা তো।
রয়েছে—নয় মিথ্যা কথা,
সেই সে আদিম চঞ্চলতা,
নতুন তেমনি উঠছে ফুটে গুঞ্জরি ভ্রমর ফিরে—
গানের আদর থাকবে রে।
অনাগতের নবাগতের আসরে ভিড় জমছে ভাই,
তোমার কথায় এমন দিনে কেমন করে গান থামাই।
উঠতি পড়তি দর যে হেমের
দরটি বাঁধা ভক্তি-প্রেমের
আমার এ গান সব বসন্তের সবার ভাল লাগবেরে—
গানের আদর থাকবে রে।
কালজয়ী প্রেম থাকবে যদিন, যৌবন এবং কৈশোরও—
বাঁধা তোমার সাধের সারং গান ধরো ভাই গান ধরো।
এলো প্লাবন—কদিন রবে,
এতেই তরী বাইতে হবে,
এই নদীতেই আবার মধুর কলধ্বনি জাগবে রে—
গানের শ্রোতা থাকবে রে।

সুরের অভিশাপ

যাত্রাদলের আখড়া-গৃহ উঠিয়া দিয়ে অকস্মাৎ এক ধনী
নূতন আড়ত খুললে সেথা লক্ষ্মীদেবীর সদ্য কৃপা গনি'।
তৃপ্ত দেখে পূর্ণ গুদাম—ভাবলে আহা শান্তিতে কাল যাবে
জানতো কি সে আড়তদারে যাত্রাদলের খেয়াল-ভূতে পাবে।

কর্তা চটেন সকল কথায়—মাথায় তাহার তব্‌লা বাজে জোরে,
নাসায় বাজে গৌড় সারঙ, কানে তাহার বেহাগ বাজে ভোরে।
যখন তিনি হাস্য করেন আরম্ভ হয় 'রামবনবাস' পালা—
নিদ্রাকালে 'রাবণ বধের' চীৎকারেতে কর্ণে লাগায় তালা।

লাভালাভের ফর্দ করেন একলা যখন 'খসড়া খতেন' লয়ে—
বাউল এসে নাচতে থাকে 'ভয়ঙ্কর সে দিনের' কথা কয়ে।
একটি দিনও স্বস্তি নাহি, আড়তদার তো ঝিমোয় চটে অতি,
রাগ রাগিনী বললে শেষে—কে দিলে হে এমনতর মতি।

সুর যে অমর মরবে নাতো—উদ্বাস্তু যে করলে তুমি সবে,
কড়ি-কোমল ভাঙলে তুমি মিঠে-কড়া সইতে এখন হবে।
এই ঘরেতে যেথায় তুমি করলে বাঁধাই যত্ন করে তিসি,
সুদামা আর কৃষ্ণ মিলন উল্লসিত করলে কত নিশি।

কাব্য হেথায় ধরতো যে রূপ—জাগতো অতীত কথায় নাচে গানে
আকাশে ওই খণ্ড শশী শুধাও সে সেই সুধার খবর জানে।
মস্ত ধরায় বস্তা রাখার ঠাঁই পেলে না কোথাও ঠাকুর দাদা
সুর তাড়িয়ে আন্‌লে অসুর—গোলক্ গিয়ে এলো গোলকধাঁধা।

মেনি

মেনিটাকে দেখছি না কিন্তু,
মাছ খায় হাঁড়ি থেকে লাভ নেই তারে রেখে
রাখা দায়—ঘরে দুধ দই তো !
সব বাড়ী, সব ঠাঁই গতি যে—
নিত্য সবার করে ক্ষতি সে,
ছেলেদের বিছানায় আরামেতে ঘুম যায়
করে নাকো উৎপাত বৈ তো।

দোষ ছাড়া গুণ নাই বিন্দু—
তবু কি আকর্ষণ বোঝে না অবোধ মন
ছেড়ে দিতে চায় নাকো কিন্তু।

হোক সে যতই হোক দুষ্ট—
কাছে থাকাতেই তারা তুষ্ট,
কোথা গেল পথ ভুলো কাঁদিতেছে ছেলেগুলো
পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট ওই তো !

মিন্নুর কোকিল

ওরে খোকা, কোথা তুই শিখেছিস ফন্দি—
একেবারে পিকরাজে করেছিস বন্দী !
দোরে গোটা সুরলোক একে করে কেন্দ্র
যে সে নয় এ যে বাপু দ্বিতীয় দেবেন্দ্র !
দেখ ওর রাঙা আঁখি বুঝি জলে ভাসছে—
সুলতান তুই নাকি ? বুক মোর কাঁপে যে
রেখেছিস কাছে এনে মহাকবি হাফেজে !
সাথে তার কালিদাস বাস করে নিত্য—
ছদ্মবেশেতে তুই বিক্রমাদিত্য !
মনোভাব তোর কিছু পারিনে যে বুঝতে,
আকবর ন'স চাস তানসেনে পুষতে !
পথ তোর ফুলে ছাওয়া, সুধা অফুরন্ত—
সাথে সাথে ফেরে তোর সুচির বসন্ত।

সংযোজন

নৌকাপথে

১

মাঝি,—গিয়েছি এ পথে অর্দ্ধ শতাব্দী আগে—
চলুক তরী—পথটি বড় ভাল যে লাগে।
কত ফুলের গন্ধ আসে, কত পাখীর স্বর,—
আধেক ভোলা চেনা গানের সুরটি মনোহর,
—রাঙালো পথ কে যেন আজ নবানুরাগে।

২

ব্যথার পথই এম্‌নি করে হয়রে ছায়াপথ,
ঘরের ব্যথাই ভাগ করে লয় সমগ্র জগৎ।
ব্যথাই ভরে সুধার কলস লবণ সাগরে।
ব্যথাই গড়ে স্মৃতির দেউল মণি মর্ম্মরে।
সুরধুনী আসেন চিতাভস্মের দাগে।

৩

তরী চরণ পরশে কার হ'ল যে সোনা—
দেখছি আমি মাঝি তুমি খপর রাখো না।
মৃতই দেছে যাত্রা তোমার অমৃত করি,—
আঁখি জলের মুক্তা দিল তরণী ভরি,
এবার মাঝি সুদূর গঙ্গা-সাগর যে ডাকে।

৪

আসছে হাওয়া কালিদহের কমল কাননের—
এবার দূরের পাল্লা মাঝি,—বিঘ্ন আছে ঢের।
চারি দিকে মেঘের ঘটা—সাগর উথলে—
খেলছে তবু সোনার আলো সুনীল জলে,
কমল বনের কাছেই এবার তরী ভিড়াবে।

৫

এবার হবে—হয়ত—কমল-কামিনী দর্শন—
যাহার লাগি সদাই এ মন হয়রে উচাটন।
দেখা দেবেন গণেশ কোলে চন্দ্রভালী মা—
সফল জীবন—পূর্ণ হবে সকল কামনা।
ডাকছে আমায় মায়ের পায়ের পদ্ম পরাগে।

কবির ভালবাসা

তুমি আমায় চিনেছ কি ? শুধাই হে কবি—
আমি তোমার ভালবাসা—এলাম রূপ লভি।
এ সুষমা কোথায় পেলাম ? আমিই বুঝি তা,
আমি তোমার পুণ্যপ্রীতি, শুভ্র শুচিতা।
ফুলের চেয়ে বড় যেমন ফুলের সুরভি—
তোমার চেয়ে বড় তোমার তপস্যা কবি।
আছে তোমার ভালবাসা তোমারে জিনি—
চাঁদের চেয়ে বড় হয়ে চাঁদের চাঁদিনী।
আমি তোমার মধুমাখা কোজাগরের রাত
আবীর-রাঙা দোল-যামিনী ফিরি তোমার সাথ।
শ্রাবণ-নিশি হের সখে কেমন হেমাভ—
ইচ্ছা করে তোমার সাথে ঝুলন ঝুলাবো।
যে চোখ তোমার করছে ভগবানের প্রতীক্ষা,
তাহার পানে চাইতে আমার শিউরে ওঠে গা।
এত ডেকে এত কেঁদে খুঁজছো যাঁহারে—
বুঝলে কিনা মিলিয়ে দেব আমিই তাঁহারে।
আমি তোমার সাবিত্রী যে মরছি দেমাকে—
অমর করে রাখ্‌বো জেনো আমিই তোমাকে।

কবি-কথা

উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাড়িছে, অন্ন বস্ত্র চাকুরী চাহি,
হে কবি, তোমার কবিতা পড়ার ইচ্ছা এবং সময় নাহি।
দুর্ঘটনার নাহিক অবধি, দিন যে কাটিছে চিন্তা ভরে,
সকল দ্রব্য অগ্নিমূল্য,—মানুষের প্রাণ এত কি সহে ?
মান কি অর্থ কিছুই পাবে না, কবিতা তোমাকে দেবে না খেতে,
কবির কর্ম্ম বল কি হে শুনি ? কি কর বসিয়া দিবস রেতে ?
হও ব্যবসায়ী, কর্ম্মী কি নেতা, কিংবা বেড়াও 'শ্লোগান' দিয়ে,
বহু দিকে পাবে বহুৎ সুবিধা মাথা ঘামায়ো না কবিতা নিয়ে।
কালের কলের ঘর্ঘর শোন, থামাও তোমার বেণু ও বীণা—
ও পেশা অচল, বুঝলে কিনা।

(২)

'সীঙ ম্যানরী'র দাপট দেখেছ, 'মালান' 'ম্যালেনকফ'কে মানো ?
'রোজেন বার্গে' মৃত্যুদণ্ড কেন দিল তার কারণ জানো ?
থাকো ছন্দের ঝুমঝুমি নিয়ে, সুরের সোহাগে, কথার ধূমে,
খপর নাও না কি যে করিছেন, 'হো চিন্ মিন্' আর 'মাও সেতুমে'।
'আইসেন হাওয়ার' হাওয়ায় যে বীজ বপন করেন আনন্দেতে—
দেখো না হয়ে তা আফিম ফুল যে ফোটে কোরিয়ার তুষার ক্ষেতে।
'ইরাণ' খনিতে কি তেল উঠিছে ? 'সুয়েজে' নাজীব কি খেলা খেলে ?
জানো কি কেমনে সাগর বাঁধিছে 'ফরমোসা' দ্বীপে কাঠবিড়ালে ?
ওই সব নিয়ে নাটক লেখো না, লাগাও উপন্যাসের কাজে—
কবিতা লিখো না—বকো না বাজে।

(৩)

কবি বলে, 'ক্ষমা কর হে বন্ধু, যা করি করিব য'দিন বাঁচি,
বৃহৎ ব্যাপার তোমাদেরি থাক, আদার বেপারী ভালই আছি।
অভাবের কথা কহিছ, কিন্তু গ্রাহ্য না করি বৃষ্টি হিম ও,
সিনেমা গৃহেতে নিত্য দেখছি লোকের ভিড় যে অপরিসীম।
সকলেই সহি সমান দুঃখ, ব্যথার অংশ সমান আছে,
কিন্তু তা বলে, দেখিতে ভুলিনে কদম্ব ফুল ফুটেছে গাছে।
রামায়ণ পাঠ বন্ধ করিনে, উৎপাত করে যেহেতু হনু,
বৃষ্টিতে ঘরে জল পড়ে বলে দেখিব না নাকি ইন্দ্রধনু ?
দেখ সুন্দর সত্য ও শিবে নয়ন মনের তৃপ্তি যাহা—
একা তুমি অতো ভেব না আহা।

(৪)

মাটির হাঁড়ির মূল্য বেড়েছে তবু কুতূহলী দেখে যে কবি—
'গোয়ারি'র মৃৎ শিল্পীর গড়া, সুন্দর দেব দেবীর ছবি।
'গামছা' ফেরানি মহার্ঘ হল, ক্রয় করিতেও কষ্ট ভারি।
কিন্তু তবুও বাহবা যে দিই দেখিয়া শান্তিপুরের শাড়ী।
মৃৎ শিল্পীরা গড়িবে কি 'টালি' ? গড়িবে কি শুধু গামলা জালা ?
মাল্সা ভাঁড়ের গুদাম হবে কি তাহাদের চারু শিল্পশালা ?
রবে কি মোদক সরভাজা ত্যজি কেবল পাটালি মুড়কি নিয়া ?
মণিকার আর স্বর্ণকারেরা কাষ্ঠ কাটিবে কাননে গিয়া ?

দেশটাকে দেখা পরিণত হতে রুগ্ন মনের হাসপাতালে—
বিধাতা মোদের লেখেনি ভালে।

(৫)

কবিতা না পড় তাতে কি দুঃখ, এতো করা নয় অনুগ্রহ;
যেচে মান নেওয়া, আমরা যে ভাবি, অপমান চেয়ে দুর্বিষহ।
সকল দৈন্য চেয়ে, হে বন্ধু মনের দৈন্য বিষম ব্যাধি,
আধপেটা খাই তবুও এখনো বীণার গৎটি তেমনি সাধি।
লাভ যাতে নাই, না করাই শ্রেয়ঃ সাধু উপদেশ, সরল অতি,—
কিন্তু কোকিল বলিভুক হলে, 'বাবুই' হলে যে দেশের ক্ষতি।
আমাদের আছে শত অনটন, উদরেতে আছে প্রচুর ক্ষুধা,
তবুও তুচ্ছ ক্ষুদে পাই মোরা 'বিদুরের' সেই ক্ষুদের সুধা।
ডাকি অনাগত চিরাকাঙ্ক্ষিতে, শূন্য কলস সুধায় ভরি—
ভাঙ্গা এ পৃথিবী নূতন গড়ি।

(৬)

কবির কর্ম বুঝিনে বন্ধু—যতটুকু জানি কই তুঁহারে,
দুখের শিখরে সুখের অলকা সৃষ্টি করিতে সে-ই যে পারে।
মহাসাগরের সোহাগ পরশ হেরে কবি পাণিশঙ্খ গায়ে,
শোনে চন্দন বনের কাহিনী নিদাঘের খর ঝঞ্ঝাবায়ে।
প্রাসাদ-নগরী মর্ম্মর পুরী কবে যাবে উবে স্থিরতা নাহি
পৃথিবীর সব বস্তুর চেয়ে স্বপ্ন কবির অধিক স্থায়ী।
মৃগনাভি মাঝে মৃগেরে জীয়ায়, শুক্তিকে তার মুক্তা মাঝে,—
সীতা নাহি যেথা, কবি অবিরত রত ছায়াসীতা গড়ার কাজে।
ভাবকে রূপ আর রূপকে ভাব যে দেওয়াই তাহার কর্ম্ম জানে—
তাই করি কবি ধন্য মানে।'

কবির কথা

যা বল মনঃ ক্ষোভে—
সুখ্যাতি করি জেনো করি না'ক পুরস্কারের লোভে।
নিত্য রবির স্তোত্র যে গাই,
সেখান হইতে আমরা কি পাই ?
অপূর্ব্ব রূপ—প্রভাতে উদয় সন্ধ্যায় যবে ডোবে।

তোমারে শুধাই সাথী ?
'ছো' মারিবে বলে ভয়ে ত সাপের করিনাক সুখ্যাতি।
থাক্ হুল তবু ভ্রমরই যে প্রিয়,
গুবরে পোকার পার জয় দিও,
বুদ্ধিমানের তক্‌মাটা পাক গম্ভীর-বেদী হাতী।

যশ ত যায় না গাওয়া—
তাজমহলের ছাদ যদি হয় উলা খর দিয়ে ছাওয়া ?
মানুষের মাথা ফাঁকা আর ফাঁপা
তাজ ও মুকুটে যায় নাক ঢাকা,
ফাটা বংশের সংবাদ দেয় চীৎকার করে হাওয়া।

এ তো অকারণ রাগা—
শব সাধনার অর্থ নহেক শ্মশানেতে রাত জাগা।
শবাসনা নয়—শুধু শব সাথ—
শিয়াল ও ত জাগে সুদীর্ঘ রাত,
সিদ্ধিলাভের সেও আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে কি হাঁ গা ?

দাও যারে যাহা শোভে,
ষাঁড়ে দেগে দিয়ে জয়-পত্রটা অশ্বের লাগি থোবে।
কারু ধূপ ধূনা, চন্দন কারু,
কাহারো লাগিয়া গোবরের লাড়ু।
চতুর্ভুজের প্রাপ্য কেমনে চতুষ্পদেরা ছোঁবে ?

যশই যাহারা যাচে—
পায়না তাহারা প্রতিষ্ঠা হায় ঘেঁসেনা তাদের কাছে।
চাঁদ উঠে হয় সাগর উতল,
ফুকারিয়া ফেরে চকোরের দল,
কস্তুরী মৃগ ছুটে সুরভি যে ছোটে তার আগে পাছে।

গান

বিধি সামলাতে ভুলটে—
পৃথিবীটা দেবে উল্‌টে,

রবেনা কেতাব বই রে,
একটানা দেবে মই রে।
তখন কে আর উড়বে!
বনেই সবাই ঘুরবে।
থাকবে না কোন চিন্তা—
নাচ্‌বে ধিন্‌তা ধিন্‌তা,
ঝুনোর বদলে বুনোই তখন থাকবে,
যে হাঁড়িয়া রবে তখন তা ভাল লাগবে।

২

থাকবে কুকুর কুক্‌ড়ো
শাল ও মউল মৃগ্‌রো,
ব্যাঘ্র ভালুক সর্প
হবে পৃথিবীর গর্ব্ব।
বীরগণ করি দম্ভ,
গাছে গাছে দিবে লম্ফ।
মিটে যাবে সব খাঁইরে
তাইরে নাইরে নাইরে।
ঝুনোর বদলে বুনোই তখন থাকবে,
যে হাঁড়িয়া রবে তখন তা ভাল লাগবে।

৩

দেশগুলো হবে জঙ্গল,
বেড়ে যাবে পশু মঙ্গল।
মাছে জল হবে ভর্ত্তি
সুখের খপর সত্যি।
থাকবে চন্দ্র সূর্যি
ঝিঞা চিচিঙ্গা ঝুঝাঝি।
থাকবে না কোন ঝগড়া,
দুহাতে মেহেদী রগ্‌ড়া।
ঝুনোর বদলে বুনোই তখন থাকবে।
যে হাঁড়িয়া রবে তখন তা ভাল লাগবে।

৪

তখন একাই একশো
লাগ্‌বে না কোনো ট্যাক্‌সো !
রবে না তক্‌মা উর্দ্দী
এস্তার করো ফুর্ত্তি।
থাকবে না কোনো দ্বন্দ্ব
সকল অফিস বন্ধ।
বসে বসে তোলো হাঁই রে,
তাইরে নাইরে নাইরে।
ঝুনোর বদলে বুনোই তখন থাকবে।
যে হাঁড়িয়া রবে তখন তা ভাল লাগবে।

আসে

(১)

সাধক জগন্মঙ্গলব্রতী, ভাবুক শিল্পিদল,
স্বপ্নে ও ধ্যানে গড়ে যে নূতন ভাবের ভূমণ্ডল,
সমুজ্জ্বল সে ভুবনই যে আসে জীর্ণ জগৎপর—
করিতে তাহারে শুচি সুন্দর এবং মহত্তর।
মহামানবেরা আজি যা ভাবেন, কাল তো তাহাই হয়।
ভাব যে জমিয়া বস্তু হইতে সময় একটু লয়।
বাল্মীকির সে রামই আসেন—করুণার নাহি সীমা,
মেশে সত্যের অরুণ আলোকে স্বপ্নের পূর্ণিমা।

(২)

মনুষ্যত্বে উচ্চ করিতে গুহা-মানবের স্তর—
দেশ ও জাতির ধ্যানীর লেগেছে বহু বহু বৎসর।
সূর্য গিয়েছে ক্ষয়ে কতখানি—কমেছে তাহার জ্যোতি—
গড়িতে একটি অমিতাভ—শুধু একটি জগজ্জ্যোতি।
গরুড়ের দৃঢ় স্থির আকাঙ্ক্ষা লইয়া অহিংসাকে
গড়েছে একটি অপাপবিদ্ধ গান্ধী মহাত্মাকে।
করেছে কঠোর কত তপস্যা মধু পূর্ণিমা রাত!
কত শরতের পদ্মের ধ্যানে—এলো রবীন্দ্রনাথ!

(৩)

পিপীলিকা তোলে বল্মীক—তাহা অদ্ভুত কিছু নয়,
ক্ষুদ্র সে—তার স্বপ্ন যে গড়ে সুবিশাল হিমালয়।
টুনটুনি ক্রোধ অগস্ত্য হয়ে সাগর শোষণ করে,
মন যে তাহার দর্পহারীর,—দর্পীরে নাহি ডরে।
মৃত্যু জানেনা পাপ ফিরে আসে দেখি মাথা হয় হেঁট।
করে নিষ্পাপ যীশুর বিচার এখনো যে 'পাইলেট'!
প্রতিহিংসার কিছুই কমে না; কমে না তাহার জ্বালা
'সপ্তরথী'র ব্যূহ রচে আজও, রচে নব কারবালা।

(৪)

ত্যাগীর ধ্যানেতে দধীচি গঠিত—তপস্যা ধরণীর—
পেয়েছে ভীষ্ম সম সংযমী—অর্জ্জুন সম বীর।
হতেছে সমাজ সুসভ্যতার সূক্ষ্ম চিত্রকলা,—
ছড়া দোঁহা ভাঙি বাহিরিয়া আসে কবির শকুন্তলা।
কবির স্বপ্ন আজও পাতে নব সাম্রাজ্যের ভিত,
জীবকে করিছে উন্নততর—তাহাদের সঙ্গীত।
ছোট চাতকের কাকুতিতে ভাঙে সুর-সরিতের বাঁধ।
চকোরের ডাকে আগায়ে আসিছে যুগ যুগ ধরে চাঁদ।

(৫)

সৃষ্টিকে করে শ্রেষ্ঠতর যে স্থির সংকল্পই,
উৎকর্ষ তো লভে না ভুবন—এই উপাদান বই।
তিলোত্তমারে গড়িয়া তুলিছে রসিক শিল্পী মন
ভাবই রূপের পরিমণ্ডল বাড়ায় অনুক্ষণ।
ফুরায় বন্ধ্যা শতাব্দী কত, নির্মম বর্ষ,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে বিরাট আদর্শ।
অশোকের সাধ, ইচ্ছাশক্তি কালে যায় নাই ক্ষয়ে।
নব কলেবরে আবার আসিছে—বিপুল শক্তি লয়ে।

(৬)

কৃচ্ছ্র সাধনা করিতে হয়েছে জাতির গৃহশ্রীকে,—
ধরায় আনিতে দেবী ও মানবী সীতা ও সাবিত্রীকে।

মাতৃস্নেহ সাত সাগরেতে ঢেলেছে তাহার গা,
নরনারায়ণে সন্তান পেতে—হ'তে গোপালের মা।
বসুধাকে দিতে নূতন মহিমা নূতন লাবণ্য,
ধরি নর-তনু প্রেম আসে—আসে অবিনাশী পুণ্য।
যিনি সৎ চিৎ পরমানন্দ—নাহি পরিবর্তন—
বহু বহু রূপে ভাবগ্রাহী সে আসেন জনার্দন।

রূপকার

যাহা আঁকি, লিখি, যাহা গড়ি মোর নহে শুধু তাহা যা দেখি চোখে
লাবণ্যে করি অভিষেক তার, ভাবনেত্রের স্নিগ্ধালোকে।
বাদ দিই মোরা অনেক কিছুই বস্তু হতে,
ত্যাগের মহিমা সমান সকল সাধন পথে,
শান্ত এবং সহনীয় করি রৌদ্র এবং বীভৎসকে।

২

মোরা প্রাণহীন পাষাণ খোদিয়া জীবন দেবতা যতনে গড়ি,
রুক্ষ গুহার বক্ষ যে দিই কালজয়ী সব চিত্রে ভরি।
ভয়াল, করাল, মহান শ্মশান ভালই চিনি,
যেখানে থাকেন শিব সাথে শিব সীমন্তিনী।
শবর আমরা হস্তে কিন্তু জগন্নাথের রথের ডুরি।

৩

শিল্পী যতই নিপুণ হউন, তবু তিনি সদা রাখেন মনে—
গোবর দিয়েই যাবে নাকো গড়া কিছুতেই গিরি গোবর্দ্ধনে।
রৌদ্রের সাথে মিশাইলে শুধু জলের কণা
নাহিক ইন্দ্রধনু গড়িবার সম্ভাবনা।
চাই সবিতার কৃপা কটাক্ষ নভের মিতালী মেঘের সনে।

৪

গাঁজার ধোঁয়া ও ময়লাই নয়, নয় সে পূর্ণ কুম্ভমেলা—
চারিদিকে তার লক্ষ বুকের ভক্তি-প্রেমের চাই মেখলা।
শুচি হওয়া চাই, রূপায়ণ যাহা করিতে চাহি,
কদর্যতার স্থান যে শিল্পে কাব্যে নাহি,
কোথা শিল্পীর তপঃ ফল ? আর কোথায় খেয়ালী ছেলের খেলা।

৫

রূপ দিই যবে কপিল এবং অগস্ত্যের সে সমুদ্রকে—
হেরি নীলাম্বু সে ভীমকান্ত রূপ ধ্যান করি ধ্যানীর চোখে।
অসীমের ছায়া, সে যে রহস্যে রত্নে ভরা,
শকুনে, হাঙরে, নাবিকের হাড়ে যায় না গড়া,
দিতে হবে তাতে তরঙ্গায়িত কল্লোলোকের আনন্দকে।

৬

ভিতের ইটের প্রতিকৃতির, কতটুকু আছে সার্থকতা,
যদি নাহি থাকে তাতে শিল্পীর মনের গোটা সে বাড়ীর কথা।
সত্যের সাথে স্বপ্ন মেশাই অনেকখানি
পাষাণের চাঁদে সুধাকর মোরা করিতে জানি,
সৃষ্টি মোদের মাগে স্রষ্টার নলিন আঁখির প্রসন্নতা।

৭

অভাবনীয়কে ভাবে নিয়ে আসি, কার্য্য মোদের অ-ধরা ধরা,
আগতের কাছে অনাগতে ডাকা অব্যক্তকে ব্যক্ত করা।
তুলি ধ্যান করে, রঙ কথা কয় পুলকে মেতে,
জ্যোতির্ময়ের আলো এসে পড়ে আলেখ্যতে—
বিচিত্র সেই রূপের রাজ্যে প্রবেশ করে না মৃত্যু জরা।

৮

'প্রতিপদে' ক্ষীণ চন্দ্রকলায় রেখে দিই ভাবী পূর্ণিমাকে,
ভূমি চম্পক জাগে আমাদের গুরু গম্ভীর মেঘের ডাকে।
ছবি শিল্পীর ক্ষীরোদ সাগর সুধান্বেষী—
চোখে যাহা পায় মনে সেথা পায় অনেক বেশী।
গোমুখী ধারায় ভগীরথের সে জীবন সাধনা মাখানো থাকে।

৯

ছবি যে সম্ভাবনার মূর্ত্তি কস্তুরী ভরা মৃগের নাভি,—
পুতুল তবু সে চাহিতেছে বুকে সদা দেবতার আবির্ভাবই।
ভাব রূপ সে যে, শিবসুন্দরে পূজিছে নিতি,—
পরশন তার কুৎসিতে করে অকুৎসিতই।
মৌন সেতার তবু সুরের মহাসঙ্গীতে করে যে দাবী।

১০

লেখা-রেখা আঁকা এ শরের সেতু রূপের সাগর বাঁধিতে পারে
সে যে দোলে, আর মনকে দোলায়, ভাঙ্গে নাকো মহাবীরের ভারে,
রূপকার থাকে মহাবিস্ময়ে অবাক হয়ে,
ভাবে ক্ষীণ সেতু কেমনে রয়েছে এ ভার সয়ে!
মহাকাল দেখি থমকি দাঁড়ান গৌরব দান করিতে তারে।

যোগভ্রষ্ট

আর একটু যদি বিশুদ্ধ হত, সতর্ক হত মন,
হ'ত না বিফল আমার এই জীবন।
গরুড় পাখীর পাখার বাতাস সুধা হিল্লোল প্রায়
কতবার এসে লেগেছে আমার গায়।
শুনেছি তাঁহার বাঁশরীর সাড়া পেয়েছি অঙ্গবাস,
পুলকে বন্ধ হইয়াছে নিঃশ্বাস।
সাগর-সমীপে ক্ষুদ্র নদীও হয় তরঙ্গাকুল
তাহাকেই হয় সাগর বলিয়া ভুল,
তেমনি আমিও হারায়ে গেলাম কি বিপুল মহিমায়।
সব অনিত্য মিলালো নিত্যতায়।
মনে হ'ল এই মহা মুহূর্ত্ত শেষ হইবার নয়
চিরকাল তরে হয়ে রবে অক্ষয়।
যাঁহারে পাইলে সব পাওয়া যায়, সকল দৈন্য ভুলি,
মধুময় হয় এই পার্থিব ধুলি,
সেই সে আমার শত জনমের শত সাধনার ধন
পলকে কোথায় হ'ল যে অদর্শন।
নির্ব্বোধ আঁখি, দুর্ব্বল আঁখি হল না উন্মীলিত
প্রতিপদ চাঁদ হল যে অস্তমিত!
শুধু জানিলাম ভগবানে দেখা নহেক অসম্ভব—
সাধু জীবনের ওই তো মহোৎসব।
প্রতি মানুষের ভিতরে রয়েছে উপাসিকা গোপবধূ
প্রতি ফুলে রয় যেমন করিয়া মধু।

অসম্ভব কি আছে মানুষের তুলনা তাহার নাই
পেতে পারে রাস পরিমণ্ডলে ঠাঁই।
পূর্ণকুম্ভ লয়ে গেল মোর সাথীদল সারি বাঁধি,
ভগ্ন কুম্ভ লয়ে আমি একা কাঁদি।
যোগভ্রষ্ট সর্বভ্রষ্ট উড়ু উড়ু করে মন
নয়নে লেগেছে সে রূপের অঞ্জন।

কৃপার কথা

হে ভগবান তোমায় পেতে হয় না কোথাও যেতে,
গৃহী তাহার গৃহেতে পায় চাষী তাহার ক্ষেতে।
শিল্পী তাহার শিল্পশালে,
ভাবুক ভাবের অন্তরালে,
সতী তাহার রঙমহলে আপন অন্দরেতে।

২

পাহাড়ী তার পাহাড়ে পায় ডুবারি তার জলে,
পথিক তাহার পথেতে পায়, কিম্বা তরুতলে।
যে যা করে নিজের পেশা,
তাহার সাথেই মেলা মেশা,
দিনে তারে সূর্য্য যে পায় চন্দ্র যে পায় রেতে।

৩

এসো দীনবন্ধু দাদা কভু বিজন পথে,
মহারথীর সাথে কভু সারথি জয়-রথে।
দম্ভনাশে, দম্ভে কভু
এসো স্ফটিক স্তম্ভে কভু।
এসো নরসিংহ—ধরা কাঁপে হুঙ্কারেতে।

৪

রাজসূয় ও অশ্বমেধ যে পায় না যোগেশ্বরে,
সে যে দয়াল বিদুর-দেওয়া খুদের আদর করে।
গুণী জ্ঞানীর সঙ্গেতে বেশ,
থাকেন,—ব্যাকুল হন মধুবেশ,
রাখাল বালক যখন ডাকে গুঞ্জা মালা গেঁথে।

৫

বিপদ বারণ হে নারায়ণ বলবো তোমায় কি
ভেবে আমি পাইনে তোমার কৃপার পরিধি।
অর্জ্জুনেরে বক্ষ দিয়া,
নিজেই রাখো আগুলিয়া
ব্যর্থ যে ব্রহ্মাস্ত্র ফেরে মুহূর্ত্ত সঙ্কেতে।

দ্বিধা

গায়ে আমার লাগলো এ কোন অবিশ্বাসীর হাওয়া?
হয় না কেন ব্যাকুল হয়ে নামটি তাঁহার গাওয়া?
যায় না যে নাম দাগটি রেখে,
নয়ন জলের অভিষেকে—
পরশ মণির পরশ কেন যায় না বুকে পাওয়া?

অনন্ত নির্ভর রে আমার—অনন্ত বিশ্বাস,
কমালো হায় কোন কালিয়ার বিষাক্ত নিঃশ্বাস?
সন্দেহ পাপ হেথায় কেনে?
হঠাৎ এলো বজ্র হেনে
চকোরে হায় ভুলাতে চায় চাঁদের পথ চাওয়া!

শ্রীকুলিয়ার পাটের ধূলি—মাখতে আমার সাধ,
ভঞ্জন হোক, ভঞ্জন হোক, সকল অপরাধ।
ব্রজের রজের অধিকারী,
এবার যেন হতে পারি,
মাধুকরীর উপর যেন জন্মে আমার দাওয়া।

কাগজগুলো

ঘটেনাকো কিছুই ওসব কাগজগুলো ঘটায়
সর্ব্বনাশের ভগ্ন পাইক মিথ্যা কথা রটায়।
মেরেছে আর কটা হাজার?
পোড়ালো গ্রাম—ক'টা বাজার?
কেন ওরা মহৎ বৃহৎ গুণ্ডাগণে চটায়?

শিষ্ট মরুক দুষ্টে কেন কষ্ট দেবে ধরে ?
তারা বেড়াক আমোদ করে চতুর্দ্দোলায় চড়ে।
শাসবে তারাই এ দেশটাকে
রইবে তারা—রাখবে যারে,
ননীর পুতুল যাচ্ছে গলে মন্দ কথার ছটায়।

শান্ত হয়েই থাকতো জেনো নোয়াখালি বেহার।
কাগজ যদি হত্যা ও লুট করতো নাক কেয়ার।
ছাপতো নাক কোনই খবর
হরফ দিয়ে জবর জবর।
আসতো না বান—গঙ্গা ঢাকা রইতো শিবের জটায়।

সত্য খাঁটি থাকতো চাপা বিষাক্তকর পানায়,
বুঝিনাতো কাগজগুলো কেন ওসব জানায়।
গ্রাম পোড়ে ও মানুষ মরে,
হয়তো কেবল ওদের তরে,
সন্দেহ হয় কথার প্যাঁচে যমকে ওরা পটায় !

দুই বন্ধু

আমরা হিন্দু আমরা মুসলমান
যেমনি ছিলাম তেমনি থাকিতে চাই।
রাজনীতিবিদ করোনাকো হয়রাণ
কেহ গরিষ্ট কেহ লঘিষ্ঠ নাই।
সুখে দুখে ছিল বন্ধু যে চিরদিন
কেমন করিয়া শত্রু ভাবিব তাকে,
কেমনে এমন আপনারে করি হীন—
সে মরিবে আমি সাড়া দিব নাক ডাকে ?
গ্রামের আগুন নিভাতে পুড়ালো দেহ,
ডাকাতের মুখে ছুটে হ’ল আগুয়ান,
আজি হায় আর সে মোর নহেক কেহ,
খুঁজিয়া ফিরিব পরস্পরের প্রাণ !

অনেক বন্যা রোধিতে দিয়েছি বাঁধ,
ঘাসের চাপড়া তুলেছি নিতুই দোঁহে,
নৌকা ঠেলিতে দুজনে দিয়েছি কাঁধ
ছাড়াছাড়ি হ'ব আজিকে কিসের মোহে ?
বিষের বন্যা আনিতে চাহিছে যারা,
ভাবেনাকো যেন আমরা হয়েছি বুড়ো,
রোধিব বন্যা পুনঃ মিলে দুটা পাড়া
ফন্দিবাজের মুখে জ্বেলে দেব নুড়ো।
তোমারে ডাকিছে কবর আমারে চিতা
তবুও আমরা ভাঙাইয়া যাব ভুল,
দেখাইয়া দেব কেমন আমরা মিতা
বিষবৃক্ষেরে করে যাব নির্ম্মূল।

বন্ধুর পথে

কবর এখন তোমায় ডাকিছে, আমায় ডাকিছে চিতা,
এসো দুটা শেষ কথা কয়ে নিই এসো কাছে এস মিতা।
পাশার ছক ত গুটানো হয়েছে, কড়িতে ভরেছে তাক্
সোনালী এ সাঁজে এসো দুজনায় বিন্তিই খেলা যাক্।

তরণী মোদের পায় নাই পাল, খরধার ছিল পানি,
পাল্লা সুদূর ভিড়ায়েছি ঘাটে—আগাগোড়া গুন টানি।
লাভ ত কিছুই করিতে পারিনি তরীই এসেছি বাহি,
ভাবি এ হাটেতে কেন এসেছিনু মোরা অব্যবসায়ী।

ফুল কুড়ানোই পেশা ছিল যার আঙিনা যাহার দূর,
অশ্ব কিনিতে মেলায় তাহারে কে পাঠালো শোণপুর ?
পল্লীর টোলে মগ্ন যে ছিল লয়ে লঙ লুঙ্ লৃট,
সেয়ার কিনিতে কে তারে পাঠালো সটান ক্লাইভ ষ্ট্রীট !

এ কঠিন ঠাঁই বৃথা এসেছিনু খাপছাড়া দুটা প্রাণী
ফিরিবার পথ করিতেছে যেন সেই কথা কানাকানি।
চাউল না লয়ে বাউলের মত নেচেই এলাম ঘুরে,
শূন্য ঝুলির বহর দেখিয়া অন্যে হাসিছে দূরে।

লভিয়া মানব জনম—যাহারে দুর্লভ বলে লোকে,
কি যে করিলাম, বলার মতন কিছুই ঠেকেনি চোখে।
আরব নিশির হাজার কেটেছে একটা কেবল বাকি
নাটাইএ সুতা শেষ হয়ে আসে মনে হয় সবি ফাঁকি।

মেলা দেখা শেষ! পুরবী বাজিছে—ওই শোন নহবতে,
দেরী করিয়োনা আঁধার জমিছে পল্লীর আল্‌পথে।
চির শিশু মোরা কাটাইনু দিন ধরণীরে ভালবাসি,
মরণের কাঁধে চড়ে ফিরে যাই বাজাতে বাজাতে বাঁশী।

আই, সি, এস

একই দরের ষ্টিল, দেশী ও বিলাতী নাম।
'টাটানগরের' সাথ, মিলেছে বার্মিংহাম।
দেয় ডোভারের ক্লিফ্‌, হিমগিরি করে কর,
মিশেছে 'টুইড' 'টেম্‌স' 'মেঘনা' ও 'দামোদর'।
মিলনের খুস রোজে, ফুলেদের প্রীতি ভোজ
টগর নাগেশ্বর, অর্কিড প্রিমরোজ।
পূব পশ্চিম দুই—হইয়াছে একাকার,
তাজমহলের পাশে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার।
কাঁদে বুঝি কিপলিং হেরি এই সমাবেশ,
ভারত-সেবা-ব্রতী—তোমরা আই সি এস্‌।

২

কখনো তোমরা লাট, কখনো বা বিচারক,
কভু খাতা খতিয়ান করে ফের তদারক।
কখন দেখিছ জেলে হাজিরাটা কয়েদীর,
কভু কর সংগ্রহ, ইতিহাস জেলাটির।
কখন বা সেন্‌সাসে পূরণ করিছ খাতা,
ভাষাতত্ত্বের লাগি কখন ঘামাও মাথা।
জরীপ অফিসে কাল আছিলে কর্তা সাজি,
টেলিফোন মন্দিরে আদ্‌রা আঁকিছ আজি।

চৌকস চৌদিকে কাজের নাহিক শেষ—
ভারত-সেবা-ব্রতী তোমরা আই সি এস।

৩

লোহাজং থেকে লাহোর, লেবং কালিম্পং।
পৌরী হইতে পুনা, কাঁথি হতে চিটাগঙ্।
ভ্রমিতেছ চৌদিকে চাকুরী যে অদ্ভুত,
রেঙ্গুনে বাঁধাও বাঁধ—কাবুলেতে রাজদূত।
কভু নাচো রায়বেশে ,কখনো বা পড় গীতা,
কখনো সম্পাদক, কভু দাও বক্তৃতা।
চারিদিকে রাখ কান—সবদিকে রাখ আঁখি,
কোনো দিকে কোনো কাজে পড়েনাক যেন ফাঁকি।
সকল কাজেই লাগ—বহু কাজ কর পেশ,
ভারত-সেবা ব্রতী তোমরা আই সি এস।

৪

ক্ষণিকের লাগি তুমি ত্যজিয়াছ শাশ্বতে,
বিপুল স্বার্থত্যাগী জাতির জীবন পথে।
কস্তুরী মৃগ যুথ ভূর্জ্জ কানন ছাড়ি,
মনের আনন্দেতে টানিতেছে স্লেজ গাড়ী।
দেবতার মণিদীপ হয়েছে গলির আলো,
মুক্তার ডুবারীর মাছ ধরে দিন গেলো।
‘এমাণ্ডসেনের’ তরী যাত্রী করিছে পার,
ভুলে গেছ একদম মেরুর আবিষ্কার।
না হও দেশের নেতা তবুও সেবিছ দেশ,
ভারত-সেবা-ব্রতী তোমরা আই সি এস।

ময়ূরাক্ষী

(তিলগ্রাম ব্যারেজ দর্শনে)

নিদাঘে শীর্ণা সিকতায় লীনা যেতে সাড়া নাহি দিয়া,
বরষায় তুমি হইয়া উঠিতে অতি দুর্দ্দমনীয়া।

ডুবায়ে চুবায়ে সব—সারা হত উৎসব
চঞ্চলা তুমি কোথায় ছুটিতে ধুয়ে মুছে সব নিয়া।

২

মায়ার বাঁধনে বেঁধেছে তোমার হাতে শাঁখা পায়ে মল্।
শোচ্য তো নও প্রিয়দর্শনা—রূপ করে ছলছল।
নীরস এ ভূমি মাঝ—তৃপ্তি পেলাম আজ,
অসময়ে শুনি তোমার ভবনে সলিলের কলকল।

৩

নহ কাপালিক-কন্যা তো আর চলে না সে ভাবে চলা,
'লোহা' পরি তুমি গৃহিণী হয়েছ হে 'কপালকুণ্ডলা'।
হইয়াছ রমণীয়—বহু পরিজন প্রিয়,
শিখেছ এখন মিতব্যায়িতা গৈরিক অঞ্চলা।

৪

ভুলে যাও সেই উচাটন ব্রত ভুলে যাও বালিয়াড়ি
সংসারী সাজ সংসার কর, হইয়াছ সংসারী।
আনো ডাক দিয়া তুমি—শুভ বায়ু মৌসুমী,
তৃষিত ভূমিকে নন্দিত কর দিয়া সঞ্চিত বারি।

৫

যোগিনী হওয়ার গৌরব আছে লয়ে উদাসীন মন,
গৃহেতে তোমার কল্যাণময়ী গড়ে তোল তপোবন।
সব আশ্রম হায়—আশ্রয় পাবে তায়
স্নিগ্ধ হইবে যাত্রার পথ দুই কূল সুশোভন।

৬

বদল হয়েছে অনেক—তবুও দেখে সহজেই চিনি,
অন্নপূর্ণা গড়িছে, কে ভাঙি হে মহিষমর্দ্দিনি।
হয়েছে তোমার দান—সংযমে মহীয়ান
সবার উপর মানুষ সত্য তুমি জানাইছ দিনই।

অজয়ের বন্যা ১৯৫৯

বিপন্ন মোরা—অবসন্ন ও বিষন্ন দেহ মন
এই কি বন্যা নিয়ন্ত্রণ না বন্যা বিবর্দ্ধন ?
বন্যা হয়েছে হতেছে এবং প্রতিকার নাই যবে—
ফায়ার ব্রিগেড সঙ্গে বন্যা ব্রিগেড গড়িতে হবে।

গেছে সব বাড়ি, ভাঙ্গা দেহ মন, ধুয়ে মুছে গেছে ধান
পল্লী হতেছে অ-বাসযোগ্য রক্ষ হে ভগবান।
'ফারাক্কা' বাঁধ বাঁধা চাই আগে তার তোড়জোড় কর
কিম্বা সকলে নিরুপায় হয়ে নোয়ার আর্কই গড়।
মর্ম্মন্তুদ যাতনা পেয়েছি যা অবিস্মরণীয়
শহর বাঁচুক সঙ্গে তাহার পল্লীকে বাঁচাইয়ো।

সাপের সঙ্গে এক সাথে থাকি স্রোতের সঙ্গে লড়ি
বছর বছর কেমন করিয়া এমন জীবন ধরি ?
কেহ গাছে ঝুলে, কেহ চালে চেপে, রক্ষা করিছে প্রাণ
ভেসে গেলে বেশি ক্লেশ ত হত না, সব জ্বালা অবসান।
খড় কুটা দিয়ে দুবছর ধরে যে বাসা হইল গড়া
নিমেষে কোথায় সব ভেসে গেল অধিক যাবে কি করা ?
এমন অগৌরবের জীবন ধারণ করাও পাপ,
সভ্য স্বাধীন পুণ্য দেশেতে বিধাতার অভিশাপ।
সময় থাকিতে উপায় না করা সে কি নয় অপরাধ ?
স্বেচ্ছায় এ যে কাছে ডেকে আনা জাতির আর্তনাদ।

গোহাল পড়িছে ঘরে হাঁটু জল, উপায় খুঁজে না পাই
যোজন খুঁজিয়া 'অজয়' 'কুন্নুরে' সবল নৌকা নাই।
মিলিটারী বোট্ আসিল ক'খনা বন্যা সরিয়া গেলে,
কত যে শক্তি সান্ত্বনা দিত দুই দিন আগে এলে।
আঁধার কাটিল 'আলো' 'আলো' করি বিভীষিকা ভরা রাত,
প্রভাতে পাঁচটা পেট্রোম্যাক্সে জানালো সুপ্রভাত।
রিলিফ আসিছে ভিক্ষা আসিছে কম্বল পিছু পিছু।
বন্যায় শুধু প্রাণ রক্ষার উপায় ছিল না কিছু।
দোষ দিব কারে ? কষ্টে কাটানু শব সাধনার রাতি
শবাসনা ভালে দেখিলাম কই, খণ্ড চন্দ্র ভাতি ?

মঞ্জুরাণী

মঞ্জুরাণী চলছে এখন আস্তে,
উর্ব্বশী কি শিখছে প্রথম নাচতে ?

টলছে চরণ দুলছে তাহার গা টি,
বুঝি শিবের বুকেই দিবে পা টি।
তাহার কথার অর্থ নাহি পাইরে,
একেবারে অভিধানের বাইরে।
ভঙ্গী তাহার ভাব যে টেনে আনছে,
তরল ভাষা প্রথম দানা বাঁধছে।
ভালে আবার সিন্দূরের ও বিন্দু,
ফালি হয়ে ফুটছে বুঝি ইন্দু ?
ঘামছে দেহ, কাঁপছে তাহার হস্তৌ,
ভাবটা কতক ন যযৌ ন তস্থৌ।
ভস্ম মেখে বেশ তাহাকে সাজবে,
বলদ তারে পৃষ্ঠে করে নাচবে।
পঞ্চতপের সাধন সে তো করবে
বরবে নীলকণ্ঠকে সে বরবে।
হতে আমি পারবো না তো সিঙ্গি,
হব নেহাত নন্দী না হয় ভৃঙ্গি !

লতার ব্যথা

মুকুল ঝরে—মুকুল ঝরে—হায়রে,
লতার বুকে কি দাগ রেখে যায় রে।
কত বেদন যায় সে দিয়ে,
কত সোহাগ যায় সে নিয়ে।
বিষাদেতে গোটা কানন ছায় রে।

এই মুকুলই কুসুম হয়ে ফুট্‌তো,
হিয়ার সুবাস মলয় বায়ে ছুটতো।
ভেঙ্গে গেল কতই আশা,
কতই কচি ভালবাসা,
ভাবতে ও হায় কান্না আমার পায় রে।

ছোট মুকুল, নেহাৎ ছোট হয় তো,
ব্যথা তাহার কিন্তু ছোট নয় তো।

সকল ফুল ও মুকুল মাঝে,
সদাই তাহার অভাব বাজে,
বনস্থলী কাতর সে ব্যথায় রে।

লতার কাছে কুঁড়ির নাহি জাত রে
সকল কোরক—কোরক পারিজাত রে।
এমন মধুর মায়ের স্নেহ
সকল ছেলেই কার্ত্তিকেয়।
আনন্দেতে তিন ভুবন মাতায় রে।

রামধনু

রামধনু আমি শুধু রামধনু ভাই,
জলভরা চোখে আমি হাস্য ফুটাই।
নীলিমার কোল জুড়ি—পুলকের ফুলঝুরি,
নভ হাসি কান্নায় পান্না গড়াই।
অরুণের সাতরঙা অশ্বের রথ,
আমারি রঙিন বুকে খুঁজে পায় পথ।
ব্যোমবুকে আনি ধীরে—কি ময়ূরপঙ্খীরে,
রূপে আমি অরূপের মাঝে দিই ঠাঁই।
রামধনু,—নাই তবু হেমমৃগে আশ,
করি নাই বালি-বধ, দশানন-নাশ।
সুষমার শরজালে,—জিনিয়াছি এ নিখিলে,
নবঘন রূপ হেরি সাথে সাথে ধাই।
আকাশের ঘননীল অশোকের বন
মেঘ না এ, জানকীর উচাটন মন।
রঙীন আমি আশা—করি সেথা যাওয়া আসা,
স্নেহধারে নিতি তাঁর নবপ্রাণ পাই।
রামধনু—আমি জল-কণিকার গড়,
শিখিপাখা দিয়ে রচা পরীদের ঘর।
অমৃতের উৎসবে—কচি হিয়া ডাকি নভে,
কচি হাতে সোহাগের রাখী বেঁধে যাই।

ফুলের আশা

শিথিল হতেছে বৃন্ত রে ফুল, লাগিতেছে ঝড় গাছে
আর দেরি নাই ঝরে পড়িবার সময় আসিছে কাছে।
কোথা সে বাহার, কোথা পরিমল ?
কোথা সরে গেছে মৌমাছি দল ?
খসিয়া পড়েছে সঙ্গীরা তোর দিবসের খর আঁচে।
ফোটা আর ঝরা এই যাতায়াত চলেছে চিরন্তন
একটু আলোক একটু গন্ধ একটু আন্দোলন।
ফুল জনমের পরিণতি এই
ইহার বেশী কি আর কিছু নেই ?
বুকের ভিতর কে তবে বলিছে—আছে নিশ্চয় আছে ?
আছে গন্ধের মণিমন্দির রূপের মহল ভাই
ভাগ্য যাহার সুপ্রসন্ন সেই লভে সেথা ঠাঁই।
সেই গন্ধেই সুরভিত সব
ভুবন ভরিয়া তারি উৎসব
সুন্দর যাহা গঠিত হতেছে—সেই সে রূপের ছাঁচে।
বিফল নহে কো এ এক সাধনা এই ফোটা এই ঝরা,
সেই হরি-পরিমণ্ডল লাগি নিজেকে যোগ্য করা।
আসিবে তোমার সে সুপ্রভাত,
সে প্রেমময়ের হবে আঁখিপাত,
যুগে যুগে যাহা সাধু ও সাধক ব্যাকুল কণ্ঠে যাচে।

গ্রন্থ পরিচয়

১। **শতদল :** কবির 'আত্মস্মৃতি'তে আছে, 'শতদল' ১৯০৬ কি ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার পর বৎসর বাহির হইল 'বনতুলসী'। (মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৫৭, পৃ ৭৫৯) দ্বিতীয় সংস্করণে আছে "কবিবর রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি। ছাত্রগণের আগ্রহে ইহার আরম্ভ, ছাত্রগণের আগ্রহেই ইহার প্রকাশ। মাথরুণ ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।" ইহা দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন সংযোজিত বলে মনে হয় না। উৎসর্গে আছে "প্রাণপ্রিয় আশুতোষ, তুমি এতোদিন অন্য কোন ভাগ্যবানের ভাই হইয়া জন্মিয়াছো। বহু পুণ্যে তোমাকে সহোদর পাইয়াছিলাম; বহু পাপে তোমাকে হারাইয়াছি। তুমি আমার কবিতা পড়িতে ভালোবাসিতে, তাই এই ক্ষুদ্র বইখানি তোমাকেই দিলাম। তুমি বড়ো হইয়া পড়িও—তোমার শোকসন্তপ্ত দাদা।" কবির জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম ১লা অক্টোবর ১৯০৮। তার এক বৎসর পর ১৯০৯ সনের কার্তিক মাসে আশুতোষের মৃত্যু হয়। কবির মধ্যম পুত্রের জন্ম ১৯১১ (১৩১৭) সনের চৈত্র মাসে। তার অব্যবহিত পরেই 'শতদল' ১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত হয় বলেই মনে হয়। 'বনতুলসী' ১৯০৮ সনে লেখা হতে পারে না। কারণ এর কবিতায় ভ্রাতার মৃত্যুর উল্লেখ আছে। কবি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন ১৯০৬ সনে।

'শতদল'-এ ১০৮টি কবিতা আছে। রবীন্দ্রনাথ বইখানি পড়ে লেখেন, "ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি মৌচাকের ছোট ছোট কক্ষের মতো রসপূর্ণ হইয়াছে। কখনো কখনো মৌমাছির হুলেরও পরিচয় পাওয়া যায়।" কবিতাগুলি প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই লেখা হয়। তাই হয়তো প্রকাশের তারিখ 'আত্মস্মৃতি'তে ১৯০৬ বা ১৯০৭ বলে কবি উল্লেখ করেছেন। আগে লেখা বলেই এই কবিতাগুলিতে শোকের ছাপ পড়ে নাই। সংসারে দিদিমার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবিয়োগ হয়তো বইটি প্রকাশের বিলম্বের কারণ। এর পরে লেখা কাব্যগ্রন্থে এই নিদারুণ শোকের প্রভাব পাওয়া যায়।

২। **বনতুলসী :** ১৩১৮ সনে প্রকাশিত। শ্রীহরির চরণে উৎসর্গে কবি লিখেছেন,

"তাপিত হৃদয় করো সুশীতল শান্তি নির্ঝর হরি হে,
নিদারুণ শোক সায়কের ব্যথা পাশরিতে নাহি পারি যে।

তুমিই দিয়েছো তুমিই নিয়েছো ব্যথা দিলে কেন বহিতে,
ফুল গেছে তার বৃন্তের কাঁটা পারিনে মরমে সহিতে।
চাহিনাকো কিছু দাও তব প্রেমে দাও হে হৃদয় উলসি
তোমারি চরণে আঁখিজলে ভেজা দিলাম এ 'বনতুলসী'।"

ভ্রাতৃবিয়োগের পর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি সম্বন্ধে কবির নিজের নিবেদন এইরূপ :—"আমার এ 'বনতুলসী,' একে তো বনতুলসী, তাও আবার সব নিজের বনের নয়। ১০৮ পাতার মধ্যে অনেক পাতাই ভক্ত ও মহাপুরুষগণের তপোবন হইতে তোলা। ইহার যাহা কিছু ভালো তাহা তাঁহাদের, যাহা কিছু দোষাক্রান্ত তাহা আমাব নিজের।" তুলসী চয়নের শ্লোকটি কাব্যারম্ভে উদ্ধৃত। শ্রীনরহরি ঠাকুরের নিম্নলিখিত স্তবকটি কাব্যের প্রথমেই দেওয়া হয়েছে :—"যা কর নাম দরশ সুখ সম্পদ / দরশ পরশ রসপুর/ পরশে যে সুখ তাহা কি বলিতে পারি গো / সে যে বাণী অনুভব দূর।"

"বদ্ধ ও মুক্ত" কবিতায় "মরকতে বাঁধা তট" এবং "নমেরুতে ঢাকা", মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' ও 'কুমার সম্ভব'এর বর্ণনার অনুসঙ্গে সমৃদ্ধ। 'কবিরাজ' কবিতাটিতে ভ্রাতার ব্যর্থ চিকিৎসার উল্লেখ। কলিকাতার তৎকালিন প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা আশুতোষকে নিজে চিকিৎসা করে বাঁচাতে পারেন নাই।

৩। উজানি: প্রকাশ ১৩১৮। উজানি কবির গ্রামের নাম। পরে ইহার নাম কোগ্রাম হয়। কবির মৃত্যুর পর এই গ্রামকে কুমুদগ্রাম বলা হয়। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় অজয় ও কুনুর নদী একে বেষ্টন করে প্রবাহিত। গ্রামটি একটি পীঠস্থান—দেবী মঙ্গলচণ্ডী ও শিব কপিলাম্বর। বৈষ্ণব কবি লোচন দাসেরও জন্মভূমি। লোচনদাসের পাট এখনও বর্তমান। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর শ্রীমন্ত সদাগর ও তাঁর মাতা খুল্লনা এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। খুল্লনার মাঠ, খড়্গমোক্ষণের ঘাট, ভ্রমরার দহ গ্রামবাসীদের নিকট অতি পরিচিত। শ্রীমন্ত সদাগর যেখান হতে অজয় নদ ধরে সিংহল যাত্রা করেন সেই স্থানটি আজও বিজয়া দশমীর দিন গ্রামবাসীরা স্মরণ করে ও সেখান হতে বৎসরের জীবনযাত্রা সুরু করে।

এই কাব্যের ভূমিকায় কবি লেখেন, "অনেকগুলি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহা আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ইতিহাস, সামান্য জীবনের সামান্য চিত্র।" এই গ্রন্থে ৩২টি কবিতা আছে।

এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশে বাংলার সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বিপিনচন্দ্র পাল, ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি কর্তৃক সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় উচ্চ প্রশংশিত হয়। তখনকার দিনের Hindu Review এ বিপিনচন্দ্র পাল ইংরাজীতে এই বই সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন, যার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো:—Babu *Kumud Ranjan* has *rendered* a *very signal service to* his country and in general, by giving us these lovely studies of the beauty and grandeur of our village life and associations, for it is these that most really forms the plinth and foundation of the new and revived national life···I do desire to see him as one of the greatest poets of the New Renaissance in Bengal."

প্রচল সংকলনগুলিতে এই গ্রন্থের কতকগুলি কবিতার পাঠান্তর লক্ষিত হয়। বর্তমান গ্রন্থে মূল পাঠই গ্রহণ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সম্পাদকগণ সদিচ্ছায় নূতন শব্দ বা বাক্য বা পংক্তি সংযোজন বা বর্জন করেন। যেখানে কবি নিজে লিখিত কোন পরিবর্তন করেন নাই বা সাধারণ-ভাবে ছাড়া বিশিষ্ট কোন সংশোধনগুলিতে সম্মতি দেন নাই তাহা এখানে গ্রহণ করা হয় নাই। 'দেয়ালি' কবিতার নবম স্তবক 'কুমুদরঞ্জন কাব্য সম্ভার'এ নাই। 'একটি আলো' কবিতার মূল মুখবন্ধও সেখানে নাই। এবং ওই কবিতার পঞ্চদশ স্তবকের পরিবর্তিত পাঠ আছে। 'কাপালিক' কবিতায় 'কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক সংকলনে সামান্য কয়েকটি শব্দের পরি-বর্তন দেখা যায়। 'তীর্থযাত্রা' কবিতাটি 'কাব্য-সম্ভার'এ 'নফরচন্দ্র' শিরো নামায় ছাপা হয়েছে। এই কবিতার একবিংশ পংক্তিতে সেখানে পাঠান্তর আছে। 'শ্রীমন' কবিতায় 'কাব্য-সম্ভার'এ কতকগুলি পংক্তি বাদ দেওয়া হয়েছে ও কতকগুলি শব্দ বদলানো দেখা যায়। 'তীর্থযাত্রা' কবিতার নফরচন্দ্র কবির মাতৃকুলের পূর্বপুরুষ।

৪। একতারা: প্রকাশ ১৩২১। ভূমিকায় কবি লিখেছেন, "একতারার কতকগুলি কবিতা সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। সামান্য গ্রাম্য ঘটনা—বিষয় ক্ষুদ্র, কবিও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র একতারাতে বড়ো স্বর বাজিবে না, বাজাইবার সামর্থ্যও নাই।" বইটি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের পুত্র ডাক্তার অমৃতলাল সরকারকে উৎসর্গিত। "মামাবাবু,

তব গৃহ তপোবনের স্নেহ শ্যামল কুটির ছায়,
কাটায়েছি শৈশব যে 'ধনো' 'কচি'র সঙ্গে হায়।

বিমল স্নেহ নির্ঝরেতে তাদের সঙ্গে করে স্নান
লভিয়াছি কতই শিক্ষা কতই দীক্ষা কতই দান।
'রাণু' তার সে সরল প্রীতি নিত্য মনে পড়ছে আজ
স্নিগ্ধ বন জ্যোৎস্নাটি ছিলো তপোবনের মাঝ।
কোরক পারিজাতের সম হেরি 'রাণু' 'রুচির' মুখ,
লভিয়াছি কতই শান্তি, কতই তৃপ্তি কতই সুখ।
দিয়াছো যে অনেক মোরে দেবার কিছুই নাইক মোর,
জীবন ধরে থাকুক ঘিরে তব স্নেহ ঋণের ডোর।
অনাসক্ত সংসারেতে যশের তব স্পৃহা নাই
উদাসীনের একতারাটি কমল করে দিলাম তাই।
স্নেহ-বর্ধিত, কুমুদরঞ্জন"

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ির সামনে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে কবির দিদিমা দুই নাতিকে (কুমুদরঞ্জন ও আশুতোষ) গ্রাম থেকে কলিকাতায় এনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার সরকার কবিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অমৃতলাল সরকার কম বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (কথামৃত (৩) খণ্ড) কিন্তু পিতা পুত্রকে সংসার হতে ছেড়ে দিতে পারেননি।

'নৌকাপথে' কবিতাটির ভিত্তি এই রূপ : কবি অজয়ে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে নৌকায় বেড়াতে যান। কবির বন্ধু নদীর একটি ঘাটে নৌকাটি ভিড়াতে মানা করেন, তাঁর স্ত্রীর শেষ কৃত্যের স্থান বলে। কবিতাটি পরে গান হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে ও বাংলার গ্রামে শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এই কবিতাটি 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। পঞ্চাশ বছর পরে ওই পত্রিকাতে আরেকটি কবিতা লেখেন 'নৌকাপথে' নামেই। সেটি এই গ্রন্থে 'সংযোজন-অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৫। বীথি : প্রকাশ ১৩২২। ভূমিকায় এর একটি কবিতা 'অনুরোধ' ইংরাজি হতে অনূদিত বলা হয়েছে। বইখানি শ্রীতারকচন্দ্র রায়কে উৎসর্গীকৃত। এঁর সঙ্গে কবির পরিচয় যখন তিনি কাটোয়ায় মহকুমা শাসক ছিলেন। আজীবন কবি এঁকে অগ্রজের ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন। এঁর বহু কর্মস্থলে কবি যান। ইনি পরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হন। অবসর গ্রহণের পর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' লিখে খ্যাতি লাভ করেন। উৎসর্গে আছে, "আপনি আমায় ভালোবাসেন এবং আমার কবিতা ভালোবাসেন তাহার জন্য নহে। আপনি আমাদের সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে সর্বজনের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ

করিয়াছিলেন তাহার জন্যও নহে, আপনি যে আমাদের মহকুমার ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাসের স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং মরণোন্মুখ উচ্চ ইংরাজি স্কুলকে সঞ্জীবিত করিয়া কাশীরাম দাসের নামে নামকরণ করিয়াছেন সেই জন্যই এই দীন পল্লীকবির গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপে এ অযোগ্য উপহার গ্রহণ করুন।" কবি এই সময় মাথরুণ গ্রামে কাশিমবাজারের মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রতিষ্ঠিত নবীনচন্দ্র ইন্‌সটিটিউশন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

৬। চূণ ও কালি: 'কপিঞ্জল' ছদ্মনামে ১৩২৩ সালে প্রকাশিত। ব্যঙ্গ কবিতার বই। ভূমিকায় আছে, "মহাশয়, আমার এ চূণ ও কালি সকলের জন্য নহে, উপযুক্ত পাত্রের জন্য। যাহাদের গালে লাগিবে তাহারা চটিতে পারে যেন কেহ চটিয়া গালে লাগাইবেন না। আমার এ মহাকাব্যের নাম হুল ও মধু রাখিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভগ্যবশত আমার ক'জন বন্ধু জুটিয়াছিলেন নিতান্ত অরসিক ও অবোধ—আমার কাব্যের রসাস্বাদ না করিতে পারিয়া বলিলেন, এ ছাই হইয়াছে, এ হুলও নহে মধুও নহে, এ চূণ ও কালি……"

এই কাব্যটি তাঁর পঞ্চম শ্যালক—শ্রীখণ্ডের নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়কে উৎসর্গ করেন। লেখেন "ভরসা করি অশোভন হইবে না।" প্রচ্ছদপটের ছবিটি আঁকেন তাঁর ভগ্নিপতি, সাহেবগঞ্জের তারকচন্দ্র মজুমদার। বইএর শেষে স্বস্তিবচন সংস্কৃতে অর্থ সহিত রচনা করেন পণ্ডিত বিভূতীশচন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ, মাথরুণ স্কুলের সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক।

৭। বনমল্লিকা: ১৩২৫ সালে প্রকাশিত। বইএর নামটি দেন কবির বন্ধু 'দীপালি' পত্রিকার সম্পাদক কবি বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে স্কুলের সন্নিকটে একটি বটবৃক্ষকে। উৎসর্গে কবি লেখেন, "যে আশ্রিত বৎসল সন্তাপহারী অক্ষয় শ্যাম ছায়াতরুর পবিত্র পদতলে দুঃখে আশা, সুখে তৃপ্তি, শোকে শান্তি পাইয়াছি, যাঁহার সুশীতল ছায়ায় বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছি সেই দেবতাত্মা বটবৃক্ষের শ্রীচরণতলে এই ক্ষুদ্র বনমল্লিকা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।" ভূমিকায় লিখলেন, "এই পুস্তকের উৎসর্গ সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখি, ইহা আমার পূজনীয় প্রিয় একটি বটবৃক্ষকে অর্পণ করিলাম। তাঁহার ছায়ায় আমি বহু তৃপ্তি লাভ করিয়াছি!"

৮। দ্বারাবতী: এটি তিন অঙ্কের একটি কাব্য নাট্য। প্রকাশ তারিখ প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের শেষে আনুমানিক ১৩২৬ সন। অর্জ্জুনের স্বগতোক্তিতে ভুর্নে নির্বাসিত পরাজিত জার্মানির কাইজারের খেদের আভাস আছে মনে হয়।

কাইজারের পরাজয়ে কবি অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছিলেন। ১৩৫৭ সালের মাসিক বসুমতীর ৭৫৭ পৃঃ প্রকাশিত 'আত্মস্মৃতি'তে লেখেন, 'আমি জার্মানীর কাইজারকে অতিরিক্ত ভক্তি করিতাম, তাঁহার পরাজয়ে আমি একমাস জ্বরে শয্যাগত ছিলাম।'

বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবির বন্ধু ভক্ত এবং কবি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিভুতীশ চন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহাশয়কে। বইটিতে একটি ছবি আছে—অর্জ্জুন দ্বারকার সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে দেখছেন "ওই আসে সাগরোর্মি ঘূর্ণি বায়ু সনে, অর্ধেক গ্রাসিল পুর'। চিত্রটি তারকচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আঁকা।

৯। রজনীগন্ধা : প্রকাশ ১৩২৬ সন। বইখানি উৎসর্গ করেন তাঁর সহধর্মিণীকে—"এ কাব্যখানি তোমাকে দিলাম।" ভূমিকায় লিখলেন, "রজনীগন্ধার সৌরভ ইহাতে নাই। তাহার মতো ইহা পেলবও নয়, তবে রজনীগন্ধার ন্যায় অন্ধকারে ফুটিয়াছে বলিয়া ইহার নাম রজনীগন্ধা রাখিয়াছি।"

'হা'ঘরেদের ভোজ' কবিতায় প্রকৃত হা'ঘরের সঙ্গে কবির সৌহার্দ্যের সম্পর্ক জড়িত। তাহারা তাঁর গ্রামের বা স্কুলের সন্নিকটে তাঁবু ফেললে তিনি তাদের নিমন্ত্রণ করে অতি আদরের সঙ্গে খাওয়াতেন।

১০। নূপুর : প্রকাশ ১৩২৭। উৎসর্গে আছে "পরম পূজনীয় বৈষ্ণব কবি লোচন দাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীচরণে। আমি আপনার গ্রামবাসী ও প্রতিবেশী, আপনি ঠাকুরের শ্রীপদে নূপুর হইতে সাধ করিয়াছিলেন, আমি আপনার শ্রীচরণে এই নূপুর পরাইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি। আপনার প্রিয় গ্রামের ক্ষুদ্র কবির ভক্তি অর্ঘ্য বলিয়া আশা করি এ অকিঞ্চিৎকর দানও গ্রহণ করিবেন।..."

গ্রামে এই মহাপুরুষের নামে পৌষ সংক্রান্তিরদিন হতে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসতো। তাঁর সমাধিও এই গ্রামেই আছে। জনশ্রুতি তাঁর একটি দাঁত এই সমাধিতে রক্ষিত হয়। পুরানো মন্দির ও পাট অজয় গ্রাস করে। কবি তখন নিজের নূতন বাসগৃহ সংলগ্ন জমি দান করেন ও পরে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। পুরানো মন্দির অপবিত্র করা ও মেলা নষ্ট করার ব্যর্থ চেষ্টা 'চূণ ও কালি'র ব্যঙ্গ কবিতায় উল্লিখিত আছে।

১১। অজয় : প্রকাশ ১৩৩৪। বইখানি তাঁর বিদেশী বন্ধু J. G. Drummond I. C. S.কে উৎসর্গিত। উৎসর্গের কবিতাটি এইরূপ :-

হে বিদেশী বন্ধু আমার নওকো তুমি দেশী / তবু আমার তোমার দিকে টান
বরেণ্য সে বার্ণস কবির নিকট প্রতিবেশী / মূর্ত তুমি তাঁহার মধুগান।
নাই কো মনে জাতি এবং পদের অহংকার / একেবারে বড়াই তোমার নাই ;

বিশ্বে নিলে আপন করে মুক্ত তোমার দ্বার / ভিন্ জাতি যে সত্য ভুলে যাই।
কর্ত্তব্যেতে নিষ্ঠা এমন, এমন বিবেচনা, / ন্যায়ের প্রতি এমন অনুরাগ,
এমন কোমল এমন কঠোর এমন মহামনা / গুণের কথা বলবোনা আর থাক।
উপন্যাসের শাহনশাহর তুমি স্বদেশবাসী / পরীর দেশে তোমার আনাগোনা
হস্ত তোমার কার্য্য করে চক্ষে তোমার হাসি / বক্ষে চলে বাণীর আরাধনা।
দুজনাতে প্রথম মিলন অজয় নদীর তীরে / ওকের সাথে আকন্দেরই দেখা
ভাসলো ভ্রমরদহের ভেলা স্কটিশ লকের নীরে / সারং হলো ব্যাগপাইপের সখা।
আজকে পাঠাই তোমার কাছে আমার প্রীতির দান / আদর পাবে জানি তোমার পাশ
মিলুক তাতে ফোর্থ কিংবা টুইড নদীর গান / গাঁদার ফুলে ড্যাফোডিলের বাস।

বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্টম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে অজয় নদীর ধারে কবির সঙ্গে এঁর আলাপ হয়। এই আলাপ আজীবন বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কবি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন 'A glorious privacy is thine'। ইনি বাংলা ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর কিছু দিন বিলাতে বাংলার অধ্যাপনা করেন ও শেষে Aberdeen বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক হয়েছিলেন। বিলাতে থাকলেও কবির কাব্য সম্বন্ধে এঁর প্রচুর আগ্রহ ছিলো। পরস্পরের মধ্যে আজীবন চিঠি পত্রের আদান প্রদান ছিলো। 'অজয়ে'র মুখবন্ধে বার্ণসের এই চার লাইন কবিতা অনুবাদসহ দেয়া হয়।

'For a' that and a' that / it is comin' yet for a' that
That man to man the world o' er/shall brothers be for a' that.'

'সুখের সময় আসছে ওগো স্বপ্ন নয়কো সত্যি এ
সকল জাতি নিকট জ্ঞাতি ভরবে ধরা আত্মীয়ে।'

'গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড' কবিতার কিছু পাঠান্তর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক সংকলনে দেখা হয়। এই গ্রন্থে মূল পাঠই রাখা হলো। একটি পংক্তিতে আছে 'সাঁওতাল কুলি কোথাও করিছে আযোজন আল বাঁধবার।' পূর্বোক্ত সংকলনে সেটির পরিবর্তিত পাঠ ছিলো, সাঁওতাল দল কোথাও নাচে বা আযোজন করে রাঁধবার। এর পরের লাইনটি অনুপস্থিত। এই পরিবর্তনের কোন ভিত্তি, সম্পূর্ণতা বা কবির অনুমোদন না থাকায় বর্জিত হয়েছে। শুধু এই কবিতাটিতেই নয়, পূর্বোক্ত সংকলনে ও 'কাব্য সম্ভারে'র অন্তর্ভূক্ত, আরও কয়েকটি কবিতায় মূল রচনার সঙ্গে যে পাঠান্তর দেখা যায় সে সম্পর্ক কবিকে লেখা কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের একটি চিঠির কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলো,

"আপনার বই edit করার সময় কোন কোন স্থানে দু'একটা শব্দ বদল করেছিলাম—আপনি দূরে ছিলেন বলে আপনার approval লওয়া হয়নি। পরে জেনেছি কোন কোন স্থানের পরিবর্তন আপনার মনোমত হয় নি……।" বর্তমান সংকলনে 'গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড' কবিতার তৃতীয় স্তবকে দ্বিতীয় পংক্তি ভুল মুদ্রিত হয়েছে। শুদ্ধপাঠ হবে 'টোঙ্গা এক্কা পঙ্কা ছক্কা লক্কার মতো টলছে।'

'শ্রেষ্ঠ কবিতায়' 'পথের দাবী' কবিতাটির দু'টি স্তবক নূতন যোগ করা আছে ও একটি বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম স্তবকটি এই রূপ—

'ঘন দুর্যোগ, গরজে জলদ, ঝরঝর বারি ঝরে
রুদ্ধ দুয়ারে করাঘাত করি কারা ডাকাডাকি করে ?
যে সব ডাকের দিই নাই সাড়া
বুকের দুয়ারে ভিড় করে তারা,
শ্রান্ত পথিক চমকিয়া ওঠে পথের দাবীর ডরে'।

আরেকটি স্তবক এই রূপ—

'বদরীর পথে সন্ন্যাসি এক ডেকেছিলো আশ্রমে,
ফিরিবার পথে আসিব বলিয়া আসা হয় নাই ভ্রমে।
প্রসাদ লইতে পাইনি সময়
ঠেলিয়া এসেছি শত অনুনয়
করুণার ঋণ জবর হইয়া বাড়িয়া উঠছে ক্রমে।'

'একটি গ্রাম' কবিতার গ্রাম কবির প্রায় ত্রিশ বৎসরের কর্মস্থল 'মাথরুণ'।

১২। স্বর্ণসন্ধ্যা: প্রকাশ ১৩৫৫। স্বর্গবাসী জনক-জননীর শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত। মুখবন্ধে একটি চার লাইন কবিতা—

'মেলা দেখা শেষ, পূরবীর সুরে
সন্ধ্যা আসিছে ভাসি,
মরণের কাঁধে চেপে ফিরে যাই
বাজাতে বাজাতে বাঁশি।'

১৩। গরলের নৈবেদ্য: সোমনাথ সম্বন্ধে ১০৮টি কবিতা 'গরলের নৈবেদ্য' নাম দিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা কবির ছিলো। তাঁর ডায়রিতে পাওয়া যায় যে কবিতার খাতাটি একজন প্রকাশকের নিকট থেকে অনেক কষ্টে পাওয়া গিয়েছে, এটি তাঁর প্রাণের সামগ্রী। খাতাটিতে ১০৮টি কবিতা পাওয়া যায় না, আরও ছড়ানো আছে। এটির নামকরণ তিনিই করেছিলেন। কবি এও উল্লেখ করেন যে 'শিলাদিত্য'মাসিক বসুমতিতে এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন

সেটি এই গ্রন্থের ভূমিকা হবে। "শিলাদিত্য" কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গত বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। তাঁর রচনার নাম 'কাথিয়াবাড়ে সোমনাথের মন্দির ও কুমুদরঞ্জন' (মাসিক বসুমতী, ১৩৬৮, পৃঃ ২৭৪-২৭৯, ৫:৪-৫০৮)। কবির জীবৎকালে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের একটি পুস্তিকায় 'গরলের নৈবেদ্য' শিরোনামায় সোমনাথ সম্পর্কে কবির চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ও 'কাব্য-সম্ভার সংকলনে সোমনাথ সম্পর্কে কয়েকটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। সেগুলি ও অন্যান্য কয়েকটি কবিতা 'গরলের নৈবেদ্য' অংশেই পরিবেশিত হলো।

'আত্মস্মৃতি' (১৩৫৭ চৈত্র সংখ্যা, মাসিক বসুমতি) তে তিনি লেখেন, 'সোমনাথ সম্বন্ধে আমার মর্মবেদনা আমি চক্ষের জলেও প্রকাশ করিতে পারিনে, তাঁহার কথা বলিতে আমি আত্মহারা হই।' ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি সোমনাথ সম্বন্ধে অজস্র কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। আর কোন বিষয়ই তখন যেন ছিল না। মোহিতলাল প্রথমে এই সম্বন্ধে কবিতা ছাপতে অনিচ্ছুক ছিলেন পরে আর কোন বিষয়ে কবিতা না পেয়ে ছাপেন। এবং এক সোমনাথের উপরেই যে এতো কবিতা লেখা যায় তাতে আশ্চর্য হয়ে যান। সোমনাথের মন্দির পুনর্নির্মানের জন্য তিনি শুধু কবিতার মাধ্যমেই উদ্বুদ্ধ করেননি, কাগজের সম্পাদকদিকে ভারত সরকারকে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ও কে, এম, মুন্সিকেও চিঠি লেখেন। পুনর্গঠনের জন্যে চাঁদা তুলতেও অনুরোধ জানান। অনেক ঐতিহাসিক তথ্য তাঁর সহপাঠি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের নিকট পান। পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁদের আপত্তি খণ্ডন করে পত্রপত্রিকাতে চিঠি লেখেন, এবং অনেক কবিতাও লেখেন। যেমন কবিতায় লিখলেন—"পূর্ণ করার গৌরব আছে, চূর্ণ করার নেই,' কিম্বা, "পশ্চাদপদ আজি যদি হও সবে, / তবু মন্দির জেনো নির্মিত হবে, / ভাঙার দম্ভ নহে এতো—জানো গঠনের দম্ভ।"

মন্দির নির্মাণের জন্য সামান্য অর্থ ছাড়াও গ্রাম হতে অভিষেকের জন্য বহু দ্রব্যাদি পাঠান। 'শুভ বৈশাখ ১৩৫৮' নামক কবিতায় লেখেন—

"সৌরাষ্ট্রেতে সোমনাথ লাগি পাঠানু বিমান ডাকে,
ধুস্তুর আর আকন্দ মালা গলায় পরাতে তাকে।
সদ্য গব্য ঘৃত—দেখিয়া হবেন প্রীত
আমার মাধবী ফুলের মধু যা ছিলো শাখে মৌচাকে।
পাঠালাম প্রিয় অজয়ের জল হাসিবেন প্রভু পেয়ে,

নীলকণ্ঠকে একটি গোলাপ দিয়েছে আমার মেয়ে।
আমার গাছের আম্রের শাখা বৃন্তসহিত আম,
শ্যামলতা বেল আঁকড়ের ফুল শতদল অভিরাম,
পাঠালাম কর্পূর—নূতন আখের গুড়,
গোবিন্দ ভোগ আতপ পাঠানু পূর্ণ মনস্কাম।" (অংশ)

কে এম মুন্সি প্রাপ্তি স্বীকার করে জানান যে সেগুলি অভিষেকে ব্যবহৃত হবে।

'দেহাতীত' কবিতাটির কিছু অংশ পরিবর্তন করে 'সোমনাথ' নামে 'কাব্য-সম্ভারে' প্রকাশিত হয়। মূল পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত কবিতাটি মিলিয়ে এই সংকলনে 'দেহাতীত' নামে মুদ্রিত হলো।

১৪। কুমুদ রঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ ১৩৬৪ সনে এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়। পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হতে কিছু কবিতা নেয়া হয়, এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কিছু নূতন কবিতা সংযোজিত করা হয়। কবি কালিদাস রায় গ্রন্থের পরিচায়িকা লেখেন। শ্রীতারা চরণ বসু ও শ্রীঅমিয় রায় চৌধুরির সহায়তায় তিনি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। 'কঃ পন্থা' কবিতাটি হাওযার্ড ফাস্টের সদ্য প্রকাশিত 'স্পার্টাকাস' উপন্যাসটি শ্রবণের প্রভাবে উদ্দীপিত হয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে মূল প্রকাশিত কবিতা হতে যে সব পাঠান্তর এই সংকলনে দেখা যায়, তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিকে বর্তমান গ্রন্থে অনুসরণ করা হয়েছে।

'মাটির মায়া' শীর্ষক কবিতাটির আরেকটি পাঠ পাওয়া যায়। দু'টি কবিতার ভাব একই। তবে দ্বিতীয় পাঠে কথাগুলি তিলোত্তমার মুখে বলা হয়েছে। সদ্য শাপমুক্তা তিলোত্তমার পৃথিবীর মায়ায় স্বর্গে গিয়ে নৃত্যের তাল ভঙ্গ হচ্ছে —এইটি দ্বিতীয় পাঠের পটভূমিকা। কবিতাটির তাৎপর্য্যপূর্ণ চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হলো :—

ছায়া মায়াময় মধুরোজ্জ্বল অপূর্ব সেই ক্ষিতি
নশ্বরে অবিনশ্বর করা চেষ্টা তাহার নিতি।
তবু সেথা হতে আসে যারা আনে সঙ্গে এমন কিছু
তেত্রিশ কোটি দেবতার আঁখি ধরা পানে হয় নিচু।

১৫। কুমুদরঞ্জন কাব্য-সম্ভার ঃ ১৩৭৪ সনে এই সংকলন প্রকাশিত হয়। পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ হতে এবং সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনা

হতে রচনা সংগ্রহ করে কবি কালিদাস রায় এই সংকলনটি সম্পাদনা করেন। অবশ্য 'শতদল' 'বনতুলসী' ও 'চূণ ও কালি'র কোন কবিতাই এই দুটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

'গতিমন্থর' কবিতায় যে পথের বর্ণনা তাহা 'স্বর্ণসন্ধ্যা'র 'পথ' কবিতাতেও বর্ণিত হয়েছিলো। এই পথটি কবির গ্রামের কুনুর নদীর ওপারে নূতনহাট হতে কবির কর্মস্থল মাথরুণ হয়ে মহকুমা শহর কাটোয়া যাওয়ার কাঁচা রাস্তা।

'শাস্তিরক্ষক' কবিতার সমভাব নিয়ে আরেকটি কবিতা আছে 'গ্রামের কথা'। তার দুটি লাইন :—

"পল্লী গ্রামের সকল জাতির সবার মুখেতে এক কথা
শাসকের প্রাণে সহসা আসিল কেন এত নিরপেক্ষতা"

১৬। **সংযোজন:** গ্রন্থাকারে অসন্নিবিষ্ট অসংখ্য কবিতা হতে, কিছু কবিতা এই সংকলনে গৃহীত হলো। এর সমস্তই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কবির কবিতা লেখার বিরাম ছিল না। 'বন্ধুর পথে' কবিতটি কবির আজীবন বন্ধু কাজী খোদা নওয়াজ এর কথা স্মরণ করায়। মঙ্গলকোটের বাস্তু বিনিময় করে যশোর চলে যাওয়ার পরও দুই বন্ধুর বিচ্ছেদ বেদনাময় বহু চিঠি পত্রের আদান প্রদান হয়। 'লতার ব্যথা' কবিতাটি কবির সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র কণিষ্কনাথের এক বৎসর বয়সে মৃত্যুতে লেখা।